তীর্থসঙ্গী
Rajasthan
Assam
Manipur
Gujarat
Madhya Pradesh
Tripura
Mizoram
Karnataka
Tamil
Nadu
তীর্থ দর্শন সহায়িকা . . .
শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তীর্থসঙ্গী

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ
ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের
অনুকম্পিত

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের
কৃপাশীর্বাদধন্য

শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস
কর্তৃক সংকলিত।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)
স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা।
ফোন: ৭১২২৪৮৮, মোবা: ০১৭১৫১৯২১১৫, ০১৯৭০০৫৯২০০

সম্পাদক ও প্রকাশক	:	শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
উপদেষ্টা	:	শ্রী নিধি কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী
	:	শ্রী সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী
সহযোগিতায়	:	শ্রী জ্যোতিশ্বর গৌরহরি দাস ব্রহ্মচারী
সংকলক	:	শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস
প্রুফ রিডার	:	শ্রী সুভাষ চন্দ্র রায়
কম্পিউটার কম্পোজ	:	শ্রী শান্ত চন্দ্র রায়
প্রচ্ছদ	:	শ্রী অক্ষয় লীলামাধব দাস
গ্রন্থস্বত্ব	:	আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্ট বিভাগ, স্বামীবাগ আশ্রম (ইস্‌কন) ঢাকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৬
মুদ্রণে	:	বি.এম. ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং হাউজ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। মোবা: ০১৭১৫-০১ ১৩ ০৬
সংখ্যা	:	৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কপি
ভিক্ষা	:	১২০ (একশত বিশ) টাকা
ISBN No	:	9789849140409
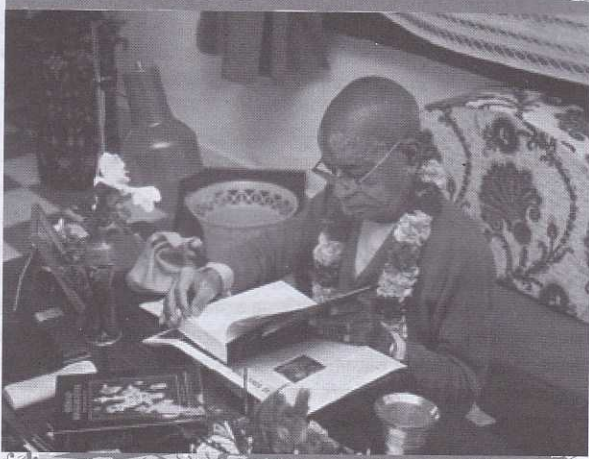
উৎসর্গ

পরমারাধ্য জগৎগুরু কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ
ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের করকমলে
যাঁর কৃপাবিন্দুভিন্ন এ প্রয়াস অচিন্তনীয়...

মুখবন্ধ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য ভক্তরূপে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছিলেন। বিষয়টি কমবেশি সকলেরই জানা আছে যে, তিনি শুধু উত্তর ভারতই নয়, দক্ষিণ ভারতেও ভ্রমণ করেছিলেন। তৎকালীন প্রজাহিতৈষী রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর যাত্রাপথ সুগম করার জন্য তাঁর ভৃত্য এবং সৈন্যদলকে পাঠিয়েছিলেন। একইসঙ্গে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেসমস্ত স্থান মহাপ্রভু দর্শন করবেন সেসমস্ত স্থানে যাতে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে স্মারক-মন্দির স্থাপন করা হয়। তাই সেসমস্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ তীর্থস্থান কেউ দর্শন করলে তাঁর অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় এবং হৃদয় নির্মল হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন:

গৌর আমার যেসব স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে।
সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে ॥

সুতরাং, আমাদের সকলেরই উচিত হবে মহাপ্রভুর সেসব স্মৃতিবিজড়িত স্থান দর্শন করা; কিন্তু সেসব তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কী বা কীভাবে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটই বা কী–আমাদের অনেকেরই তা জানা নেই। সেক্ষেত্রে এই 'তীর্থসঙ্গী' গ্রন্থটি সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। তীর্থযাত্রীদের অনেক অজানা তথ্য জানাতে এই গ্রন্থ সহায়তা করবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাতে সকলের মনের ভ্রমণপিপাসা কিছুটা হলেও নিবারিত হবে এবং তৃপ্তিবোধ করবেন–এ প্রত্যাশা রাখি। এ গ্রন্থ সংকলনে নানা ধরনের ভুলক্রটি থাকা স্বাভাবিক। পরবর্তী সংস্করণে সেসব ভুলক্রটি শুধরিয়ে নিতে প্রয়াসী হব বলে আশা রাখি। এ বিষয়ে আপনাদের যে কোনো সহৃদয় উপদেশ সাদরে গ্রহণ করব। এ গ্রন্থটি সংকলনে শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস-এর নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়াও এ গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁরা সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, আপনারা যাঁরা তীর্থযাত্রী হয়ে ভারতের বিভিন্ন মঠ-মন্দির তথা তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শনে যাবেন তাঁদের সকলের ভ্রমণ আনন্দময়, সুন্দর ও পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হউক–পরমেশ্বর ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা। – হরেকৃষ্ণ।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
সম্পাদক ও প্রকাশক

প্রসঙ্গ-কথা

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে ইস্কন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমগ্র পৃথিবীতে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য। ইস্কনের প্রত্যেক ভক্ত তার যোগ্যতা অনুসারে প্রচার করে থাকেন। প্রায় ১৫ বছর আগে আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা প্রয়াত সেবানিধি দাস ব্রহ্মচারী বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক নিয়ে ভারতে তীর্থ ভ্রমণ এর সূচনা করেছিলেন। তারপর সেটি এখন ইস্কনের অনেক মন্দির থেকে গ্রুপ নিয়ে প্যাকেজ তীর্থ ভ্রমণ পরিচালনা করে আসছে। আমি যখন স্বামীবাগ আশ্রমে আসি তখন বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে থাকি। কিন্তু আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রী চারু চন্দ্র প্রভু স্বামীবাগ থেকে ভারতে তীর্থ ভ্রমণ এর পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব আমাকে অপর্ন করেন। আজও সেটি আমি আমার অন্তর দিয়ে ভালবেসে দায়িত্ব পালন করে চলেছি। এই দায়িত্বটিতে এজন্য আনন্দ পাই কারণ আমি পিতা-মাতা ছেড়ে এসেছি। আর ঠিক পিতা-মাতা সদৃশ বয়স্ক লোকগুলোকে হাত ধরে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এজন্য ধন্যবাদ জানাই চারুচন্দ্র প্রভুকে কারণ আজ আমি প্রভুর আশীর্বাদে এই দায়িত্ব পেয়ে ভারতে অনেক তীর্থ ভ্রমণ করতে এবং অন্যকে করাতে পেরেছি। আমরা বিভিন্নভাবে নিজেরা ট্যুর, পিকনিক, হানিমুন করতে পারি কিন্তু তীর্থ ভ্রমণ করতে হলে পাঁচটি প্রধান সূত্র ঠিক রাখতে হয়। যথা–সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত শ্রবণ, হরিনাম, ব্রজধামে বাস আর ইস্কনের প্রত্যেক ভ্রমণে আমরা এগুলো ঠিক রাখি বলে বহুতীর্থ যাত্রী যাত্রার শেষে শুদ্ধভক্তে পরিণত হয়ে যান। আমি বহুবার উত্তর ভারত, কয়েকবার দক্ষিণ ভারত এবং নেপালেও ভ্রমণ করাতে পেরেছি। প্রতিবছর ২ বার তীর্থ ভ্রমণ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ইস্কনের বিভিন্ন মন্দির থেকে এই তীর্থ যাত্রা পরিচালিত হয়ে থাকে।

সর্বোপরি, আমার গুরুভাই সীতাপতি গোঁসাই দাস প্রভুকে তার পরিশ্রমে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত করা সম্ভব হয়েছে। কারণ বহু তীর্থযাত্রী আমাকে একটি বই প্রকাশ করার কথা বলেছেন কিন্তু সময়ের জন্য আমি তা করতে পারিনি। ধন্যবাদ জানাই আমার তীর্থভ্রমণকালে সহযোগী গুরুভাই সুখী সুশীল দাস প্রভু, শ্যামরূপ অবতার দাস প্রভু, উপেন্দ্র কৃষ্ণ দাস প্রভু, জাহ্নবা নিতাই দাস প্রভুকে। তাদের অক্লান্ত সেবার জন্য স্বামীবাগ ট্যুর পরিক্রমা আজ অনেক সাফল্যতা লাভ পেয়েছে।

পরিশেষে আপনাদের কাছে আমার বিনম্র প্রার্থনা জানাই যাতে আমি সারা জীবন আপনাদের কৃপা, স্নেহ, আশীর্বাদ পেয়ে জগন্নাথের সেবা করে যেতে পারি। হরেকৃষ্ণ।

শ্রী নিধি কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী
উপদেষ্টা

বিনম্র নিবেদন

শৈববকাল থেকেই বিভিন্ন স্থানে বেড়ানোর একটা প্রবণতা আমার মধ্যে সবসময় ছিল। সেজন্যেই হয়তো আমার এ সাধুজীবন বেছে নেয়া। সাধুজীবনে এসেও দেখলাম, আমার শৈশব-জীবনের সেই ঘুরে বেড়ানোর ও নতুন-নতুন স্থানে যাওয়ার স্পৃহা আরও বেড়ে গেল। বিশেষ করে, ধর্মীয় বিভিন্ন মঠ-মন্দির ও তীর্থস্থান ভ্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। এমনই এক অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর একদা নিজের মনের সুপ্ত বাসনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান যেমন– গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, ত্রিবেণী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার নয়নাভিরাম মঠ-মন্দির দেখে অভিভূত হয়ে যাই। তীর্থ দর্শনের সে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সমগ্র ভারতব্যাপী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য যে এতসংখ্যক মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান রয়েছে, তা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝানো মুশকিল। সুতরাং, নিজের ব্যক্তিগত সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে আমি ভারতের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণ করার পর আমার মধ্যে একটা বেদনা কাজ করতে থাকে, তা হলো যেসব তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছি সেসবের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারিনি। তাই কীভাবে তা জানা যায়, সে চিন্তা আমার মাথায় সর্বদা নাড়া দিতে থাকে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সীমিত আকারে হলেও কিছু তথ্যাদি আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। এই গ্রন্থে আমি উত্তর ভারতে অবস্থিত তীর্থসমূহের কিছু বিবরণ সন্নিবেশ করার চেষ্টা করেছি। এটি আমার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। জানিনা, কতটা সফল হতে পেরেছি। প্রসঙ্গক্রমে নিবেদন, এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি বিভিন্ন সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছি। বিভিন্নভাবে আরও অনেকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রথম সংস্করণে আমার সীমাবদ্ধতার কারণে নানা ধরনের ভুলত্রুটি হতে পারে বলে আমি মনে করি। সেজন্য সকলের কাছে আমি সবিনয় ক্ষমাপ্রার্থী এবং ভবিষ্যতে এব্যাপারে যে কোনো গঠনমূলক যুক্তিসংগত পরামর্শ ও উপদেশ সাদরে গ্রহণ করার জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত থাকব।

সর্বোপরি, গ্রন্থটি ভ্রমণ-আগ্রহী ব্যক্তি বা তীর্থযাত্রীদের সামান্য উপকারে আসলেও আমার শ্রম কিছুটা সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করব।

পরিশেষে, সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট এ প্রার্থনা–সকলের চলার পথ ও কর্মময় জীবন সুন্দর ও সার্থক হউক।–হরেকৃষ্ণ

বিনয়াবনত
শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস
সংকলক

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

"মঙ্গলাচরণ"

শ্রীগুরু প্রণাম

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্ ॥
বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ-শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোহস্তুতে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রণতি

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্‌বৈরাগ্যমূর্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণতি

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রণতি

শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমেস্তং নির্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণব প্রণতি

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্ব প্রণতি

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণ ভক্তরূপস্বরূপকম।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রণতি

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে ॥

শ্রীরাধা প্রণাম

তপ্ত-কাঞ্চন-গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

তুলসী প্রণাম

বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

সম্বন্ধাধিদেব প্রণাম

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দ-মতের্গতী।
মৎসর্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥

অভিধেয়াধিদেব প্রণাম

দীব্যদ্-বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

প্রয়োজনাধিদেব প্রণাম

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥

তীর্থভূমি ভারতের নামকরণের কথা

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারত। তবে, আয়তনে বিশ্বের ৭ম আর দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র ভারত। জনসংখ্যায় বৃহত্তম চীনের পরেই ভারতের স্থান। পৌরাণিক হিন্দু রাজা চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-সুত প্রথিতযশা নৃপতি ভরত থেকে ভারতবর্ষ নামকরণ করা হয়েছে। আর গ্রিকরা নাম দেন ইন্ডিয়া তথা ভারত। তেমনই মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানের লোকেরা হিন্দুস্থান বলে থাকে আজও ভারতকে।

ভারতে আর্য জাতির প্রবেশ

ইরান ও মেসোপটেমিয়া থেকে হিন্দুকুশ পেরিয়ে ভারতে আসে আর্য জাতি। বসতি গড়ে আর্যরা পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবে। তবে, ধ্বংস হয় অতীত বারবার সিন্ধুর ধারা পরিবর্তনে। আবার ধ্বংস হয় খ্রি.পূ. ১৭০০ শতকের ভূমিকম্পে। নিদর্শন মিলেছে তার (খ্রি.পূ. ৩৫০০-২৫০০) অধুনা পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয়। স্থানীয়দের (কালা) যুদ্ধে হারিয়ে দাস করে বশে রাখে নতুন বাসভূমে আর্যরা। জাতিতে এরাও হিন্দু এবং এদের ধর্ম সনাতন। রাজার অনুপস্থিতিতে পুরোহিতরাই সমাজ চালাত প্রাক-আর্যকালে। ব্রাহ্মণীকাল হিন্দুত্বের সঙ্গে মিলেমিশে কালেকালে শ্রেণিভেদ, বর্ণভেদ, ধর্মভেদ গড়ে ওঠে আর্য সমাজে। গোড়াতে যোদ্ধা, ব্রাহ্মণ ও সাধারণ তিন স্তরে বিভক্ত ছিল আর্য সমাজ। দাসদের উদ্ভবে নবরূপে বর্ণভেদের সূচনা ঘটে ক্ষত্রিয় (যোদ্ধার জাত), বৈশ্য (কৃষি ও বাণিজ্য), শূদ্র (ভূমি দাস)। তার পরে (খ্রি.পূ. ১৫০০-১০০০) জাতিভেদ আসে আর্য সমাজে, যার বিষময় ফল কলুষিত করছে ভারতবর্ষকে আজও। প্রসারও ঘটে পঞ্চনদের দেশ ছাড়িয়ে গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা ধরে আর্য সাম্রাজ্যের। ভারতময় আর্যজাতির প্রাচীনতম ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। ত্রেতাযুগের আরেক তীর্থ অযোধ্যার পুণ্যভূমে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মক্ষেত্র। সারা বিশ্বে এক আলোচিত নাম আজও অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দির তথা বাবরী মসজিদ। লিখিত হয় ঋগবেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত–সনাতন ধর্মের চার ক্লাসিক গ্রন্থ, তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি রূপে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের তিন দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মুখ্য ত্রয়ী। হিন্দু পুরাণের দেবতারা বারবার নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যধামে ভক্তদের বাঞ্ছাপূরণে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি দশ অবতাররূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবে সঙ্কট কেটেছে বারবার। দেবতাদের সে আখ্যানও ছড়িয়ে রয়েছে সারা ভারতময়। আর সেই থেকে আজও বিশ্বের প্রাচীনতম চলমান ধর্ম সনাতন ধর্মের বৈজয়ন্তী উড্ডীন ভারতের আকাশে। দর্শন তার–আত্মার বিনাশ নেই, জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম ঘটে চলেছে পর্যায়ক্রমে, কর্মফলই প্রভাব ফেলছে পরজন্মে।

আর দক্ষিণে আগেভাগেই (খ্রি.পূ.৪০০) বসতি গড়েছে মধ্য ও পূর্ব-মধ্য এশিয়া থেকে এসে দ্রাবিড়ীয়রা জাতিতে এরাও হিন্দু। তবে পোশাক-আশাক, আহার-বিহার এমনকি ভাষা এদের ভিন্ন। প্রসারও ঘটেছিল সারা দক্ষিণী অববাহিকায় দ্রাবিড়ীয় সাম্রাজ্যের।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ

রাজতন্ত্রের জন্ম খ্রি.পূ. ৬০০ শতকে গঙ্গার অববাহিকায়। ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ও রাজতন্ত্রের পেষণে জর্জরিত হিন্দু সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টজন্মের ৫৬৩ বছর আগে অধুনা নেপাল রাষ্ট্রের লুম্বিনীতে কপিলাবস্তুর শাক্য বংশীয় রাজা শুদ্ধোধন সূত বিষ্ণু নবম অবতাররূপী সিদ্ধার্থের জন্ম। এক সন্তানের জনক সিদ্ধার্থ (খ্রি.পূ. ৫৬৩-৪৮৩) একদা পরিক্রমায় বেরিয়ে জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ, শব ও যোগী দর্শনে বিচলিত হয়ে মোক্ষলাভে পথের সন্ধানে ২৯ বছর বয়সে রাজ্যপাট ছেড়ে ৩৫ বছরে গয়ার অনতিদূরে ৪৯ দিনের ধ্যানে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন। ৪৫ বছর বয়সে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের মর্মকথা জীবনক্ষয়ী হিংসা নিরোধে বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ঘটে বারাণসীর সন্নিকটে সারনাথে। প্রসারও পায় বৌদ্ধধর্ম ভারত ছাড়িয়ে বহির্ভারতে। আর ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে বুদ্ধের পরিনির্বাণ। সম্রাট অশোকের কালে রাজধর্মের রূপ নিতে বৌদ্ধধর্মের রমরমা, পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। মৌর্য ও সাতবাহন কালে হীনযান মূর্তিবিরোধী বৌদ্ধধর্ম প্রতীকে অর্থাৎ গুপ্তকালের স্বর্গযুগের প্রতীক থেকে সরে এসে প্রতিকৃতিতে অর্থাৎ মহাযান যুগের সূচনা। কিছুটা স্তিমিত হলেও প্রভাব তার আজও বিশ্বের দিক-বিদিকে।

বুদ্ধেরও আগে অহিংসা পরম ধর্ম বাণী শোনালেন ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর (শেষ) বর্ধমান মহাবীর (খ্রি.পূ ৫৫০-৪৭৫)। প্রাচীন গণতান্ত্রিক রাজ্য বৈশালীর উপকণ্ঠে কুম্ভ গ্রামে খ্রিষ্ট জন্মেরও সাড়ে পাঁচশত বছর আগে বর্ধমান মহাবীরের জন্ম। পিতা ক্ষত্রিয় নায়কের পুত্র সিদ্ধার্থ, আর মাতা রাজন্যা ত্রিশলা। বিয়েও করেন মহাবীর। স্ত্রী যশোধরা, আর কন্যা অনুজা। ৩০ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন মহাবীর। দীর্ঘ ১২ বছরের কঠিন তপস্যায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ জয় করে জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ জীন হলেন মহাবীর। আর জীন থেকে তাঁর ধর্মমতের নাম হয় জৈন। অতীতে আরও ২৩ জন {১। ঋষভনাথ (আদিনাথ), ২। অজিত নাথ, ৩। সম্ভবনাথ, ৪। অভিনন্দন, ৫। সুমতিনাথ, ৬। পদ্মপ্রভু, ৭। সুপার্শ্বনাথ, ৮। চন্দ্রপ্রভু, ৯। সুবিধিনাথ, ১০। শীতলানাথ, ১১। শ্রেয়াংশনাথ, ১২। বাসুপূজা, ১৩। বিমলনাথ, ১৪। অনন্তনাথ, ১৫। ধর্মনাথ, ১৬। শান্তিনাথ, ১৭। কুন্থুনাথ, ১৮। অরিনাথ, ১৯। মল্লিনাথ, ২০। মনিসুব্রত, ২১। নেমিনাথ, ২২। অরিস্টমেনী, ২৩। পার্শ্বনাথ, ২৪। মহাবীর} তীর্থঙ্কর মানবাত্মার মোক্ষলাভের উপায় বললেন। "ধর্ম নয় দর্শনই এদের মুখ্য উপজীব্য"। সঠিক শব্দটিও এদের চিন্তাধারার মূলে রয়েছে। তবে মহাবীরের মৃত্যুর পর দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে জৈন ধর্ম। কালে কালে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও এখনো বিদ্যমান আছে।

ভারতে খ্রিষ্টধর্মের প্রবেশ

খ্রিষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সাম্রাজ্যে। যিশুর মৃত্যুর পর (৫২ খ্রি.) দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সেন্ট টমাস (গৃহীনাম ডাইডিমাস) ভারতে আসেন প্রভুর ধর্ম প্রচারে। তবে মধুর নয় সে আখ্যান। জীবন দিতে হয় ঘাতকের হাতে সেন্ট টমাসকে। দ্বিমতে আছে, খ্রিষ্টধর্মের ভারতে আগমন পর্তুগিজদের সাথে ১৫ শতকের শেষভাগে।

বাংলার পূর্বকথা

ঋগ্‌বেদের অনুগামী ঐতরেয়, আরণ্যক, বৌধায়ন সূত্র, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও নানান উপপুরাণে শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে, কালিদাসকৃত রঘুবংশে এবং বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় বঙ্গদেশের। মন্ত্রদ্রষ্ট ঋষি গৌতমের বরে বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পরাক্রমশালী পুত্রের জন্ম। এই পাঁচ ভ্রাতার নামে নাম হয় ভারতের পাঁচ জনপদের। ভারতের আজকের মানচিত্রে এদের নাম না মিললেও বঙ্গের অবস্থান ছিল বিহারের ভাগলপুরে। বঙ্গ বাংলার ঢাকায়। কলিঙ্গ দক্ষিণ উড়িষ্যায়, সুহ্ম রাঢ়দেশ বা বর্ধমানে, আর পুণ্ড্রের অবস্থান উত্তরবঙ্গ বা রাজশাহী বিভাগে। জনশ্রুতিতে জানা যায়, খ্রি.পূ. ১০০০ বছর আগে ইন্দো-আর্যদের হাতে বিতাড়িত হয়ে দ্রাবিড়দের এক শাখা Beng উপজাতি এখানে এসে বসতি গড়ে।

মহাভারতে পাওয়া যায় তিন বাঙ্গালি রাজা পাণিপ্রার্থীর লিপ্সা নিয়ে হাজির হলেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। শুধু কি তাই, গ্রিক বীর আলেকজান্ডারকেও বাঙ্গালির (গঙ্গারিডি) বিক্রমের কাছে ভারত জয়ের স্বপ্ন ভুলতে হয়েছিল সেদিন। বাংলার শাসকরা বিস্তার করেছিলেন তাদের সাম্রাজ্য সারা আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য জুড়ে। এমনকি কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধেও কৌরব পক্ষে অংশ নিয়েছেন বঙ্গাধিপতি। গৌড়ের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন দ্বারকায়। সুদূর লঙ্কাতেও রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বাংলার বিজয় সিংহ। এই সেদিনও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কের কাছে উত্তরাখণ্ডের অধীশ্বর হর্ষবর্ধন রাজ্য বিস্তারে বাধা পান। ৮ থেকে ১২ শতকে পাল রাজাদের কালে বাংলার রমরমা–সেও আজ ইতিহাস। পাল থেকে সেন ঘুরে ১২ শতকের শেষে দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকের দখলে যায় বাংলা। মোগলকালে আকবর জয় করলেও বাংলা স্বতন্ত্র প্রদেশে রূপ নেয়। আর ১৭০৭ শতকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলা হয় স্বাধীন মুসলিম রাজ্য। ১৭৫৬ শতকে সিরাজ জয় করে নেন ব্রিটিশের দূর্গ কলকাতায়। আবার বাংলার বুকে শেষ স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হয় পলাশীর আমবাগানে ১৭৫৬ শতকে লর্ড ক্লাইভের কূটচালে সিরাজের পতনে। তবে, সাত বছর চলে দ্বৈত শাসন। চাতুরী করে সিরাজকে হারাবার জন্য ইনাম স্বরূপ দেয়া হয় সিরাজের খুড়ো তথা সেনাপতি মিরজাফর ও মিরকাশিমকে ব্রিটিশকে সহযোগিতার জন্য। ১৭৬৪ শতকে বক্সারের যুদ্ধে উৎখাত হলেন মিরকাশিম, বাংলা গেল ব্রিটিশ (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) শাসনে। আর ১৮৫৪ শতকে কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ ক্রাউনের শাসনাধীনে যায় বাংলা তথা ভারত।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি (বেনাপোল, বাংলাদেশ) পূর্বের ইতিহাস/লক্ষহীরার কাহিনী

হরিদাস ঠাকুরের বুঢ়নের নিজ গৃহ ত্যাগ করে তিনি বেনাপোলের জঙ্গলে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে একটি পর্ণকুটির তৈরি করে প্রত্যহ তুলসীসেবা ও তিন লক্ষ হরিনাম জপ করতেন। তাঁর ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠা দেখে সকলেই তাঁকে সম্মান করতে শুরু করেন। কিন্তু সে অঞ্চলের পাষণ্ড জমিদার রামচন্দ্র খান এতে ঈর্ষান্বিত হন। হরিদাস ঠাকুরকে অপদস্থ করার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে থাকেন । কোনোভাবে কিছু না করতে পেরে অবশেষে হীরাবাই নামে এক বেশ্যাকে নিযুক্ত করেন। সেই বেশ্যা পরপর তিনদিন নিজের রূপ-যৌবন প্রদর্শন করে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর তাকে অপেক্ষা করতে বলার ছলে হরিনাম শ্রবণ করান। আর তাতে সেই বেশ্যার চিত্ত নির্মল হয়ে যায়। তিনি ঠাকুরের চরণে স্বীয় পরিস্থিতি ব্যক্ত করে ক্ষমাভিক্ষা করেন এবং কীভাবে সবকিছুর প্রায়শ্চিত্ত হবে তার উপায় সন্ধান করেন। ঠাকুর তাকে কৃষ্ণনাম উপদেশ করেন। তখন সেই বেশ্যা ঠাকুরের আদেশে নিজের সকল সম্পদ ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করে একবস্ত্রে মণ্ডিত মস্তকে বেনাপোলেই প্রতিদিন লক্ষ নাম জপের আদর্শ স্থাপন করেন। তখন থেকেই তিনি লক্ষহীরা নামে পরিচিত হন।

বর্তমানে হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি নামে খ্যাত মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, গৌরনিতাই, হরিদাস ঠাকুর ও লক্ষহীরা দেবী পূজিত হচ্ছেন। প্রাচীন মাধবীলতা বৃক্ষ, যার নিচে বসে হরিদাস ঠাকুর ভজন করতেন, তা এখনো দৃশ্যমান। মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের বিভিন্ন লীলার মিউজিয়াম রয়েছে। শ্রীপাটের অনতিদূরে কাগজপুকুরিয়া নামে একটি স্থান রয়েছে। এটিই রামচন্দ্র খানের বসতভিটা ছিল। একবার যখন পার্ষদগণসহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এখানে আগমন করেন তখন রামচন্দ্র খান তাঁকে অপমান করেন। পরবর্তীকালে সেই অপরাধের ফলে মুসলমানেরা এ গ্রাম আক্রমণ করে। তার বসতভিটায় গোবধ করে অমেধ্য রন্ধন করে এবং সপরিবারে রামচন্দ্র খানকে হত্যা করে। বসতভিটার কোনো দর্শনীয় স্মৃতিচিহ্ন এখন নেই বললেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ

কলকাতার পূর্বকথা

গঙ্গা বা ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। অনেক কিংবদন্তি আছে কলকাতা নামটিকে ঘিরে। কারও কারও মতে, সাহেবী মুখে বাংলা ভাষা খালকাটা নাকি হয়েছে পরবর্তীতে কলকাতা। আবার শোনা যায়, ১৭৪২ শতকে শহরের তিন দিকে কাটা খাল অর্থাৎ খাল কাটা থেকেই নাকি কলকাতা নামের উৎপত্তি। কেউ বলেন কলকাতা নামটি কালিকট নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসেছে। আবার কারও মতে, কালী কুটির (কালী মন্দির) থেকে কলকাতা নামকরণ। তবে যে যাই বলুক, কলকাতা আজকের নয়। ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিলাইয়ের মনসা বিজয় কাব্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ মেলে কলকাতার নাম। ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আবুল ফজলের লেখা আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেও উল্লেখ মেলে কলকাতা নামের। এমনকি ১৬০৮ শতকে লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরী কলকাতার জমিদারীর স্বত্ব পান। কলকাতা গ্রামের আদি বাসিন্দা কোল সম্প্রদায়ের কোলহোতা থেকেই নাম হয়েছে সেদিনের কোলকাতা, কালে কালে কলকাতা। ১৯৯০ শতকে ৩০০ বছরের জন্মোৎসব পালিত হলেও দীর্ঘকালের তমসা কাটিয়ে গবেষকদের অভিমত মেনে কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে কলকাতার কোনো জনক নেই, জোব চার্নকও প্রতিষ্ঠাতা নন কলকাতা নগরীর, দীর্ঘদিন বহু মানুষের স্বপ্ন-কল্পনা-উদ্যমে গড়া এই কলকাতা।

কালীঘাটের কালী মন্দির

সমগ্র কলকাতা জুড়ে আছে অসংখ্য মন্দির। তার মধ্যে কালীঘাটের কালীমন্দির অন্যতম। ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি আটচালা এই মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ, কালের

কবলে আজ নষ্ট হয়েছে। পরবর্তীকালে জনৈক সন্তোষ রায়ের হাতে সংস্কার হয় মন্দির। আর ১৯৭১ শতকে মন্দিরের তোরণটি তৈরি করেন বিড়লা সংস্থা। সংস্কারও হয় নতুন করে ৯০ ফুট উঁচু মন্দির বিড়লাদের হাতে। তারও অনেক আগে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের গড়া আদি মন্দিরটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আদি গঙ্গার পাড়ে কালীঘাটে খুবই জাগ্রত দেবী কালিকা। মহাযোগী গোরক্ষনাথজীর প্রতিষ্ঠিত দেবী অধোভাগ দৃশ্যমান নয়। মুখ কালো পাথরে তৈরি। ১০ কেজি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা দেবীর জিভ, দাঁত, হাত সোনার পাতে মোড়া। দেবীর হাতের খড়গটি রুপোয় তৈরি, মুকুট হয়েছে সোনায়। শিবমূর্তি, ছাতা ও চালচিত্র রুপোর তৈরি। প্রতি বছর স্নান যাত্রার দিন স্নান করেন, দেবী চোখবাঁধানো, রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্নান করান প্রধান পুরোহিত। ৫১ সতী পীঠের এক পীঠও এই মন্দির। সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়ে এখানে।

মদনমোহন মন্দির

একদা খুব আর্থিক সঙ্কটে পড়েন বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিং। তাই তিনি বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে ১ লক্ষ টাকা কর্জে ও বিনিময়ে বন্ধক রাখেন শ্রীবিগ্রহকে। অকটারলোনি মনুমেন্ট থেকেও উচ্চ ১৭৩০ শতকে গড়া মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন রুপোর সিংহাসনে দেড়ফুট উঁচু অষ্টধাতুর বিগ্রহ। ১৮২০ শতকে ভূমিকম্পে মন্দিরটি ধ্বংস হলে পুনরায় মন্দির হয় নতুন করে। মন্দিরের বাইরের অষ্টভূজাকৃতি ৯ চূড়োর রাসমঞ্চটিও সুন্দর। ডানে শোভারাম বসাকের সবজির বাজার অর্থাৎ শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন আর বাঁয়ে শোভারামেরই প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায় মন্দির। এই শ্যামরায় থেকে শ্যামবাজার নামকরণ।

বিড়লা মন্দির

গড়িয়া হাটের অদূরে কলকাতা ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে বিড়লা মন্দির অবস্থিত। বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণের। ১৯৯৬ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে ২৬ বছর ধরে ১৮ কোটি টাকা

ব্যয়ে ৪৪ কাঠা জমির উপর ১৬০ ফুট উঁচু মন্দির হয়েছে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের আদলে বিষ্ণুপুর ও সোমপুরা শৈলীর সমন্বয়ে তৈরি মন্দিরের বহির্ভাগ পান্না থেকে আনা স্যান্ডস্টোনে, অন্দর মাকরানার শ্বেতমর্মরে। ইতালিয়ান মার্বেলও ব্যবহৃত হয়েছে বৈভব বাড়াতে। সনাতন শৈলীর সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় গড়া মন্দিরের কারুকার্য ও ভাস্কর্যে অভিনব আছে। ভাস্কর এসেছে আগ্রা, মির্জাপুর, মজফরপুর থেকে। দরজার উপরে রুপোর কাজ, থামগুলোর মাথায় সূক্ষ্ম কাজ, গর্ভগৃহে বেলজিয়াম কাচে ঝাড় অনবদ্য। রাধাকৃষ্ণ, শিব ও দুর্গা দেবীর বিগ্রহ আছে। গীতার আলেখ্য মূর্ত হয়েছে মর্মরে।

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির

কালী মন্দিরের জন্য দক্ষিণেশ্বরের জগৎজোড়া খ্যাতি। কাশী চলার পথে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কৈবর্তের মেয়ে জানবাজারের রানি রাসমণি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫ একর জমির উপর ১৮৪৭ শতকে শুরু করে ১৮৫৫ শতকে গড়ে তোলেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির।

মূল অর্থাৎ নবরত্ন মন্দিরে সহস্র পাঁপড়ির রৌপ্য-পদ্মের উপর শায়িত শিবের বুকে দেবী কালী দাঁড়িয়ে। একখণ্ড পাথর খুঁদে রূপ পেয়েছে দেবমূর্তি। কৈবর্তে গড়া মন্দিরে কট্টর ব্রাহ্মণেরা বয়কট করে দেবার্চনা। অবশেষে কামারপুকুর থেকে গদাধর চট্টোপাধ্যায় এলেন পূজার্চনার দায়িত্ব নিতে। কালে কালে গদাধর হলেন সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সাধক রামকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ জড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মাতৃমন্দিরের সঙ্গে। রামকৃষ্ণদেব এই মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে বাস করতেন। ঘরটিতে আজও ভক্তজনদের সমাগম ঘটে। এছাড়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারে রানি রাসমণির, ঠাকুর রামকৃষ্ণের মন্দির দেখে নিতে পারেন। গঙ্গার পাড় ধরে দ্বাদশ শিব মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। পঞ্চবটি (অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক, আমলকী) বেদীটিও দর্শনার্থীদের নিবিড় শান্তি জোগায়।

বেলুড় মঠ

দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার অপর (পশ্চিমে) পাড়ে গড়ে উঠেছে বেলুড় মঠ। ১৮৮৬ সালে প্রয়াত ঠাকুরের পূত অস্থি ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকান্দ কাঁধে করে বয়ে

এনে প্রতিষ্ঠা করেন বেলুড়ে। আর ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত এই মঠ রূপ পায় সেই পুণ্যভূমে। মঠের স্থাপত্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের নিদর্শন রয়েছে। চার্চ, মসজিদ আর মন্দির–এই তিনের সমন্বয়ে রূপ পেয়েছে বেলুড় মঠ। মঠটি পরিচালনা করেন ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের মূল দপ্তর এই মঠে।

ত্রিবেণী

ব্যান্ডেল থেকে ৪ কি.মি. উত্তরে অতীতের বন্দরনগরী সপ্তগ্রাম আজ হয়েছে বাঁশবেড়িয়া। সেকালে হুগলি (গঙ্গা), সরস্বতী ও কুন্তী তিন নদী বয়ে যেত সপ্তগ্রাম দিয়ে। ৫০০ বছর আগে কুন্তী ও ৮০০ বছর আগে সরস্বতী শুকিয়ে যাওয়ায় লুপ্ত হয় বন্দর। নানা কিংবদন্তিতে ঘেরা এর অনন্তবাসুদেব ও হংসেশ্বরী মন্দিরের পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। অনন্তবাসুদেব মন্দিরটি ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজা রামেশ্বর দত্তের তৈরি। বাঁশবেড়িয়া মন্দির নামেও সমধিক খ্যাত অনন্তবাসুদেব। মন্দিরের ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির অলঙ্করণ চিত্তাকর্ষক। কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান উৎকীর্ণ হয়েছে একরত্ন শৈলীর মন্দির। গর্ভগৃহে মূল বিগ্রহের অনুপস্থিতিতে খোদাই করা দেবতা বাসুদেব অর্থাৎ বিষ্ণু, চারপাশের ঘরগুলোতে শিবলিঙ্গ।

আর বাসুদেবের পার্শ্বেই রাজবাড়ির অঙ্গনে ১৮০১ সালে বাঁশবেড়ের রাজা নৃসিংহদেবের হাতে শুরু হয়ে ১৮১৪ সালে ছোটরাণী শঙ্করীর হাতে শেষ হয় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এয়োদশরত্ন হংসেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের ইট, কাঠ ও পাথরের কাজ অতুলনীয়। পাথর এসেছে চুনার থেকে, কারিগর এসেছে জয়পুর থেকে।

তারকেশ্বর

অনাদি স্বয়ম্ভু দেবতা আদিনাথ। আবিষ্কার মুকুন্দ ঘোষের আর স্বপ্নাদিষ্ট রাজা ভারামল্ল জঙ্গল কেটে মন্দির গড়েন। ১৭২৯ শতকে তারকানাথের আটচালা মন্দিরটি শিয়াখালার গোবর্ধন রক্ষিতের তৈরি। খুবই জাগ্রত এই দেবতা। আর আছেন মন্দিরে বাসুদেব, দ্বিমতে ব্রহ্মা। মন্দিরের সাথে দুধপুকুরে স্নানে পুণ্য হয়। ব্যাপক সংস্কারও হয়েছে দুধপুকুর। সাথে রাজবাড়ী দর্শনীয়।

কঙ্কালী পীঠ (সতীর ৫১ পীঠের এক পীঠ)

গ্রামের নাম বেঙ্গুটিয়া। নতুন মন্দির হয়েছে কুণ্ডের পাড়ে। দেবীর প্রতীকি রূপী দেবতা ত্রিশুল, আর আছে পটে কালীরূপী কঙ্কালী। সতীর একান্ন পীঠের শেষ পীঠও এই কঙ্কালী পীঠ। সতীর কাঁকাল অর্থাৎ কোমর পড়ে কুণ্ডের জলে। জনশ্রুতি আছে, দেবীর কাঁকালরূপী শিলাখণ্ড মন্দির, সাথে কুণ্ডের অবস্থান।

বক্রেশ্বর

এখানে মামাভাগ্নে পাহাড় অবস্থিত। রামায়ণ ও মহাভারতে এই মামাভাগ্নে পাহাড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামচন্দ্র বনবাসকালে পাণ্ডবরা যুধিষ্ঠিরকে এখানেই যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন–সেই থেকে জায়গার নাম যুবরাজপুর। কালে কালে দুবরাজপুর। আর আছে সীতাদেবীর ব্যবহৃত সঞ্চিত জল পাহাড়ে।

কালনা

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির। জনশ্রুতি আছে যে, নবদ্বীপে যে নিম বৃক্ষতলে জন্ম হয়েছিল নিমাই-এর, সেই নিমদারুতে তৈরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহে আজও নাকি আবির্ভাব ঘটে মহাপ্রভুর। কথাও বলত সেকালে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গৌরীদাসের সনে দারুমূর্তি। ঝলক দর্শনে দেবদর্শনের প্রথা। মহাপ্রভুর নায়ের বৈঠা, পাদুকা ও হাতে লেখা পুথি সযত্নে রক্ষিত। পার্শ্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থল অমলীতলায় পায়ের ছাপ আজও দৃশ্যমান।

কালনা চকবাজার আরেক অনন্য মনুমেন্ট অব ন্যাশনাল ইম্পর্ট্যান্স নবকৈলাস বা ১০৮ শিব মন্দির। ১৮০৯ সালে বর্ধমানরাজ তেজ বাহাদুরের গড়া শিল্প সুষমামণ্ডিত গঠনশৈলী ও স্থাপত্যে অনবদ্য। প্রাচীরে ঘেরা দুই সারিতে বৃত্তাকারে মন্দির হয়েছে। প্রথম বৃত্তে ৭৪টি, দ্বিতীয় বৃত্তে ৩৪টি শ্বেতমর্মরে শিব মন্দির। চত্বরের মাঝখানে দাঁড়ালে প্রতিটি লিঙ্গমূর্তিই দৃশ্যমান হয়।

অন্নপূর্ণা মন্দির

ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটের স্বল্প দূরে গঙ্গার পাড়েই দক্ষিণেশ্বরের আদলে তৈরি রানি রাসমণির মেয়ের অন্নপূর্ণা মন্দির।

কৃত্তিবাসের জন্মস্থান

কৃষ্ণনগর থেকে রানাঘাটের বাসে করে যাওয়া যায় ফুলিয়া পাড়ায়। সেখানে ১৪৪০ শতকে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। ৩৬টি তৈলচিত্রে রামায়ণ আখ্যান ও রামায়ণের বিবিধ সংস্করণ তথ্যকেন্দ্রকে সমৃদ্ধ করেছে। লাগোয়া হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ ভজনস্থলী মন্দির। মুসলমান হয়ে বৈষ্ণবীয় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থাকার অপরাধে প্রাদেশিক শাসকের বিচারে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করেও প্রার্থনা করেন–এসব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ। মোরে দোহে নহু এ সবার অপরাধ। তরুকুঞ্জ শোভিত সাধনপীঠে মন্দিরও হয়েছে হরিদাসের। সামনে দিয়ে বয়ে যেত গঙ্গা সেকালে। চলার পথেই খেলার মাঠে বেদী করে ঘেরা ঐতিহাসিক বটবৃক্ষ–যার মিষ্টি ছায়ায় বসে কবি রামায়ণ লেখেন। প্রতি বছর মাঘের শেষ রবিবার কৃত্তিবাস জন্মোৎসব পালিত হয়।

শান্তিপুর

শান্তমুনির বাসস্থান শান্তপুর বা শান্তিপুর। নবদ্বীপ, মায়াপুরের মতো শান্তিপুরও বৈষ্ণব ধর্মের আরেক পীঠস্থান। ১৪৩৪ খ্রি. শ্রীহট্টের নবগ্রামে কমলাক্ষের জন্ম হয়। বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করে বেদ-পঞ্চানন বা অদ্বৈত আচার্য হন কমলাক্ষ। দেহত্যাগ করেন ১২৫ বছর বয়সে। তিনি ৫২ বছর বয়সে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলে তাঁর সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ধরায় নামেন নবদ্বীপে। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের মহামিলনও ঘটে বাবলা গ্রামের শ্রীপাটে। এমনকি সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তথা জটিলা বাবার জন্মও এই শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে। শ্যামাচাঁদ, গোকুলচাঁদ, জলেশ্বর ছাড়াও এখানে রয়েছে আরো অনেক মন্দির ।

হরিদাসপুর (নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট)

হরিদাসপুর উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ থেকে বনগাঁগামী লোকাল ট্রেনে বনগাঁ আসতে হবে। অথবা শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনে রানাঘাট নেমে, সেখান থেকে বনগাঁগামী ট্রেনে বনগাঁ নেমে, সেখান থেকে রিক্শা-ভ্যানে হরিদাসপুর শ্রীপাটে আসা যায়। চাকদহমোড় ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে বা কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের সামনে থেকে বনগাঁগামী বাসে বনগাঁ বাসস্ট্যান্ডে নেমে রিকশা-ভ্যানে এই শ্রীপাটে আসা যায়।

এখানে নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলের জঙ্গলে লক্ষহীরাকে উদ্ধার করার পর লক্ষহীরা মস্তক মুণ্ডন করে সেখানে ঐকান্তিকভাবে হরিনাম গ্রহণ করতে থাকেন। তারপর বেনাপোলের সেই স্থানের দায়িত্ব লক্ষহীরার প্রতি অর্পণ করে হরিদাস ঠাকুর গঙ্গার তীরবর্তী স্থান ফুলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। যাত্রাপথে তিনি এই স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করে এক তুলসী মঞ্চের নিকটে বসে হরিনাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই হরিদাস ঠাকুরের নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম হয় হরিদাসপুর।

বহু প্রাচীনকাল থেকে এই স্থানে সেবা হয়ে আসছিল, ভক্তরা প্রতি বৎসরই পঞ্চম দোলে মহোৎসব করতেন। কালক্রমে এই স্থানের সেবার অত্যন্ত জীর্ণদশা এসে উপনীত হয়। সেই সময় স্বরূপদাস প্রভু এখানকার সেবাইত ছিলেন। ইংরেজি ১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কয়েকজন বিদেশি ভক্ত নিয়ে এই স্থানে আগমন করেন এবং স্বরূপদাস প্রভু তাঁকে অভ্যর্থনা করে প্রসাদ আপ্যায়ন করান এবং এই স্থানে হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাটের সেবাভার আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ওপর অর্পণ করেন। তখন থেকে এই স্থানের সেবাপূজা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে এই স্থানের উন্নতি হতে শুরু করে এবং সুরম্য অতিথিশালা, সুন্দর মন্দির ও নাট মন্দির নির্মিত হয়। নাট মন্দিরের পূর্বদিকে হরিদাস ঠাকুর যে তুলসীবেদীর নিকটে বসে হরিনাম করতেন তা পাকা করে বাঁধানো হয়েছে। গত ২০০২ সালে পঞ্চম দোলে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের অন্যতম আচার্য শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজ অনেক বিদেশি ভক্ত সমভিব্যাহারে এইস্থানে উপনীত হয়ে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই এবং অপর প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং একইসঙ্গে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন।

হরিদাসপুর হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী স্থান। বহু লোক প্রতিদিন এই স্থানের সামনে দিয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করেন। বাংলাদেশের ভক্তরা যাতায়াতের পথে এই শ্রীপাটে এসে স্নান আদি কার্য করে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই পাটের খুব কাছেই হচ্ছে নাউভাঙ্গা নদী। এই নদীর উপরে সুন্দর সেতু নির্মাণ হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় সেই সেতুর নামও ঠাকুর হরিদাস সেতু রাখা হয়েছে। বর্তমানে এই স্থানের প্রধান সেবক হলেন যুগলকিশোর দাস ব্রহ্মচারী। এই স্থানে আগাম ফোন করে আসলে থাকা ও প্রসাদ পাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। মোবাইল নং- ৯১৫৩৮২৯০০২।

নবদ্বীপ

নবদ্বীপ ধাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। বর্ধমান জেলার কিয়দংশ চাপাহাটি, সমুদ্রগড়, বিদ্যানগর, মামগাছি প্রভৃতি স্থান নবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত। নবদ্বীপ বলতে নয়টি দ্বীপকে বোঝায়। ষোল ক্রোশ নবদ্বীপের মানচিত্র, ১৯১৬ সালে কৃষ্ণনগর থানার সরকারি নকশা থেকে গৃহীত। যথাক্রমে নয়টি দ্বীপ হলো:

১। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীমায়াপুর, বল্লালদিঘি, বামুনপুকুরের কিছু অংশ, শ্রীনাথপুর ও গঙ্গানগর ইত্যাদি)

২। শ্রীসীমন্ত দ্বীপ (বামুনপুকুরের কিছু অংশ, সোনাডাঙ্গা, রাজাপুর, মোল্লাপাড়া, বিষ্ণুনগর, বেলপুকুর, হাডাঙ্গা ইত্যাদি)

৩। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, বালিরচর, মহেশগঞ্জ, তিওরিখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর ব্রিজ, সুবর্ণবিহার, দে পাড়া, নৃসিংহ পল্লী, গোদ্রুম, হরিশপুর)

৪। শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজদিয়া, ওয়াসিতপুর, ব্রাহ্মণপুষ্কর, হাডাঙ্গা, ব্রহ্মনগর ইত্যাদি)

৫। শ্রীকোলদ্বীপ (বর্তমান শহর নবদ্বীপ, কৌল আমেদ, কোলেরগঞ্জ, চরগদখালি, বকখালি সংলগ্ন নিদয়া, পারমেদিয়া, তঘরীপাড়া, তেঘরী কোল ইত্যাদি)
৬। শ্রীঋতুদ্বীপ (চাপাহাটি, সমুদ্রগড়, রাতুপুর ইত্যাদি)
৭। শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহ্নুনগর, শ্রীরামপুর ইত্যাদি)
৮। শ্রীমদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলারি, গঙ্গাপ্রসাদ, দেওয়ানগঞ্জ বা রামচন্দ্রপুর, প্রতাপনগর ইত্যাদি)
৯। শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্র পাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গঞ্জডাঙ্গা, ভাড়ুইডাঙ্গা বা ভরদ্বাজ টিলা ইত্যাদি)

নদীর ঘাট থেকে ফেরি, নৌকা করে ভাগীরথী পেরিয়ে দ্বীপভূমি মায়াপুর থেকে গৌর গঙ্গাদেশ নবদ্বীপ পৌছান। জলঙ্গীর জলে জেগে ওঠা নবদ্বীপ–কালে কালে নবদ্বীপ। দ্বিমতে, গঙ্গার পূর্ব পাড়ের চারটি দ্বীপ (অন্ত, সীমান্ত, গোদ্রুম, মধ্য) আর পশ্চিম পাড়ে পাঁচটি দ্বীপ (কোল, ঋতু, মদদ্রুম, জহ্নু ও রুদ্র)–এই নয়টি দ্বীপের সমন্বয়ে নবদ্বীপ। শৈব-বৌদ্ধ-শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়ও ঘটেছে নবদ্বীপে।

ভাগীরথীর পাড়ে নবদ্বীপে দোল পূর্ণিমা তিথিতে নিমবৃক্ষতলে শ্রীচৈতন্য দেবের জন্ম। তাঁর প্রকটকাল ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.। শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরও জন্ম আজকের এই নবদ্বীপে। তাই আজ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র হিসেবে খ্যাত এই নবদ্বীপ। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত দারু নির্মিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ মন্দির, বুড়োশিব, হরিসভা, জাগ্রতা লোকায়ত দেবী পোড়ামাতলা, মহাপ্রভু মন্দির, অদ্বৈত প্রভুর মন্দির, জগাই-মাধাই, শচীমাতা-বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মভিটায় নিত্যানন্দ প্রভুর মন্দির, বড় আখড়া, শ্রীশ্রী গোবিন্দ জিউ, সোনার গৌরাঙ্গ, ষড়ভূজ মহাপ্রভু, শ্রীবাস অঙ্গন পাড়ায় সোনার মূল গৌরাঙ্গ, সমাজবাড়ি, বড় রাধেশ্যাম, রাধাবাজারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন, দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মণিপুর পাড়ায় সোনার গৌরাঙ্গ, বঙ্গবাণীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমসহ মোট ১৮৬টি মন্দির রয়েছে নবদ্বীপে। অতীতে সংস্কৃত ও বৈষ্ণব দর্শনের পীঠস্থানও ছিল এই নবদ্বীপ। লক্ষণ সেন গৌড় থেকে রাজ্যপাট তুলে রাজধানীও গড়েন নবদ্বীপে। ১১, ১২ শতকে বাংলার রাজধানী ছিল নবদ্বীপে।

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান থেকে কিছুটা দক্ষিণ দিকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)–এর প্রধান কেন্দ্র শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শ্রীশ্রী রাধামাধব অষ্টসখী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ স্থাপন করেছেন।

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের প্রধান গেটে প্রবেশ করে বামদিকে দর্শন করা যাবে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা–আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ স্বামী

প্রভুপাদের ভজনকুটির। এই ভজনকুটিরে শ্রীশ্রীগৌর নিতাই শ্রীবিগ্রহ সেবিত হচ্ছেন। এবং সমগ্র ভারত থেকে পর্যটনকারীরা সেবিত বিগ্রহ দর্শন করছেন। এই ভজনকুটির থেকেই মায়াপুরে বিশ্ব পারমার্থিক রাজধানী গড়ার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছে। এখানে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন হয় ২৪ ঘন্টা।

ভজনকুটির থেকে দক্ষিণ দিকে তিন চার মিনিট হাঁটলে শ্রীল প্রভুপাদ পুষ্প সমাধি মন্দির ও মিউজিয়াম দর্শন করা যাবে। শ্রীল প্রভুপাদ পুষ্প সমাধি মন্দির থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে সুলভ ভোজনালয়। মায়াপুরে আগত সমস্ত তীর্থযাত্রীগণ সুলভে কুপন সংগ্রহ করে প্রাতঃরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজ করতে পারবেন এখানে। এছাড়া প্রধান গেটের সামনে গদাভবনের স্টল থেকে কুপন সংগ্রহ করে স্পেশাল মধ্যাহ্নকালীন এবং নৈশভোজ করতে পারবেন।

প্রধান গেটে প্রবেশ করে ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোতে থাকবে অথবা সমাধি মন্দির থেকে পূর্বদিকের রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিট অগ্রসর হলেই মূল মন্দির অর্থাৎ মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে আসা যাবে। মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমে রয়েছে নিত্য নব সাজে সুসজ্জিত অষ্টসখী পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধামাধব। রাধামাধব মন্দিরের ডানদিকে রয়েছে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির। এই মন্দিরের পিছনে রয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অষ্টধাতুময় শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ। রাধামাধব মন্দিরের সামনের দিকে রাধামাধবকে দর্শনরত রয়েছেন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ। শ্রীল প্রভুপাদের ডানদিকে রয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী। রাধামাধব মন্দির থেকে দক্ষিণ দিকে পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলে বৃহদায়তন গোশালা দর্শন করা যাবে।

ইস্‌কন মন্দির ক্যাম্পাসের ভেতর সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা নবদ্বীপ ধাম দর্শন করতে এসে আশ্রয় পাওয়ার জন্য গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অতিথি ভবন ও ধর্মশালা। যেমন-গদা ভবন, শঙ্খ ভবন, চক্র ভবন, পদ্ম ভবন , বংশী ভবন, প্রভুপাদ ভবন, হরেকৃষ্ণ ধর্মশালা, গৌরাঙ্গ কুটির, নিত্যানন্দ কুটির, গৌরনিতাই ধর্মশালা ইত্যাদি।

এখানে রয়েছে বৃহদায়তন ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থা ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন কার্য চলছে। এটি রয়েছে বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবনে। মেইন রাস্তার পাশেই রয়েছে হরেকৃষ্ণ নামহট্ট ভবন। এর ভেতরে ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে সারা ভারতের প্রতিটি নগরে ও গ্রামে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঘরে ঘরে গিয়ে গৃহে থেকে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করছেন।

এছাড়া নবদ্বীপ ধাম দর্শন করার জন্য এখানে রয়েছে ধাম সেবা বিভাগ এবং ট্যুরিজম বিভাগ, আজীবন সদস্য বিভাগ ইত্যাদি। এখানে আরও রয়েছে সংকীর্তন বিভাগ, বৈদিক গুরুকুল, নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণ বিভাগ, মায়াপুর ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন, শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি শিক্ষার জন্য মায়াপুর একাডেমি। এছাড়া নবদ্বীপ ধামে আগত তীর্থযাত্রীদের সহায়তার জন্য আরও অন্যান্য বিভাগ রয়েছে।

আরও দর্শনীয় স্থান রয়েছে–ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ মঠ, জন্মভিটা (নিমতলা) তথা মন্দির, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বা শ্রীবাস অঙ্গন, অদ্বৈত ভবন, ২৯ চুড়োর শ্রীচৈতন্য মঠ, বিপরীতে পুণ্যিপুকুর শ্যামকুণ্ড, শ্রীচৈতন্য মঠ, একই চত্বরে রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন, বৃন্দাবনের তমাল বৃক্ষ, চৈতন্যলীলার প্রদর্শনশালায় মাসি ও মেসোর মন্দির। অদূরে বামুনপুকুরে চাঁদকাজীর (মৌলানা সিরাজুদ্দীন) সমাধি পীঠ তথা ৫০০ বছরের গোলকচাঁপা ফুল গাছটিও ভক্তপ্রাণদের দেখে নেওয়া উচিত। জনশ্রুতিতে জানা যায়, এই চাঁদকাজী ঘোরবিরোধী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। নাম সংকীর্তনও বন্ধ করেন কাজী। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মশাল মিছিল তথা সংকীর্তন শোভাযাত্রা নিয়ে কাজীর বাড়ি যান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। যুক্তিতর্কে পরাভূত হয়ে ভক্ত হন কাজী সাহেব।

মাসির বাড়ি

শ্রীবাস অঙ্গন থেকে প্রায় ১৫০ মিটার উত্তর-পূর্বে এখানে মহাপ্রভুর মাসি সর্বজয়া দেবী ও চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সমাধি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী গান্ধার্বিকাগিরিধারী আছেন। এখানে স্মৃতি গোবর্ধন, শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড আছেন, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর সমাধি মন্দির দর্শনীয়।

কলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থান/যোগপীঠ/ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবন

মহাযোগপীঠ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন নবদ্বীপ ধামের অন্তর্দ্বীপে অবস্থিত। এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান। ১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শনিবার সন্ধ্যাকালে (১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ ১৮ই ফেব্রুয়ারি) চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অগণিত লোক গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে মহাহরিধ্বনি করছিলেন, সেই সময়ে শচীমাতার কোলে নিমগাছের নিচে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর পূর্বে শচীমাতার গর্ভে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র গৌরহরি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু এখানে ২৪ বছর পর্যন্ত অবস্থান করে বিবিধ লীলা নামে অভিহিত আছেন। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিগ্রহ, রাধাকৃষ্ণ ও

পঞ্চতত্ত্বের বিগ্রহ আছেন। জগন্নাথ মিশ্রের সেবিত অধোক্ষজ বিষ্ণু আছেন। ক্ষেত্রপাল শিব, গৌর গদাধর, লক্ষ্মীনৃসিংহ ও জগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা ও শিশু নিমাই-এর বিগ্রহ পূজিত হচ্ছেন। এখানে আছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতি মন্দির।

পৃথুকুণ্ড বা বল্লালদিঘি

গর্গ সংহিতায় শ্রীভগবান বলেছেন, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজাত রাজশ্রেষ্ঠ পৃথু পুরাকালে এই স্থানে অতিশয় উত্তম তপস্যা করেছিলেন। তাঁরই এই অদ্ভুত কুণ্ড। হে অর্জুন, নরাধমও এর জল পান করলে সর্বপাপ মুক্ত হয় এবং এই কুণ্ডে স্নান করলে পরমধামে গমন করে থাকে।" সত্যযুগে ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু মহারাজ পৃথিবীর উঁচু-নিচু ভূমি সমতল করবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। এই স্থানে লোকেরা মাটি খনন করলে চতুর্দিক থেকে এক দিব্য জ্যোতির্ময়ী প্রভা উত্থিত হয়। লোকেরা রাজাকে সেকথা বললে সেই আশ্চর্য জ্যোতি দর্শন করে তিনি ধ্যানে উপবিষ্ট হলেন। ধ্যানযোগে জানলেন, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে এই স্থানে অবতীর্ণ হবেন। রাজা পৃথু এই স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখবার জন্য একটি মনোহর বিস্তৃত কুণ্ড খনন করালেন। এই কুণ্ডই নবদ্বীপ ধামে পৃথুকুণ্ড নামে জনসমাজে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন পৃথুকুণ্ডের উপর দিঘি খনন করে তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করার আশায় এই স্থানের নাম 'বল্লালদিঘি' নামকরণ করেছিলেন। বর্তমানে এই পৃথুকুণ্ড বা বল্লালদিঘি লুপ্ত হয়ে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে।

মুরারীগুপ্ত ভবন

বল্লালদিঘির পূর্ব পাড়ে হনুমানের অবতার শ্রীল মুরারীগুপ্ত বাস করতেন। বর্তমানে এখানে রাম-সীতার মন্দির বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুরারীগুপ্তকে কৃষ্ণনাম করতে নির্দেশ দিলে তার মুখে কেবল রাম নাম এবং শ্রীরামচন্দ্রকেই স্মরণ হচ্ছিল। মনোদুঃখে সেজন্য কাঁদতে থাকলে তাঁর সামনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্ররূপে প্রকাশিত হয়ে বলেন, তুমি তো হনুমান। তুমি রাম নাম কেন ছাড়বে? মুরারীগুপ্ত ঠাকুর দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র, তার দুই পাশে লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী আবার নিজেকে হনুমান দেখে প্রেমে গড়াগড়ি করলেন। বর্তমানে এখানে সীতা-রাম-লক্ষ্মণ বিগ্রহ পূজিত হচ্ছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন

চন্দ্রশেখর আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মেসোমশাই। স্নেহময়ী মাসি সর্বজয়া এখানে খেলা করতেন, কৃষ্ণলীলা নাটক অভিনয় করতেন। নাটকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা মেসোমশাই করতেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এ স্থানেই শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরগান্ধার্বিকা গিরিধারী বিরাজমান। মন্দিরের চতুর্দিকে সাত্বত পুরাণ কথিত শুদ্ধ চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণের বিগ্রহ বিদ্যমান। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এখানেই শতকোটি নামযজ্ঞ করেন। তাঁর গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর সমাধি, রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন, তমালকেলিকদম্ব বৃক্ষ, তাঁর সমাধি মন্দির ও ভজনকুটির এখানে বিরাজমান।

শ্রীঅদ্বৈত ভবন

এখানে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু দুর্দশাগ্রস্ত কলিহত জীবের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাজল ও তুলসী মঞ্জুরী দিয়ে পাঞ্চরাত্রিক বিধান অনুসারে অর্চন করে শ্রীকৃষ্ণকে হুংকার দিয়ে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে মর্ত্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হলো। এই স্থানেই অদ্বৈত আচার্যের টোলে মহাপ্রভুর দাদা বিশ্বরূপ পড়তেন। বহু বৈষ্ণব সঙ্গে অদ্বৈত আচার্য কৃষ্ণকথারসে নিমগ্ন থাকতেন।

শ্রীগদাধর অঙ্গন

অদ্বৈত আচার্যের ভবনের কাছেই মাধব মিশ্র বাস করতেন। তাঁর পুত্র গদাধর ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যসাথী। গদাধর অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছেলে। এক সময় শচীমাতা বলেছিলেন, গদাধর আমি নিমাইকে সামলাতে পারি না। তুমি বাবা ওর সঙ্গে সর্বদা থাকো। নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলে গদাধরও সন্ন্যাসী হয়ে নীলাচলে থাকেন। গৌর গদাধর বিগ্রহ এখানে বিরাজমান।

শ্রীবাস অঙ্গন

যোগপীঠ থেকে ১০০ মি. উত্তরে শ্রীবাস অঙ্গন। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ নারদমুনির অবতার শ্রীবাস ঠাকুর পূর্ববঙ্গ থেকে এসে এখানে বসবাস করেন। মহাপ্রভু এখানে তাঁর পার্ষদ ভক্তদের নিয়ে প্রতিদিন রাত্রে হরিনাম সংকীর্তন করতেন। এখানে তিনি আট প্রহরিয়া মহাভাব প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীবাস ঠাকুরকে চতুর্ভুজ রূপ, মুরারিগুপ্তকে রামচন্দ্র রূপ, নৃসিংহ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন। এখানে শ্রীশ্রী রাধামাধব, পঞ্চতত্ত্ব ও নৃসিংহ প্রকাশ বিগ্রহ আছেন। শ্রীবাস অঙ্গনকে রাসস্থলী বলা হয়।

চাঁদকাজীর সমাধি

পূর্বলীলায় চাঁদকাজী ছিলেন কংস। মহাপ্রভুর সংকীর্তনে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তিনি। মহাপ্রভু হাজার হাজার ভক্ত নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। কাজী মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং অবশেষে কৃষ্ণভক্ত হন। চাঁদকাজী সমাধির উপরে পাঁচশত বছরের পুরানো গোলোকচাঁপা ও নিমবৃক্ষ রয়েছে যা যথাক্রমে চাঁদকাজী ও মহাপ্রভুর প্রতীক স্বরূপ।

শ্রীধর অঙ্গন

শ্রীধর ঠাকুর ছিলেন ব্রজলীলায় কুসুমাসব সখা। দরিদ্র সরল শ্রীধর ঠাকুর রোজ রোজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কলা, মোচা, থোড়, লাউ দিতেন। তার কলাবাগান ছিল। গৃহে রোজ রাত্রে উচ্চকণ্ঠে হরিনাম জপ করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তন করতে করতে এসে এখানে বিশ্রাম নিতেন।

রাজাপুর শ্রীজগন্নাথ মন্দির

ইস্‌কন মন্দির থেকে ৩ কি.মি. উত্তর-পূর্বে চাঁদকাজীর সমাধি, সেখান থেকে ১ কি.মি. পূর্বে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির, যেখানে অভিন্ন পুরীর জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা মহারানীর

শ্রীবিগ্রহ সেবিত হচ্ছেন। সবররা রক্তবাহুর ভয়ে পুরীধাম থেকে জগন্নাথকে নিয়ে এসে এখানে অবস্থান করেন। তাই এই গ্রামের নাম সবরডাঙ্গা, বর্তমানে বর্ণ বিপর্যয় হয়ে সরডাঙ্গা নামে পরিচিত। এখানে অপূর্ব মনোরম জগন্নাথের আম্রকানন ও পুষ্প উদ্যান রয়েছে। এই জগন্নাথ মন্দির বর্তমান ইস্কন ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত।

এককালে এই অঞ্চলটি ছিল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভক্ত সবরগণের পল্লী। সে সময় থেকেই এই অঞ্চলটি সবরডাঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে নামটি অপভ্রংশ হয়ে শুধু সরডাঙ্গা নাম নেয়। পরবর্তীকালে এই ভূখণ্ডে বহু রাজা, মহারাজা বসবাস করেছেন। সর্বশেষ বাংলার সেন বংশের রাজাগণ এই স্থানে বসবাস করে গেছেন। বল্লাল সেনের পুত্র শ্রীলক্ষ্মণ সেনের ভগ্ন রাজপ্রাসাদের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আজও এখানে রয়েছে, যা এ অঞ্চলে বল্লাল ঢিবি নামে খ্যাত। রাজা, মহারাজারা বাস করতেন বলে কালক্রমে সেই প্রাচীন সবরডাঙ্গা বা সরডাঙ্গা অঞ্চল রাজাপুর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশ/তিনশ বছর আগে প্রাচীন সরডাঙ্গা তথা রাজাপুর নামক এই অঞ্চলে শ্রীযুক্ত জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় নামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এক পরম ভক্ত বাস করতেন। তাঁর পত্নী সুষমা দেবীও ছিলেন স্বামীর ন্যায় ভক্তিপরায়ণা। এই ভক্ত দম্পতি প্রতি বছরই রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য পুরীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। কিন্তু কালে কালে তার বয়স বাড়তে থাকে এবং এক সময় কোনো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তার দুটো চোখই অন্ধ হয়ে যায়। তাই অন্ধত্বের জন্য সেই বছর রথযাত্রার সময় জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুরীধামে যাওয়া হলো না। তার অঞ্চলের অনেকেই সেই বছর রথযাত্রার সময় পুরীধামে যাত্রা করলেন। কিন্তু কেউই তিনি অন্ধ বলে তাকে নিয়ে যেতে রাজি হলেন না।

তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। এখন আর তার আরাধ্য দেবতার বিগ্রহ দর্শন করতে পারবেন না, পুরীধামে যাত্রা করতে পারবেন না, রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না—এই দুঃখ তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এ জীবনে আর বেঁচে থেকেই বা কী লাভ! ভক্তির পরম আবেগ, অভিমান ও দৈন্যে মিশ্রিত হৃদয়ে তিনি জগন্নাথের চরণের উদ্দেশ্যে দূর থেকেই অশ্রু বর্ষণ করতে করতে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন যেন ভগবান তার এই অসমর্থ দেহের অবসান ঘটান।

পরম কৃপাময় পরমেশ্বর ভগবান জগন্নাথ অবশেষে যেন ভক্তের সেই তীব্র প্রার্থনা শুনতে পেলেন। গভীর রাত্রে নিদ্রাচ্ছন্ন জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পেলেন, দুঃখ করো না। আগামীকাল প্রত্যুষে তুমি গঙ্গাস্নানে যাও। সে সময় তোমার কাছে একটি কাষ্ঠখণ্ড ভেসে আসবে। সেই কাষ্ঠখণ্ড নিজ গৃহে বয়ে এনে বামুনপুকুরবাসী এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সূত্রধরকে দিয়ে আমার বিগ্রহ নির্মাণ করে তা প্রতিষ্ঠিত করে নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা করবে।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে রোমাঞ্চিত, পুলকিত, উৎকণ্ঠিত ভক্ত জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গেলেন। গঙ্গাজলে প্রথম ডুব দেওয়ার পরই তিনি অনুভব করলেন তার মাথায় যথার্থই কী যেন স্পর্শ করছে। জল থেকে মাথা তুলে তিনি দেখলেন, সেটি একটি সুদৃশ্য কাষ্ঠখণ্ড। আনন্দে, কম্পিত বিস্ময়ে তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন সেই দিব্য কাষ্ঠখণ্ডের স্পর্শে তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। সবকিছু তিনি আবার আগের মতো দেখতে পারছেন।

শ্রীভগবৎ স্পর্শানুসুখে বিহ্বল হয়ে কাষ্ঠখণ্ডটিকে সযত্নে মস্তকোপরে গ্রহণ করে তিনি দ্রুত তার গৃহ অভিমুখে চললেন। এরপর নিকটস্থ বামুনপুকুর নিবাসী এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সূত্রধরেরও খোঁজ পেলেন তিনি। তাকে দিয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারানীর শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করলেন ঠিক এখন যেখানে রাজাপুরের জগন্নাথ মন্দিরটি অবস্থিত সেই স্থানটিতে। সেই বিগ্রহত্রয় নির্মাণের পর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সেই সূত্রধরেরও কুষ্ঠরোগ সেরে গেল। পরম ভক্ত জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এই বিগ্রহত্রয়ের নিত্য আরাধনা করতেন। তাঁর লোকান্তরের পর তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী সুষমা দেবী এই বিগ্রহ অর্চনা ও নিত্য সেবাদি করতেন। কিন্তু যেহেতু গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতির কোনো সন্তানাদি ছিল না, তাই সুষমা দেবীর পরলোক প্রাপ্তির পর এই বিগ্রহ ও মন্দির সংস্কারহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়ে থাকে। গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতির সম্পত্তির ওয়ারিশগণও সেবাকার্য চালাতেন না। বরং তারা বিভিন্ন সময়ে জমি বিক্রি করে দিতে থাকলেন। ক্রয়সূত্রের অধিকারে জমি ও মন্দিরের নতুন মালিক তৎকালীন বামুনপুকুর নিবাসী পুরোহিত জীবন চন্দ্র চক্রবর্তীকে দিয়ে এই মন্দিরের নিত্য পূজা চালু করলেও পরে অপারগ হয়ে সেবাকার্য বন্ধ করে দেন। এরপর মন্দিরটি দীর্ঘকাল ভগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে একসময় বিগ্রহ চাপা পড়ে যান।

এইভাবে ক্রমে সময় অতিবাহিত হতে চলল। রাজাপুরের মন্দির ও জগন্নাথ বিগ্রহেরও কোনো চিহ্ন থাকে না। চারদিকে জঙ্গল ও উঁচু উঁচু ঢিবি। কিন্তু যে জগন্নাথের এস্থলে

নিত্যকাল স্থিতি, তিনি কি দীর্ঘকাল অন্তর্হিত থাকতে পারেন? আজ থেকে প্রায় ৬৫/৭০ বৎসর আগে ঐ অঞ্চলে মাটি কাটার শ্রমিকেরা মাটি কাটতে কাটতে একটি উঁচু ঢিবির তলদেশে জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন ও শ্রীজগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা মহারানীর বিগ্রহত্রয়কে আবিষ্কার করলে পর স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও ভক্ত শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্দিরটির সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিত্য পূজার্চনা শুরু করেন। এ সময় ভক্তজনসাধারণের উদ্যোগে এখানে একটি নাটমন্দিরও নির্মিত হয়। কিন্তু ক্রমে আর্থিক অসচ্ছলতা ও বৃদ্ধ বয়সের অসমর্থতাহেতু শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এই মন্দির সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘকে দান করেন।

একচক্রা ধাম বা বীরচন্দ্রপুর (পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান)

একচক্রা ধাম পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এ ধামই নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র প্রভুর নাম অনুসারে বর্তমানে এই স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর। দ্বাপরযুগে একচক্রা নগরীতে বহু মানুষের বসতি ছিল। বনবাসী পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ বেশে ভ্রমণ করতে এ স্থানে এক সহৃদয় ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দিনের বেলায় পাঁচ ভাই একচক্রার লোকের বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষা করতে যেতেন। তাঁদের গুণ, সৌহার্দ্য ভাব এমন ছিল যে, একচক্রাবাসী জনগণের কাছে তাঁরা বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ভিক্ষালব্ধ ভক্ষ্য বস্তু রন্ধন করতেন কুন্তীদেবী। তিনি প্রতিদিন অন্ন দুই ভাগ করতেন। এক ভাগ ভীমের জন্য, বাকি এক ভাগকে পাঁচ ভাগ করতেন, তার চারভাই এবং নিজের জন্য। এভাবে ভোজন করতেন।
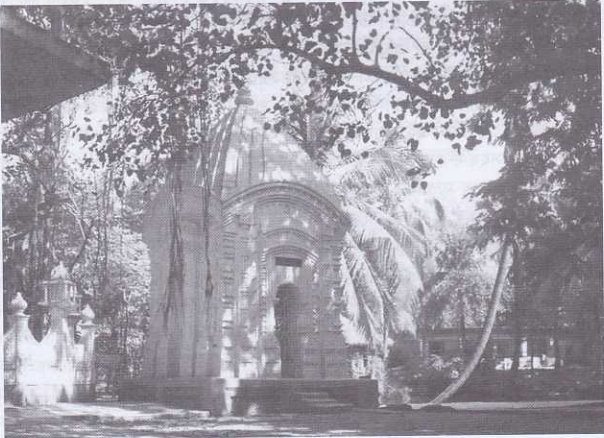
একদিন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব বাইরে গিয়েছিলেন। কুন্তীদেবী এবং পুত্র ভীম ব্রাহ্মণগৃহে ছিলেন। হঠাৎ গৃহের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তাঁর পত্নী, পুত্র ও কন্যার আর্তক্রন্দন শোনা গেল। কুন্তীদেবী কি ব্যাপার হয়েছে তা দেখতে গেলেন। জানলেন যে, একচক্রা নগরীতে এক দুর্ধষ রাক্ষস বাস করছে। বকাসুর নামে কুখ্যাত। সে নাকি দেশরক্ষক। তার প্রভাবে বহিঃশত্রু কিংবা কোনো হিংস্র প্রাণী একচক্রাতে আসতে পারে না। কিন্তু রাক্ষস নিজেই একচক্রার বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন পালাক্রমে এক এক করে গৃহস্থের বাড়ি থেকে খাবার তার জন্য দিতে হবে। তার খাদ্যপদগুলো ভয়ংকর। একটা মানুষ, দুটি মহিষ, চল্লিশ মণ অন্ন ও সবজি। বহুদিন থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। সবাই বিব্রত আছে। ব্রাহ্মণটি ক্রন্দন করতে করতে বললেন, একচক্রা ছেড়ে পালিয়ে যাবারও পথ নেই। রাক্ষসের নিয়মের ব্যতিক্রম বা বিরোধিতা করলে সে অবশ্যই সবংশ ধ্বংস করে দেবে। আর আমাদের রাজ্যের রাজা নির্বোধ ও অকর্মণ্য। লোকে আগে রাজার আশ্রয় নিয়ে ঘর বাঁধে। তারপর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার গড়ে এবং অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে রাজা, ভার্যা ও ধন এই তিনের সমৃদ্ধি দ্বারাই লোকে জ্ঞাতিবর্গ ও বংশকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি দুর্বিপাকগ্রস্ত। আমার বংশ আজ মরণাপন্ন। আজ রাক্ষসের কাছে আমাকেই খাদ্য পাঠাতে হবে–স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবাইকে রাক্ষসের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

কুন্তীদেবী বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। আমার পাঁচ পুত্র। এক পুত্রকে পাঠাতে চাই রাক্ষসের কাছে খাবার দিয়ে আসতে। আপনারা কেউ যাবেন না। ব্রাহ্মণ বললেন, না না, আপনারা আমার অতিথি। আমাদের পরিবার রক্ষার জন্য আপনাদের কারও প্রাণ বিয়োগ হলে আমাদের মহাপাপ হবে। এরকম নৃশংস কর্ম আমি কখনও করব না।

কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণকে বললেন, আমার পুত্রও বলশালী ও মন্ত্রসিদ্ধ। খাবার নেওয়ার ছলে রাক্ষসকে বধ করে সে ফিরে আসবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আমার পুত্র বড় বড় রাক্ষসকে বধ করেছে। একথা আপনি কাউকে বলবেন না, কেননা অনেকে এসে আমার পুত্রকে বিরক্ত করতে পারে।

তারপর মা ও ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিয়ে ভীম মহিষের গাড়ি করে খাবার নিয়ে গেলেন। পথমধ্যে বসে ভীম নিজেই সমস্ত অন্ন-সবজি খেলেন। সব খাবার ভীম খেয়ে নিয়েছে জানতে পেরে রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ভীমকে আক্রমণ করল। শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ। দশহাজার হাতির বল সমন্বিত ভীমের হাতে বলশালী বকাসুর নিহত হলো। সেই ভয়ংকর রাত্রে মহাগর্জনকারী বকাসুর মৃত্যুমুখে পতিত হলে একচক্রাবাসীরা জানতে পারল, ব্রাহ্মণ-গৃহের মন্ত্রসিদ্ধ অতিথিরা বকাসুরকে মেরে ফেলেছেন। সবার মধ্যে তখন আনন্দ ফিরে এল। একচক্রা থেকে দক্ষিণ দিকে ৯ কিলোমিটার দূরে কোটাসুর নামক অঞ্চলে ভীম ও বকাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল। একচক্রায় যেস্থানে ব্রাহ্মণ-বাড়িতে পাণ্ডবেরা বাস করছিলেন সেই স্থানটি 'পাণ্ডবতলা' নামে পরিচিত।

কলিযুগে আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর আগে একচক্রাতে ১৪৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ শ্রীহাড়ো ওঝা (হাড়াই পণ্ডিত) ও তাঁর সহধর্মিণী পদ্মাবতী দেবীর পুত্ররূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশপ্রকাশ শ্রীবলরাম আবির্ভূত হলেন। তাঁর নাম শ্রীনিত্যানন্দ। অপূর্ব সুন্দর শিশুরূপ মাধুরী। যে স্থানে তাঁর সূতিকাগৃহ, 'গর্ভবাস' নামে পরিচিত সে স্থানে একটি মন্দির মধ্যে নিত্যানন্দ মূর্তি রয়েছে। পাশেই 'নিতাইকুণ্ড'। পদ্মাবতী দেবী শিশুপুত্র নিতাইকে এখানে স্নান করাতেন। হাড়ো ওঝা বা হাড়াই পণ্ডিতের বাসভবন, শিশুর মঙ্গলার্থে ষষ্ঠীপূজা স্থান, প্রাচীন দুটি বটবৃক্ষ এখানে বিদ্যমান।

গর্ভবাস

এই স্থান নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান যা লোকেরা গর্ভবাস মন্দির বলে। এখানে নিত্যানন্দ প্রভু ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পিতা হাড়াই পণ্ডিত এবং মাতা পদ্মাবতীকে আশ্রয় করে অবতীর্ণ হন। এখানে তিনি বারো বছর কাল অবস্থান করে বিবিধ লীলাবিলাস করেন। এখানে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মূল মন্দিরে নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান মতে গোবর্ধনবাসী রাঘব গোস্বামী একচক্রা গ্রামে এসে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থানে উল্লেখিত তিনটি বিগ্রহ স্থাপন করেন। তার পাশের প্রকোষ্ঠে রাধাকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ দেখা যায়। পাশেই হাড়াই পণ্ডিতের গৃহ এবং তার পাশে একটা সুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর মন্দির আছে, যেখানে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হয়েছিল বলে কথিত। সেখানে নিত্যানন্দ প্রভুর এক বিগ্রহ আছে।

ষষ্ঠীতলা

নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের ছয় দিনের দিন যে ষষ্ঠীপূজা করা হয়েছিল সেই ষষ্ঠীতলা সুন্দর বৃহৎ ঝুরিনামা এক বটবৃক্ষের তলে পরিদৃষ্ট হয়।

কোটাসুর/কুন্তিদেবীর প্রদীপ

সাঁইথিয়ামুখী ৪ কি.মি. যেতেই সাঁইথিয়ার ৮ কি.মি. উত্তর-পূর্বে ময়ূরাক্ষীর কূলে কোটাসুর। অনুচ্চ টিলায় মদনেশ্বর শিব মন্দির প্রাঙ্গণে প্রদীপাকার প্রস্তরখণ্ড আজও কুন্তীদেবীর প্রদীপ নামে অভিহিত। আর আছে বক রাক্ষসের মালাইচাকি। এছাড়াও আছে সূর্য ও বিষ্ণুর কষ্টিপাথরের সুদর্শন মূর্তি মদনেশ্বর চত্বরে। জনশ্রুতি আছে, ভীম এখানেই বকাসুরকে বধ করে হিড়িম্বাকে বিয়ে করে। ৭ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে অসুরালয় গ্রামের উচ্চভূমি অসূর ডাঙ্গায় রাক্ষসের বাস ছিল সেকালে।

রামকেলি

১৫০৬ শতকে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে বৃন্দাবনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব আসেন গৌড়ে। এখানে মহাপ্রভু তিন দিনের জন্য অবস্থান করেন । পদচিহ্ন রয়েছে পাথরের বুকে চৈতন্যদেবের তমালতলের ছোট মন্দিরে। একই বেদীতে দুটি তমাল ও দুটি কদম্ব বৃক্ষ আজও রয়েছে যার নিচে গৌড়ে অবস্থানকালে বসতেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। হুসেন শাহর দুই মন্ত্রী, সাকর মল্লিক (রূপ গোস্বামী), দবীর খাঁ (সনাতন গোস্বামী) সান্নিধ্যে আসেন চৈতন্যদেবের।

দীক্ষা নেয় তাঁরা তমালতলে চৈতন্যদেবের কাছে বৈষ্ণবধর্মে। মন্দিরও গড়েন রূপ ও সনাতন শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউ এর। তবে, সেটি ধ্বংস হতে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বর্তমান মন্দিরটি গড়ে ওঠে। শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধিকা ছাড়াও বিগ্রহ রয়েছে অনেক। রূপসাগর, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, সুরভিকুণ্ড, রঙ্গাকুণ্ড, ইন্দুলেখাকুণ্ড নামে আটটি কুণ্ড রয়েছে মন্দিরের ডানে বামে। এগুলোও খনন করেন রূপ ও সনাতন গোস্বামী। পরম পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থ গুপ্ত বৃন্দাবনও বলে থাকে লোকে।

কপিল মুনির আশ্রম/সাগর দ্বীপে সাগর মেলা

ভারতীয় হিন্দু তীর্থগুলোর মধ্যে অতি পবিত্র তীর্থ এই গঙ্গাসাগর। প্রবর্তন অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের কালে গঙ্গাসাগর তীর্থের। চারপাশে জল মাঝে পড়েছে চর। তাই তার নাম সাগর দ্বীপ। ছোটবড় ৫১টি দ্বীপের সমন্বয়ে সাগর দ্বীপ। এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসেন সারা ভারত থেকে সাগর সঙ্গমে স্নানের তরে। গঙ্গার যেখানে সাগরে মিলন ঘটে সেই মোহনায় মকর ক্রান্তির ভোর না হতেই স্নান শুরু হয় পুণ্যার্থীদের। স্নানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। অতীতে কপিলমুনির আশ্রমটি ছিল আজকের মোহনায়। কপিলমুনি কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করে এস্থানকে পূত করেন। পুরাণে পাওয়া যায় রামচন্দ্র ১৩শ পিতৃপুরুষ অযোধ্যারাজ সগর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি নেন। ১০০ অশ্বমেধ যজ্ঞের একমাত্র অধিকারী দেবরাজ ইন্দ্র ঈর্ষান্বিত হয়ে যজ্ঞের ঘোড়া ধরে কপিলমুনি আশ্রমে বেঁধে রেখে আসেন। ঘোড়ার অন্বেষণে বেরিয়ে সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আশ্রমে ঘোড়া দেখে মুনিকে চোর সাব্যস্ত করে কটূক্তি করেন। ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটায় কুপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত হয়ে নরকে পতিত হয় ষাট হাজার সগর সন্তান। আর গঙ্গার স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে আগমন ঘটে সেই ষাট হাজার সন্তানের নশ্বর দেহে জীবন দিতে। সপ্তধারায় স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন গঙ্গা। তিনটি ধারা সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু পূর্বদিকে প্রবাহিত। আর হলদিনী, পার্বণী ও নন্দিনী ত্রিধারা পশ্চিম প্রবাহিনী। আর মূলধারা গঙ্গা ভগীরথের পিছু পিছু এসে মোহনায় সগর সন্তানদের নশ্বর দেহে জীবন দান করে নিজেকে বিলীন করে দেন সমুদ্রে। কপিলমুনির সেদিনের সেই আশ্রম আজ আর নেই। গ্রাস করেছে সমুদ্র তাকে। নতুন মন্দির হয়েছে ১৯৭৩ সালে সাগর বেলা থেকে বালিয়াড়ি পেরিয়ে বেশ কিছুটা দূরে।

তারাপীঠ

উত্তর বাহিনী দ্বারকা নদীর পূর্ব পাড়ে অতীতের চণ্ডীপুর আজ হয়েছে তারাপীঠ। কারও কারও মতে, একান্ন পীঠের এক পীঠ, তবে সতীর চোখের উর্ধ্বনেত্রের মণি অর্থাৎ তারা পড়ায় সতীপীঠ নয়, মহাপীঠ তথা শক্তিপীঠ বলে খ্যাত তারাপীঠ। সাধক বশিষ্ঠ দ্বারকার কূলে মহাশ্মশানের শ্বেত শিমুলের তলে পঞ্চমুণ্ডির (শৃগাল-সর্প-সারমেয়-বৃষ-নৃমুণ্ড) আসনে বসে তারা মায়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তবে, অতীতের শিমুল বৃক্ষ আজ আর নেই। নেই সে খরস্রোতা দ্বারকা নদীও। মহাশশ্মানের ভয়াবহতা লোপ পেয়েছে জনারণ্যে। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠের সিদ্ধপীঠ এই তারাপীঠে কমলাকান্ত, রাজা

রামকৃষ্ণ, বিশেক্ষ্যাপা, আনন্দানাথ, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি বাবা, শঙ্করবাবা, ন্যাংটাবাবা ছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক সাধক সিদ্ধি লাভ করেছেন। তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বামাক্ষেপার এই তারাপীঠে। বণিক জয় দত্ত নির্মিত তারা মায়ের প্রাচীন মন্দিরটি আজ বিধ্বস্ত। উত্তরমুখী আটচালা বর্তমান মন্দিরটি ১২২৫ বঙ্গাব্দে ১২ই ফাল্গুন মল্লারপুরের জগন্নাথ রায় তৈরি করেছিলেন। মন্দিরটি অলংকৃত প্রবেশপথের খিলানের উপর দেবী মহিষাসুরমর্দিনী সপরিবারে উৎকীর্ণ। বামে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ডানে রামায়ণ বর্ণিত হয়েছে। আর রয়েছে অনেক রকমের পৌরাণিক আখ্যান। দেবী এখানে তারাময়ী কালী মুখমণ্ডল ছাড়া সারা অঙ্গ বসনে আবৃত। আর সাজে দর্শন মেলে বশিষ্ঠকে দর্শন দেওয়া কষ্টিপাথরের মহাকাল শিব মহাকালীর স্তন্যপীযুষ পানরত মূল দ্বিভুজা ছোট্ট মূর্তি। দেবীর ভৈরব চন্দ্রচূড় শিব রয়েছেন ছোট্ট মন্দিরে।

কুচবিহার রাজবাড়ি

১৮শ শতকে ভুটানের আক্রমণে বিব্রত কোচবিহার রাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণে কোম্পানির করদ মিত্ররাজ্যে রূপ নেয়। ভূপবাহাদুর নৃপেন্দ্রনারায়ণের হাতে গড়া শহর কোচবিহার। ১৮৮৭ শতকে ৮৭৭২০৩ টাকা ব্যয়ে রোমের সেন্ট পিটার্সের অনুকরণে এফ বার্কলের তৈরি ইতালীয় শৈলীর গঠন নৈপুণ্যে চমৎকৃত কোচবিহারের রাজবাড়ি ১২০ গুণন ৯০ মিটার। সারা বিশ্ব থেকে আসবাবপত্র এসেছে অলংকৃত করতে। দ্বিতল প্রাসাদের শিরে গম্বুজ। গম্বুজের নিচে প্রাসাদের দরবার হলটি অনবদ্য। করিন্থিয়ান পিলারে ভর করে চারটি বিশাল খিলানের জানালায় রঙিন কাচের আলোর বিচ্ছুরণ রমণীয়। ১৯৭৩ শতকে শেষ কোচবিহার রাজ জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুতে

অনাদর আর অবহেলায় ক্ষতির বহর বাড়ে প্রাসাদের। ১৯৮৬ শতকে পুরাতত্ত্ব দপ্তরের অধীনে যেতে নতুন করে হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছে প্রাসাদ। ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা শতবর্ষের ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজবাড়ি নতুন করে দ্বার খুলেছে। পুরাতত্ত্বের সাথে

রাজপরিবারের ইতিহাস নিয়ে মিউজিয়াম তথা প্রদর্শনশালা বসেছে প্রাসাদে। প্রাসাদের অস্ত্রকারাগারটিও সাধারণের কাছে অবারিত।

দার্জিলিং

ভারতরাষ্ট্রে পাহাড়ি-রানীর স্বয়ংবরায় সিমলা, ম্যুসৌরি, শিলং, উটি, দার্জিলিং ছাড়াও প্রতিযোগী আরো অনেক রয়েছে। তবে, ভারতীয় শৈলশহরগুলোর মধ্যে দার্জিলিং অন্যতম। পাহাড়ি শহরের রানীর কিরিট চেপেছে অর্ধচন্দ্রাকার দার্জিলিং-এর ভালে। কলকাতা থেকে ৬৬৩ আর শিলিগুড়ি থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে ২১৮৫ মি. অর্থাৎ ৭১০০ ফুট উঁচুতে পশ্চিম বাংলার শিরে কোহিনূর মণি হয়ে দার্জিলিং-এর অবস্থান। রূপসী দার্জিলিং-এর রূপের তুলনা হয় না। মেঘেরা এখানে কানে কানে কথা বলে। ঘরের ভেতরে উকি দেয় জানালা ঠেলে বিস্ময়ে ভরা রহস্যময়ী মেঘ। সামনেই চিরহরিৎ বর্ণ ঘনপল্লব টিপী মণ্ডিত পর্বতরাজি বেষ্টিত দিগন্ত প্রসারিত সুমহান কাঞ্চনজঙ্ঘা। সারাবছরই বরফে মোড়া, ঘরে বসেই এর রূপে পাগলপারা হয়ে উঠেন পর্যটকরা। প্রভাতে সোনা গলানো তরঙ্গায়িত রেকায়র উদ্‌ভাসিত অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা। তেমনই বার্চ হিল থেকে সূর্যাস্তও মনোরম। এমনটি আর খুঁজে মেলা ভার। দার্জিলিং অপরূপা, দার্জিলিং অনন্যা-কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রাণের আনন্দ, আত্মার শান্তি। দোর্জে অর্থাৎ ব্রজ থেকেই দোরজি লিং বা বজ্রপাতের দেশ। (Land of thunder bolt) থেকেই দার্জিলিং নামের উৎপত্তি। দ্বিমতে, দুর্জয়লিঙ্গ (অবজারভেটরি হিল) বা তিব্বতি ভাষায় বড় পাহাড়ই হলো দার্জিলিং। কেউবা বলেন, লেপচা ভাষায় ভগবানের বাসস্থান অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ দার্জ্যুল্যাঙ্গ থেকেই দার্জিলিং নামকরণ।

বিহার প্রদেশ

বিহার প্রদেশের পূর্বকথা

বৌদ্ধ মঠ বা মনাষ্ট্রি বিহারা থেকেই নাম এসেছে বিহার। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও শিখ ধর্মের পুণ্যধাম বিহার। সারা পূর্ব জুড়ে রয়েছে পশ্চিম বাংলা, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ আর দক্ষিণে ঝাড়খণ্ড। বিহার রাজ্যের সদর দপ্তর পাটনায়। আর্যরা পশ্চিম থেকে গঙ্গা বয়ে এসে বন কেটে প্রথম বসতি গড়ে পাটনায়। চাষবাসের প্রবর্তন মগধরাজদের (খ্রি.পূ. ৬-৪ শতক) কালে। এমনকি রাজ্যও প্রসার পায় উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশীলা থেকে দক্ষিণে তামিলনাড়ু বিম্বিসারের কালে। রাজ্য প্রসার পেতে মগধরাজ অজাতশত্রু খ্রি.পূ. ৪৯১-৪৫৯ শতকে রাজগৃহ থেকে রাজধানী স্থানান্তর ঘটান পাটালি গ্রামে। খ্রি.পূ. ৩২১ শতকে মগধরাজকে হারিয়ে রাজা হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। মৌর্যদের রাজধানীও ছিল পাটালি অর্থাৎ পাটলিপুত্রে। চন্দ্রগুপ্তের নাতি সম্রাট অশোক (খ্রি.পূ. ২৭৪-২৩৭) ও তার ঐতিহাসিক রাজা বার্তা এখান থেকেই পৌছে দেন প্রজাদের কাছে ও দিকে দিকে মিশনও পাঠান বৌদ্ধধর্মের বার্তা দিয়ে। বুদ্ধদের কর্মজীবনের বড় একটা অংশও এই বিহারেই অতিবাহিত হয়। নিরঞ্জনার তীরে উরুবিল্ব গ্রামে পিপুল গাছের নিচে সিদ্ধিলাভ করেন বুদ্ধ আজকের বুদ্ধগয়ায়। তবে তারও আগে খ্রি.পূ. ৬ শতকে সত্যের সন্ধানে বৈশালী ও রাজগীরে এসেছেন রাজকুমার গৌতম। বুদ্ধের সমকালে জৈন ধর্মেরও প্রচলন ছিল সেকালে বিহারে। এমনকি ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম ৫ শতকের বিশ্বখ্যাত বিশ্বের প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার অনতিদূরে কুন্দনপুরে। আর জ্ঞানপ্রাপ্তির পর প্রথম ধর্মোপদেশ অদূরের পাওয়ারীপুরীতে। ১০ম শিখগুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মও বিহারের পাটনায় ১৬৬ শতকে।

মৌর্যদের পর দীর্ঘ ৬০০ বছরের অমানিশা কাটিয়ে হিন্দু কৃষ্টি ফিরিয়ে আনে গুপ্ত রাজারা বিহারে। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পূজারী গুপ্ত রাজাদের কালে বিহার ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। গুপ্তদের পর বাংলা থেকে আসা পাল রাজাদের কালেও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিপত্তি ছিল বিহারে। ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে পালদের পরাজয়ে বিহার যায় মুসলিম দখলে। শুরু হয় শাসক বদলের ঘনঘটা বিহারে। ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বিহার যায় মোগল সম্রাট আকবরের দখলে। আর সেই থেকে গড়ে ওঠে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে নতুন এক সংস্কৃতি যা বিহারের একান্তই নিজস্ব। মোগলদের পর বিহার যায় বাংলার নবাবদের হাতে। সিরাজের মৃত্যুর পর ১৭৬৪ শতকে বক্সারের যুদ্ধে মিরকাশিমের পরাজয়ে বিহার যায় ব্রিটিশের দখলে। বিহার তখন বাংলা প্রভিন্সের অংশ। ১৯১১ শতকে বিহার ও ওড়িশাকে পৃথক করা হয় বাংলা থেকে ছেঁটে। আর ১৯৩৬ শতকে প্রভিন্স রূপে স্বতন্ত্র রূপে স্বতন্ত্র মর্যাদা পায় বিহার। আয়তনে ভারতরাষ্ট্রের দ্বাদশ বৃহত্তম রাজ্য হলেও জনসংখ্যায় তৃতীয় সংখ্যাধিক্য বিহার রাজ্য, আর সাক্ষরতায় ভারতে ২৭তম স্থানে বিহার রাজ্য। ভারতের দরিদ্রতম রাজ্য বিহার। শিক্ষায় অনগ্রসর, আর্থিক অনটন–দুইয়ের পেষণে জনজীবন নিষ্পেষিত।

গয়ার উৎপত্তি

গয়া ভারতের পঞ্চতীর্থের অন্যতম। যথা–কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর। ব্রহ্মযোনি, রামশিলা ও প্রেতশিলা- তিন পাহাড়ে ঘেরা গয়া। অনাদিকাল ধরে বাংলাদেশ এবং সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রী আসেন পঞ্চক্রোশী গয়াক্ষেত্রে তাদের মৃত বারো পুরুষের আত্মার শান্তি কামনায় পিণ্ডদান করতে। স্বর্গবাসের অধিক সম্ভাবনায় পিতৃপক্ষ-আশ্বিনের ১-১৫ তারিখে যাত্রী আসেন লক্ষ লক্ষ। মেলাও বসে পিতৃপক্ষে। কথিত আছে- গয়ায় পিণ্ডদান করলে আত্মার ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হয়।

বায়ু পুরাণে আছে, গয়াসুরের নাম হতেই এই তীর্থক্ষেত্রের নাম হয়েছে গয়া। গয়াসুর বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। সে বিষ্ণুকে লাভ করবার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করে। বিষ্ণু তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন যে, গয়াসুরের দেহ দেবতা ব্রাহ্মণ যোগীদের চেয়েও শুদ্ধ, সত্ত্ব ও পবিত্রতম হবে। ফলে, এই শুদ্ধদেহ দর্শনে সকলেই মুক্তিলাভ করতে লাগল। যম এই ঘটনা বিষ্ণুকে জ্ঞাত করলেন। বললেন যে, আর কেউ তাঁহার শাসনে আসছে না। দেবতাগণ চিন্তান্বিত হলেন। তাঁরা গয়াসুরকে বললেন, তোমার দেহ আমাদেরকে দান কর। গয়াসুর রাজি না হওয়ায় দেবতারা একটা কালো পাথর তাঁর বুকের উপর চেপে দিলেন। এতে গয়াসুর স্থির থাকতে পারল না। তা দেখে স্বয়ং বিষ্ণু বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করে ঐ পাথরের উপর তাঁর এক পদ স্থাপন করলেন। ভগবানের শ্রীপাদস্পর্শে গয়াসুরের দিব্যজ্ঞান হলো। গয়াসুর তখন ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি করতে লাগলেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। গয়াসুর ক্ষণভঙ্গুর শরীরের অনিত্যতা চিন্তা করে মানবের হিতকামনায় অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের জন্য এই বর প্রার্থনা করলেন যে, হে প্রভো! যদি আপনি সত্যই আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে এই বর প্রদান করুন যে, আমার নামানুসারে এই স্থান গয়াক্ষেত্র নামে অভিহিত

হউক। যে পর্যন্ত চন্দ্র, সূর্য বা পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত যেন দেবতাগণ আমার বুকের উপর বিদ্যমান থাকেন। এটি যেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয়। ভগবান বিষ্ণু গয়াসুরের প্রার্থনা পূরণ করলেন। গয়া মুক্তিক্ষেত্রে পরিণত হলো।

মাথা তার গয়া অর্থাৎ বিষ্ণুক্ষেত্রে, অন্ধ্রের পিঠাপুরমে পদযুগল, উড়িষ্যার বিরজাক্ষেত্রে নাভি। তবে, স্বর্গে যেতে অনিচ্ছুক গয়াসুর। গয়াসুরের ইচ্ছা দুইটি পূরণ করলেন নারায়ণ। প্রথমত, গয়াসুরের পাষাণ মূর্তির মাথায় পদযুগল রাখা আর দ্বিতীয়ত, এই পদচিহ্নে যে আত্মার জন্য পিণ্ডদান করা হবে তার ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হবে। নারায়ণের তথাস্তু বাস্তবে রূপ পেল। আর এই গয়াসুর থেকেই শহরের নাম হয় গয়া।

সেই থেকে গয়াসুর পাথর হয়ে রয়েছে নারায়ণের পায়ের ছাপ মাথায় নিয়ে। আর পিণ্ডদান প্রথাও চলে আসছে মৃত আত্মার ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির জন্যে। কালে কালে ৪৩টি বেদীতে পিণ্ডদান প্রথা চালু হলেও ফল্গুর বালুচরে, বিষ্ণুপাদপদ্মে ও অক্ষয় বটে পিণ্ডদান করা হয়। এখানে পিণ্ডদানের জন্যে পাণ্ডা অর্থাৎ পুরোহিত রয়েছেন। আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও পাওয়া যায় পাশের বাজারে।

বিষ্ণুপাদপদ্ম

অন্তঃসলিলা ফল্গুর পশ্চিম পাড়ে বিষ্ণুপাদ মন্দির। কারুকার্যময় আট সারি স্তম্ভে ভর করে ৩০ মি. উঁচু অষ্টকোণী চুড়ো-রুপোর আধারে মোড়া। ভেতরে পাথরের বুকে ৪০ সে.মি. দীর্ঘ বিষ্ণুর পায়ের ছাপ। তীর্থযাত্রীদের কাছে খুবই পবিত্র। পরিবেশও সুন্দর। ১৭৮৭

খ্রিষ্টাব্দে ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ মন্দিরটির সংস্কার করেন। এটি তৈরি করেন কলকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব।

অক্ষয়বট এবং ফল্গুনদী

বিষ্ণুপাদ মন্দিরের ১ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০০০ সিঁড়ি উঠে ব্রহ্মযোনি পাহাড় চুড়োয় পাতালেশ্বর শিব মন্দির আর নিচুতে অক্ষয়বট। রামায়ণের সীতাদেবীর আশীর্বাদধন্য এই বটবৃক্ষতলে পিণ্ডদান সমাধা হয়। একদা ফল্গুও বয়ে যেত নিচু দিয়ে। সীতাদেবীর শাপে সে অন্তঃসলিলা। গয়ার উত্তরে রামশীলা পর্বত। আর আছে প্রেতশীলা। অপঘাতে মৃতদের পিণ্ডদান হয় এই প্রেতশীলায়।

বিষ্ণুপাদ মন্দিরের উত্তরে শোন নদীর তীরে সূর্য মন্দিরটিও তীর্থযাত্রীদের কাছে এক পুণ্য তীর্থ। দেওয়ালির ছয় দিন পর (নভেম্বর মাসে) পুণ্যার্থীরা গঙ্গায় কোমর জলে দাঁড়িয়ে নতুন তোলা ফসল, ফলমূল আর ঘরে তৈরি মিষ্টাদি দিয়ে দেবতা সূর্যের অর্চনা করেন। নাম তার ছট বা সূর্যপূজা।

বুদ্ধগয়ার উৎপত্তি

নেপালের লুম্বিনীতে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধের জন্ম, বারাণসীর অদূরে সারনাথে বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ, গোরক্ষপুরের কাছে কুশীনগরে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ আর বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ অর্থাৎ সিদ্ধার্থের দিব্যজ্ঞান বা বোধের উন্মেষ। এই চার পুণ্যধাম বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে মহান তীর্থ। তবুও যেন বিশ্বের অন্যতম বৌদ্ধ তীর্থ বুদ্ধগয়া। এমনকি

প্রতি ডিসেম্বর- জানুয়ারি মাসে দালাইলামাও আসেন ধর্মশালা থেকে বুদ্ধগয়ায়। মাসাধিক-কাল অবস্থানও করেন বৌদ্ধতীর্থে। নেতৃত্ব দেন প্রাত প্রার্থনায় মহামান্য দালাইলামা।

২৫০০ বছরের অতীত নিরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে পিপুল গাছের নিচে বজ্রশিলায় বসে কপিলাবস্তুর রাজকুমার তপস্যা করে ৪৯তম দিনে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় সিদ্ধিলাভ করেন। কালে কালে নিরঞ্জনার নাম হয়েছে ফল্গু, উরুবিল্ব হয়েছে বুদ্ধগয়া, আর পিপুল গাছ হয়েছে বোধিবৃক্ষ। বুদ্ধের স্মৃতিকে ঘিরে বুদ্ধগয়া। সম্রাট অশোকও আসেন উত্তরকালে। জাঁকালো উৎসবের সাজে সেজে ওঠে বুদ্ধগয়া।

বোধিবৃক্ষ

যে পিপুল গাছের নিচে অনিমেষলোচন স্তুপ অর্থাৎ মহাপরিনির্বাণ স্থলে কুশের পাটিতে বসে রাজকুমার গৌতমের দিব্যজ্ঞান বা বোধের উদয় ঘটে, পরবর্তীকালে সেই গাছের একটি চারা সম্রাট অশোক শ্রীলঙ্কায় পাঠান কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ও পুত্র মহিন্দের সঙ্গে। মূল গাছটি মারা গেলে শ্রীলঙ্কা (অনুরাধাপুরা) থেকে শাখা এনে বুদ্ধগয়ায় রোপিত হয়। মূলের চতুর্থ প্রজন্ম আজকের এই বোধিবৃক্ষ। ভক্তের দল বোধিবৃক্ষের শাখে কাপড় বাঁধেন।

বৃক্ষতলে পদ্মাকার বজ্রাসন অর্থাৎ লাল বেলেপাথরের ডায়মন্ড থ্রোন-এ ধ্যানে বসতেন গৌতম বুদ্ধ। পাথরে পায়ের ছাপে বুদ্ধের উপস্থিতি, পাথরের পদ্মাকার পানপাত্রে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বুদ্ধের পদক্ষেপের প্রকাশ। হিন্দুদের কাছেও যথেষ্ট আদৃত নবম অবতার বুদ্ধরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবে। পাশেই সুজাতা দিঘি। জনশ্রুতি রয়েছে, এই দিঘির জলে স্নান করে সুজাতা পায়েস নিবেদন করতেন বুদ্ধদেবকে। সুজাতা মন্দির হয়েছে মহাবোধি ২ কি.মি. পশ্চিমে।

বৌদ্ধমন্দির

৬০ ফুট প্রশস্ত ১৮০ ফুট উচ্চ পিরামিডধর্মী চুড়োওয়ালা দ্বিতল মহাবোধি মন্দিরের নিচুতে হয়েছে সোনালী গিলটি করা ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ৮০ ফুটের বুদ্ধমূর্তি, আর দ্বিতলে

উপাসনা গৃহ। পূর্বে দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীতে গড়া বৌদ্ধধারার তোরণে প্রবেশ। চার কোণে চার চুড়ো- নানান ভঙ্গিমায় বুদ্ধ, পদ্ম, পাখি ও বিভিন্ন জীবজন্তুর সঙ্গে জাতকের আখ্যানও অলংকৃত হয়েছে মন্দির গাত্রে। প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন এই মন্দির। মন্দিরের পাথরের দেওয়াল, সেও অশোকের কালের, দ্বিমতে সুঙ্গদের (খ্রি.পূ.১৮৪-১৭২) তৈরি এ মন্দির। মূল মন্দিরের সঠিক জন্মবৃত্তান্ত না মিললেও পণ্ডিতদের মতে খ্রি.পূ ২৮৯ শতকে সম্রাট অশোকের দানের ১ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় উপগুপ্তের হাতে তৈরি মন্দির এটি। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং (৬৩৫ খ্রি.)-এর বিবরণীতে মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালের ভ্রুকুটি, বিধর্মীদের অত্যাচারে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দির ১১০৫ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার করেন ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধরা। দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত বুদ্ধের মূর্তিটি সেই থেকে। সোনার পাতে মোড়া তামার ছত্রটিও সংস্কারকের সংযোজন। ১৬ শতকে হিন্দু ব্রাহ্মণদের হাতে অধোগতি শুরু হয়ে হারিয়ে গিয়ে ১৮৭৭ শতকে নবরূপে লোকসমক্ষে আনে ব্রিটিশরা। ১৮৮০ শতকে জেনারেল কানিংহাম ২ লক্ষ টাকায় বাঙ্গালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কঠোর শ্রমে সংস্কার করেন মন্দির। সম্প্রতিও আমূল সংস্কার হয়েছে মন্দিরের।

এছাড়া মন্দিরের উত্তরে চক্রমাণা-ধ্যানে বসতেন গৌতম, ঘেরা প্রাঙ্গণে অনিমেষলোচন চৈত্য কৃতজ্ঞতাবশে বুদ্ধ এক সপ্তাহ দাঁড়িয়ে পিপুল বৃক্ষ অবলোকন করেন। মোহান্তর মনাষ্ট্রি, রত্নাগার এগুলোও দ্রষ্টব্য। আর দুই কি.মি. দূরে নিরঞ্জনা নদীতীরে ঝোপ-জঙ্গলে আকীর্ণ উঁচু স্তুপটিই নাকি গোপবালা সুজাতার গৃহ। তিন কি.মি. দূরে মুচলিণ্ড সরোবর। নাগরাজ মুচলিণ্ড ফণা মেলে ছাতা করে ধ্যানস্থ বুদ্ধকে ঝড়-জল-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করত। এই লেকের পাড়েই গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেকালের মগধ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে আজ তা বিধ্বস্ত।

রাজগীরের পূর্বকথা

খ্রি.পূ. ৮০০ বছরের অতীত রাজগীরের নাম ছিল রাজগৃহ। অর্থাৎ দি রয়্যাল প্যালেস। আর অজাতশত্রু নাম রাখেন এর গিরিব্রজ। পাহাড়ি বলে থাকে লোকে রাজগীরকে। সেকালে রাজগৃহ ছিল ভারতের এক সমৃদ্ধ নগর। বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি, শোনগিরি-পাঁচ পাহাড়ে চক্রাকারে ঘেরা ছিল রাজগৃহ। মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানীও ছিল রাজগৃহ। রামায়ণেও উল্লেখ রয়েছে রাজগৃহের আখ্যান। বুদ্ধের রাজগৃহ আগমনে মৌর্য সম্রাট বিম্বিসার দীক্ষা নেন বৌদ্ধ ধর্মে। বুদ্ধের কর্মজীবনের সঙ্গেও রাজগৃহ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। ১২ বছর রাজগীরে বাসও করেন বুদ্ধদেব। ২০তম জৈন তীর্থঙ্করের জন্মও এই রাজগীরে। আর ২৪তম জৈন (শেষ) তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর ১৪টি বর্ষাঋতু অবস্থান করেন এখানে।

বিপুল পর্বতে প্রথম ধর্মসভাও করেন মহাবীর। মহাবীর শিষ্যদের পাঠও দিতেন এখানে। স্মারকরূপে দিগম্বরী জৈন তীর্থ মন্দির হয়েছে পাহাড়ের চুড়োয়। ত্রিপিটকও লেখা হয়েছে এখানে। সপ্তর্ষি কুণ্ড থেকেই সিঁড়ি উঠেছে ১৮শ ফুট উচ্চ বিপুল পর্বতে। ঘন্টা দেড়েক ৫৬৬ সিঁড়ি উঠে দেখে নেওয়া যায়। বিপরীতে বৈভার পর্বত। আরও পরে

(খ্রি. ৩২৪-৩১৩ পর্যন্ত) অত্যাচারী শেষ মগধ সম্রাটকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তবে, আজ অতীত থেকে সরে এসে নতুন শহর গড়ছে রাজগীরে। আজকের রাজগীরের অন্যতম আকর্ষণ বেণুবনের দক্ষিণ-পূর্বে সরস্বতী নদী পেরিয়ে হট স্প্রিং। ঝরনাধারার নিচে ভূগর্ভস্থ মন্দিরের মূর্তি হয়েছে গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ ও পরাশর অর্থাৎ সপ্তঋষির। অরুন্ধতীও রয়েছেন বশিষ্ঠের পাশে। আর পাহাড় ঢালে সাতটি ধারায় বেরিয়ে আসছে হট স্প্রিং-এর জল। প্রতিটাতেই উষ্ণতার তারতম্য আছে। প্রথমেই বাঁয়ে ব্রহ্মার তপস্যায় সৃষ্ট স্নানেও অন্যতম ব্রহ্মকুণ্ড-জল ৪৫ ডিগ্রি সে. গরম। অন্য ধারাগুলো হলো- শতধারা, শালীগ্রাম, সপ্তর্ষি, সীতারাম, গণেশ ও সূর্যকুণ্ড। নিচে একটি কুণ্ড রয়েছে স্নানের। জলে সালফার আছে। স্নানে চর্মরোগ ও বাতজ ব্যাধির নিরাময় ঘটে। তবে, একসাথে ৫ সেকেন্ড আর বারবার মিলিয়ে সারাদিন ২০ সেকেন্ডের বেশি জলের ধারা মাথায় দেওয়া উচিত নয়। তেমনই স্নানের আগে গায়ে তেল মাখাও অনুচিত। স্নানের পর কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে কুণ্ডের বাইরে যাওয়া বিধেয়। শীতের দিনে স্নানান্তে বসন পরিধান করা উচিত। আবার প্রস্রবনের উষ্ণ জলে খালি পেটে স্নান করা উচিত নয়। উচিত হবে ভিড় এড়াতে সকাল ৬টার আগে বা সন্ধ্যা ৭টার পরে স্নানে যাওয়া।

প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু খ্রিষ্টজন্মেরও ৫০০ বছর আগে দুর্গ গড়েন। নামও তাই অজাতশত্রু দুর্গ। উত্তরে একমাত্র দ্বার আজ দৃশ্যমান হলেও অতীতে ৩২টি প্রবেশদ্বার ছিল দ্বিস্তর প্রাচীর ঘেরা পাহাড় কেটে পরিখাবৃত দুর্গে। ধ্বংসাবশেষ আজও অতীত রোমন্থন করায়। ৬.৫ বর্গ মি. জমির উপর অজাতশত্রু স্তুপটিও অজাতশত্রুর তৈরি। সম্ভবত বুদ্ধের নখ ছিল এই স্তুপে। অজাতশত্রু রাজধানীরও স্থানান্তর ঘটান রাজগৃহ থেকে পাটালি গ্রামে খ্রি.পূ. ৫ শতকে। আর আম্রবন বা জীবকের আম বাগানটি ছিল মগধরাজের গৃহ চিকিৎসক জীবকের ডাক্তারখানা। বুদ্ধ একদা চিকিৎসার জন্য জীবকের কাছে আসেন।

পুত্র অজাতশত্রুর হাতে বন্দি হয়েছিলেন মগধরাজ বিম্বিসার। ১.৮ পুরু দেওয়ালে ঘেরা ১৮.৫৮ বর্গ মি. জমির উপর তৈরি জেলে বন্দি ছিলেন গদিচ্যুত বিম্বিসার। নামটি তাই বিম্বিসার জেল। অদূরেই গৃধ্রকুট পাহাড়ে দেখতেও পেতেন বুদ্ধকে জেলে বসে বন্দি রাজা বিম্বিসার। মৃত্যু হয়েছে ৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে। বিম্বিসারে খাজাঞ্চিখানা অর্থাৎ স্বর্ণভাণ্ডার আকার অনেকটা গুহার মতো। দ্বিতল ছিল সেকালে। তবে, দ্বিতল আজ বিধ্বস্ত, সিঁড়ির ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে অতীত রোমন্থন করায়।

পাহাড়ের নিচুতে সমতলে এক উদ্যানভূমি। অতীতে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হতো। এখানে মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম আর জরাসন্ধের ২৮ দিনব্যাপী যুদ্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধও চলে এই আখড়ায়। যুদ্ধে ভীমের হাতে মৃত্যু ঘটে জরাসন্ধের। আরো পরে এক সাধু এসে আশ্রম গড়েন। সাধু আজ লোকান্তরিত। স্মারকরূপে জায়গার নাম মণিয়ার মঠ হয়েছে। বিপরীতে জয়প্রকাশ নারায়ণ উদ্যান। অদূরে জরাসন্ধের ধনাগার শোনভাণ্ডার। জনশ্রুতি আছে যে, এই গুহার পেছনে ধনরত্নের ইতিহাস লেখা, তবে পাঠোদ্ধারের অভাবে আজও অগোচরে। আর ছিল পাহাড়ের গায়ে গুহা তথা জরাসন্ধের জেল।

মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের বাসের জন্য তার প্রমোদকাননে বেণুবন বিহার অর্থাৎ মনাষ্ট্রি গড়ে ভেট দেন। এটিই ছিল মগধরাজার প্রথম গুরুদক্ষিণা। বাসও করেন বুদ্ধ বেশ কয়েকটি বর্ষা ঋতু এই বেণুবনে। খননে আবিষ্কৃত হয়েছে অতীত। তবে, আজ ডিয়ার পার্ক তথা জ্যু বসেছে ।

রাজগৃহের উত্তরে গৃধ্রকুট পাহাড়। তবে, আজ যেমন দুর্গম তেমনই বিপদসঙ্কুল। পাহাড় চুড়োয় আছে দুটি গুহা ও বিধ্বস্ত এক চত্বর। দীর্ঘকাল বাসও করেন বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্যসহ এখানে। কথিত আছে, প্রতি বর্ষায় তিন মাস শিষ্যদের পাঠও দিতেন তিনি। সুজাতার হাতে মিষ্টান্ন এখানেই নাকি গ্রহণ করেন বুদ্ধ। এমনকি মগধরাজ বিম্বিসারও নিয়মিত আসতেন। হিংসা ছেড়ে অহিংসা ব্রতে দীক্ষাও নেন বিম্বিসার গৃধ্রকুটে। রথে এসে যে জায়গায় তিনি নামতেন, আজও লোকে তাকে বলে রথকে উতোর।

এছাড়াও রাজগীরে রয়েছে ঝলমলে সাজে ২৬টি শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন মন্দির, বাগিচায় ঘেরা সুন্দর পরিবেশে বার্মিজ মন্দির, বুদ্ধ মন্দির, আনন্দময়ী মা-এর মন্দির, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ডিয়ার পার্ক, পুণ্যস্নানের জন্য মুসলিম তীর্থ মুকদুমকুণ্ড, ছোট শহর ও অতীত দিনের নানান স্মৃতি সারা শহরময়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নালন্দার প্রশস্তি। তবে, আজ তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এই ধ্বংসস্তুপ দেখতে সারা বিশ্ব থেকে পর্যটক আসেন ৬৭ মি. উঁচু নালন্দায়। নালম অর্থ পদ্ম আর দা হচ্ছে প্রদত্ত। পদ্ম জ্ঞানের প্রতীক। অর্থাৎ জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নালন্দা। সম্রাট অশোকের হাতে খ্রি.পূ. ৩ শতকে এর পত্তন। আর গুপ্ত রাজাদের কালে ৬০০ বছর পর বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্রের রূপ নেয় কুষাণ স্থাপত্যে

গড়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু বৌদ্ধশাস্ত্র নয়, সাহিত্য, দর্শন, বেদ, ন্যায়, ব্যাকরণ, শব্দশাস্ত্র, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, রসায়ন, আয়ুর্বেদ সুচারুরূপে পঠনপাঠন হতো। বিদ্যার্থী এসেছে সারা বিশ্ব থেকে। এমনকি ভারত ভ্রমণে এসে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং নালন্দায় আসেন–পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন তিনি। হিউয়েন সাং-এর বিবরণীতে দেখা যায় সেকালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০,০০০, অধ্যাপক ২০০০ আর প্রধান আচার্য ছিলেন ধর্মপালের ছাত্র সর্বশাস্ত্রে বিশারদ শীলভদ্র। সম্রাট হর্ষবর্ধন উপঢৌকন দেন ২৬ মি. উঁচু বুদ্ধের তাম্রমূর্তি। সেকালে বিভিন্ন রাজার দানে ১২শটি গ্রামও আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে । এরই আয়ের থেকে চলছে এই অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩ শতকের শেষ ভাগে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাজা মহিপাল পুনঃনির্মাণ করেন মহাবিহার। ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবাকের সেনাপতি বখতিয়ার খিলজির হাতে ধ্বংসপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিক্ষাদানে এটি ছিল অগ্রগণ্য। বখতিয়ার খিলজির ধ্বংসের পর মুদিতভদ্র নামে এক ভিক্ষু এর সংস্কার করেন। নালন্দায় আবার আগুন লাগায় দুই ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ।

দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে ১৮৬০ শতকে উদ্‌যাপিত হয়ে ১৯১৬ থেকে ২০ বছর খননে আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ লীলাভূমি নালন্দা। নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে লাল ইটে গড়া ১১টি মঠ, স্তুপ, বুদ্ধমূর্তি, ছাত্রাবাস, ক্লাসঘর, মন্দির, চৈত্য, সজ্ঘারাম–আরও অনেক কিছু। একেকটি স্তুপের ধ্বংসাবশেষের উপর বারবার নির্মাণে আকার ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে স্থাপত্যে রূপান্তর ঘটে, বৌদ্ধস্তুপ হিন্দু মন্দিরের আকার রূপ নিয়েছে। বর্তমানে স্তুপ ষষ্ঠের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়া। তারাদেবী ছিলেন নালন্দার মুখ্য উপাস্য দেবী। চারকোণে ছিল সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত চারটি বুরুজ। দুটির ধ্বংসাবশেষ আজও সে সাক্ষ্য বহন করছে। গর্ভ মন্দিরে নানান দেবদেবীর মূর্তি। প্রধান স্তুপের উপর থেকে দেখে নেওয়া যায় নালন্দার ধ্বংসাবশেষ। হয়তোবা বুদ্ধের মূর্তিও ছিল। পূর্বে ৮১০- ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা দেবপালের তৈরি মনাষ্ট্রি ১, ১এ, ১বি আকর্ষণে অনবদ্য। কারুকার্যময় মন্দিরও হয়েছে বৌদ্ধতীর্থে। বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে এত বড় লোকালয় সে যুগে বিরল। আর আজ বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে গড়ে উঠেছে উদ্যান, মনুমেন্ট, নব নালন্দা মহাবিহার ও আর্ট গ্যালারি। ধ্বংসস্তুপ থেকে পাওয়া নানান সম্ভারে প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম রয়েছে। নতুন করে হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী মুক্তাঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয়, ঝলমলে সাজে থাই মন্দির, ভুটানিদের তৈরি হিউয়েন সাং মেমোরিয়াল হল। এমনকি বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়নের জন্মও এই নালন্দায়।

ভুবনেশ্বরী থেকে একটু অদূরে উপনগরী পাণ্ডু। পাণ্ডু রাজার নামে নাম। মন্দিরও আছে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে টিলার টঙ্গে পাণ্ডুনাথ। বনবাসকালে পাণ্ডবরা আসেন। বাসও করেন গণেশের ছদ্মবেশে এই পাহাড়ে। মূর্তিও তাই গণেশরূপী পঞ্চপাণ্ডবের। এছাড়াও মূর্তি রয়েছে অনেক। বৈচিত্র্য আছে নৃসিংহ অবতারের মূর্তিতে। তবে অযত্ন আর অবহেলায় ধ্বংসের কাল গুণছে পাণ্ডুর এই প্রাচীন ভাস্কর্য। আরও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদে সূর্যাস্তের দৃশ্য মনোরম।

শহর থেকে ১২ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে সন্ধ্যাচল পাহাড়ে বশিষ্ঠ আশ্রম। লোকশ্রুতি আছে, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের তপোবন ছিল এখানে। পায়ের ছাপ রয়েছে, মূর্তিও হয়েছে সঙ্গমের কাছে বশিষ্ঠের। আশ্রমের পাশ দিয়ে দামাল তিন পাহাড়ি ঝোড়া- সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা আশ্রমের কাছে ত্রয়ীর মিলনে হয়েছে বশিষ্ঠ গঙ্গা। এই গঙ্গায় অবগাহন করে শাপমুক্ত হন বশিষ্ঠ মুনি। গঙ্গা রেখে গ্রামের পথে যেতে পাথরের হাতির মূর্তিতে বৈচিত্র্য আছে। পেটের গহ্বরে ছোট গণেশ। পর্যটকদের জন্য বিশ্রাম গৃহও আছে।

মুঙ্গের

মুঙ্গের মূল আকর্ষণ সীতাকুণ্ড। রাম, ভরত ছাড়াও কুণ্ড রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি। লোকশ্রুতি আছে, সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার কালে এই কুণ্ডের উদ্ভব। বিরামহীন জল ফুটছে সেই থেকে। হাত দিলে জ্বালা অনুভব হলেও জ্বলে না। তবে পাণ্ডাদের জ্বালাতন আছে।

ভীমবাঁধ

বনবাসকালে ভীম এখানে বাঁধ গড়ে জল ধরে সুজলা-সুফলা করেন এলাকা। তাই নাম হয়ে ভীমবাঁধ।

সীতামাঢ়ী (সীতামাতার জন্ম স্থান)

জনকপুরধাম (নেপাল) থেকে বৈদ্যনাথধাম পর্যন্ত ছিল রাজর্ষি জনকের রাজ্য সেকালে। হর্ষবর্ধনের কালে রাজর্ষির সীতাদেবীকে প্রাপ্তি মাঢ়ীর কুণ্ডস্থলে। লালনও করেন সীতাকে এই সীতামাঢ়ীতে রাজর্ষি। সেই স্মৃতিতে মন্দির।

Sitamarhi

বিহার

The Birth Place of Godess Sita

The Sita Temple, dedicated to Goddess Sita, was constructed around 100 years ago. The stone statues of Lord Ram, Goddess Sita and Lord Lakshman are enshrined in the temple.

উত্তর প্রদেশ

উত্তর প্রদেশের পূর্বকথা

বৈচিত্র্যে ভরা রাজ্য উত্তর প্রদেশ। ১৯৩৫ শতকে ব্রিটিশ ভারতে আগ্রা ও অযোধ্যা মিলে নাম হয়েছিল ইউনাইটেড প্রভিন্স। রাজ্যপাটও বসে তাজনগরী আগ্রায় সেকালে। আর স্বাধীনতার পর ১৯৫০ শতকের জানুয়ারিতে ইউনাইটেড প্রভিন্স হয়েছে উত্তর প্রদেশ। এতসবের মাঝে বাতাসকে ভারি করে আওয়াজ ওঠে অক্টোবর ১৯৯৪ শতকে উত্তরাঞ্চল তথা হিমালয়ের পাদচুম্বী গাড়োয়াল ও কুমায়ুন পাহাড়কে নিয়ে পৃথক রাজ্য উত্তরাখণ্ড গড়ার। না পাওয়ার ব্যথা-বেদনা কুটিল রাজনীতির শিকার হয়ে শরিক হয় আন্দোলনের। বরফ গলে বারুদের ভাপে রক্তও ঝরে রজতশুভ্র বরফ রাজ্যে। আর মিলেনিয়াম ইয়ারে ২০০০ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে উত্তর প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে ২৬তম রাজ্য উত্তরাখণ্ড গড়লেও সমতল জুড়ে উত্তর প্রদেশ আজও অনবদ্য। ভ্রমণার্থী তীর্থযাত্রীদের স্বর্গরাজ্য উত্তর প্রদেশ। উত্তরে উত্তরাখণ্ড তথা নগাধিরা হিমালয়, দক্ষিণে শিবালিক সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে। আগ্রার তাজ ভারত ছাড়িয়ে বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করছে আজ। হিন্দুদের মোক্ষলাভের সপ্তপুরীর বারাণসী (কাশী), অযোধ্যা, মথুরা- ত্রয়ীর অবস্থান উত্তর প্রদেশে। তেমনই পুণ্যতীর্থ- বৃন্দাবন, স্বর্গের তিন নদী- গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম প্রয়াগ (এলাহাবাদ), চিত্রকুট ও বিঠুর মহিমান্বিত করেছে উত্তর প্রদেশকে। ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের মানসপটে আঁকা কৈলাস ও মানস সরোবরের পথও গিয়েছে উত্তর প্রদেশ উত্তরাখণ্ড হয়ে। এমনকি রামায়ণের কৌশল রাজ্য ও মহাভারতের হস্তিনাপুরের অবস্থানও আজকের উত্তর প্রদেশে। খ্রি.পূ. দিনগুলোতে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ও বুদ্ধের স্মৃতিতেও ধন্য উত্তর প্রদেশ। স্বয়ং বুদ্ধই প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন উত্তর প্রদেশের সারনাথে। এই উত্তর প্রদেশেই জন্ম আর কর্ম ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মিকী ছাড়াও অনেক বৈদিক মুনি-ঋষির।

কানপুর (বিঠুর)

উত্তর প্রদেশে কানপুর। এই শহরের ১২ মাইল বা ২৭ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে আরেক পুণ্য হিন্দুতীর্থ বিঠুর। অতি প্রাচীন তপভূমি। বহু পুরাতন নগর। অনেক মন্দির ও ঘাট আছে

তবে আজ জীর্ণপ্রায়। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন গঙ্গার পাড়ে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে। যজ্ঞের ঘোড়ার পায়ের ছাপ আজও দৃশ্যমান। আর আছে বাল্মিকী মুনির আশ্রম। এখানে বসে তিনি রামায়ণ রচনা করেন। সীতা দেবীও অযোধ্যা ছেড়ে আশ্রয় নেন এই বিঠুরের তপোবনে। লব-কুশের জন্মও হয় এই আশ্রমে। ভগবান রামচন্দ্রের ভাই সসৈন্য লব-কুশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এখানেই। বিঠুর থেকে ১ কি.মি. দূরে ধ্রুব টিলায় ধ্রুবধাম। এখানে ধ্রুব মহারাজের জন্ম এবং ধ্যানে বসে দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হন। আর আছে গঙ্গার অপর পাড়ে ৬ কি.মি. হাঁটা পথে সীতার পাতাল প্রবেশের স্থান পরিহার। তবে, পরিতাপের বিষয় ১৮৫৭ শতকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশের গোলায় ধ্বংস হয় অতীত। শেষ পেশোয়া বাজীরাও-এর নির্বাসিত জীবনও কাটে বিঠুরে। কানপুরের ৮১ কি.মি. আর সংকাস্যের ৫০ কি.মি. পূর্বে আরেক হারানো অতীত রোমন্থন করে নিতে পারেন হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ বা কাণ্বকুব্জ। গজনির সুলতান মাহমুদের লুণ্ঠনের পর মুসলমান আক্রমণে বিনষ্ট হয় অতীত। এমনকি ১৫৪০ শতকে এই কনৌজে শের শাহর কাছে যুদ্ধে হেরে ভারত ছেড়ে পারস্য যান হুমায়ুন। তবে, অতীতের সুবাস না মিললেও আজকের কনৌজ তার আতরের জন্য খ্যাত।

এই তীর্থের চারটি নাম। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইসব নামকরণ করা হয়েছে। বিষ্ণু ভগবানের নাভিকমল হতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। সেই সময় নাম হয় উৎপলারণ্য। ব্রহ্মা এই স্থানে হোম করেছিলেন। সেই সময় নাম ব্রহ্মাবর্ত। রাজা স্বায়ম্ভুব মনু, উত্তানপাদ এবং ধ্রুব রাজত্ব করেন। সেই সময় নাম হয় বহিষ্মতীপুরী। সেই সময় এর নাম হয় বিঠোর। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে স্নান। ব্রহ্মখুটি (ব্রহ্মদেবী), ব্রহ্মেশ্বর শিব, ধ্রুব বাল্মিকী আশ্রমে বাল্মিকী। কপিলেশ্বর শিব (কপিল মুনি প্রতিষ্ঠিত), ভূতেশ্বর শিব, ব্রহ্মেশ্বর শিবের পাশেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির। এই মন্দিরে রাম ও লব-কুশের ধনুর্বাণ আছে। পরপর এই সব দর্শন করতে হয়।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থান (ত্রিবেণী/তীর্থরাজ প্রয়াগ/এলাহাবাদ)

গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী–এই তিন নদীর সঙ্গমে এলাহাবাদ শহর বা প্রয়াগ। ত্রয়ীর মিলনস্থল এলাহাবাদের এই সঙ্গম পবিত্র হিন্দুতীর্থ। প্রতি ১২ বছর অন্তর কুম্ভমেলা আর ৬ বছরে অর্ধ কুম্ভমেলা বসে। তখন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পবিত্র সঙ্গমের জলে স্নান করে পুণ্য অর্জন করে। প্রয়াগ আর ত্রিবেণী নামেও সমধিক খ্যাত এলাহাবাদ। নানান পৌরাণিক আখ্যানও জড়িয়ে আছে প্রয়াগ নামের সাথে। বারণাবাদ নাম ছিল পৌরাণিক যুগে এলাহাবাদের। বয়স এর ৪৪৪০ বছর। ব্রহ্মা নাকি প্রকৃষ্ট যজ্ঞও করেন পুণ্যতোয়া তিন নদীর সঙ্গম অর্থাৎ প্রয়াগে। আর্যকালেও প্রয়াগ খ্যাত ছিল এলাহাবাদ। রামায়ণ, মহাভারত পৌরাণিক গ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে এই প্রয়াগের কথা। এমনকি কোশরাজ হর্ষবর্ধনের কালে প্রয়াগ ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান। এই প্রয়াগের জলে স্নান করে হর্ষবর্ধনের নিজের সর্বস্ব দান করে দিতেন প্রজাদের মাঝে। আর ইলবাস অর্থাৎ দেবতার আবাস গড়েন ইক্ষাকু বংশের রাজা প্রয়াগে। নামও হয় সেই ইলাবাস। তবে, প্রথম মুসলিম

আগমন ১১৯৪ শতকে ইলাবাসে। শাহজাহান ইলাবাসের নামান্তর ঘটিয়ে ইল্লাবাদ অর্থাৎ আল্লাহর দেশ রাখেন। আর আধুনিক শহরের স্থপতি ১৫৭৫ শতকে মোঘল সম্রাট আকবর। ১৫৮৩ শতকে যমুনা পাড়ে দুর্গ গড়ে আবার নামান্তর ঘটে হয় ইলাবাস অর্থাৎ ভগবানের আলয়। আরও পরে পাঠানদের হটিয়ে মারাঠাদের দখলে যায় ইলাবাস। আর ব্রিটিশ আসে ১৮০১ শতকে বশ্যতার প্রতিদানে অযোধ্যার নবাবদের কাছ থেকে ইলাবাস ভেট পেয়ে। ব্রিটিশকালে ইলাবাদ হয় এলাহাবাদ। ১৮৫৮ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত হস্তান্তর করে ব্রিটিশ রাজাকে এলাহাবাদের মিন্টো পার্কে। ব্রিটিশের নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সের সদর দপ্তরও বসে আগ্রা থেকে এসে এলাহাবাদে।

সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসেন মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নান করে সর্ব পাপ ক্ষয় করতে। রাজা হর্ষবর্ধন এই পবিত্র তীর্থে প্রতি ৫ বছর অন্তর একটি মহাযজ্ঞ করতেন। সেই সময় তাঁর সঞ্চিত ধন-সম্পদ মুক্তহস্তে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে দান করতেন। অবশেষে শূন্য হাতে রাজধানী ফিরে যেতেন।

ভারতে মোট সাতটি প্রয়াগ আছে। হিমালয়ে ছয়টি আর এলাহাবাদে একটি। হিমালয়ে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শোনপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ। আর এলাহাবাদে তীর্থরাজ প্রয়াগ।

দেবপ্রয়াগে–ভাগীরথীর সঙ্গে অলকানন্দার মিলন হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগে–অলকানন্দার সঙ্গে মন্দাকিনীর মিলন হয়েছে। শোনপ্রয়াগ–কেদারে পথে, ত্রিযুগীনারায়ণ ও গৌরীকুণ্ডের মাঝে মন্দাকিনীর সঙ্গে শোনগঙ্গা বা কালীগঙ্গার মিলন হয়েছে। কর্ণপ্রয়াগ–বদ্রির পথে, অলকানন্দার সঙ্গে পিণ্ডারী নদীর মিলন হয়েছে। নন্দপ্রয়াগে–অলকানন্দার সঙ্গে মন্দাকিনীর মিলন হয়েছে। বিষ্ণুপ্রয়াগে–অলকানন্দার সঙ্গে বিষ্ণুগঙ্গার মিলন হয়েছে। তীর্থরাজ প্রয়াগে–গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন হয়েছে। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ। যাত্রীগণ মোক্ষলাভের জন্য এইসব প্রয়াগে স্নান, দান ও তর্পণাদি করে থাকেন। রামায়ণে উল্লেখিত, প্রয়াগের অদূরে ভরদ্বাজ মুনি বহুকাল তপস্যায় রত ছিলেন। অদ্যাবধি ঐ আশ্রম বিদ্যমান। রামচন্দ্র বনবাসকালে অযোধ্যা ত্যাগ করে সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ এই আশ্রমে এক রাত্রি যাপন করেন। তখন তিনি গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তিনটি ধারাই দর্শন করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, এই তীর্থে সকল তীর্থের দেবতারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান করতে আসেন। যারা কল্পবাস করে সন্ধ্যাকালে ঐ দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বেলে দেয়।

দেবতাগণ আশীর্বাদ করে যান। এই ত্রিবেণী সঙ্গম অতি পবিত্র স্থান। তাই এর নাম তীর্থরাজ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে এই প্রয়াগে এসেছিলেন। এলাহাবাদ শহরে ললিতা দেবীর মন্দির আছে। এখানে সতীর হস্তাঙ্গুলি পড়েছে (সতীর একান্নপীঠের এক পীঠ)।

আরো দর্শনীয় স্থান

মিউজিয়াম, ভরদ্বাজ আশ্রম, বেণীমাধব মন্দির, কল্যাণীদেবী মন্দির (সতীপীঠ বলে বিশ্বাস), আলোপী মন্দির, নাগাবাসুকী মন্দির, শিবকুটি, অলসেন্টস ক্যাথিড্রাল, জোসেফস ক্যাথিড্রাল, পাথর গির্জা, হনুমান নিকেতন, চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক, বৌদ্ধতীর্থ কৌশাম্বি, লাক্ষাগৃহ (৪৫ কি.মি.)–এখানে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল সীতামারি (৭৫ কি.মি. দূরে সীতার প্রাপ্তিস্থল)।

আকবরের দুর্গ

১৫৭৫ শতকে সম্রাট আকবর আসেন প্রয়াগে। প্রতিরক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়াগ ঘাটেই যমুনার পশ্চিম কিনারে সরস্বতীর তীরে ১৫৮৩ শতকে দুর্গ গড়েন প্রস্তরে মোগল বাদশাহ আকবর। মজবুত বরুজ আর লাল পাথরের ৭ মি. উঁচু ইটের প্রাচীরে ঘেরা তিন প্রবেশদ্বার । চার মহলা দুর্গেও প্রথম মহলটি ছিল সম্রাটের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, দ্বিতীয় মহলটি বেগমদের আর তৃতীয়টি আত্মীয়-পরিজন-অতিথিদের, চতুর্থটি সেনাদের। আকবরনামায় জানা গেছে-৫টি কুয়ো, ২০টি আস্তাবল, ৭৭টি তহখানা, ১টি বাওলিও ছিল দুর্গে। ১৭৩৯-৫০ শতকে মারাঠা, ১৭৫০-১৮০১ শতকে পাঠান, ১৮০১ শতকে ব্রিটিশের দখলে যায় দুর্গ। আর ১৮৩৮ শতকে সংস্কারের সাথে যমুনামুখী দুটি দরজা বন্ধ করে ব্রিটিশরা। ৬২৩২০২২৪ (ছয় কোটি তেইশ লক্ষ বিশ হাজার দুই শত চব্বিশ) টাকায় তৈরি দুর্গের অতীত আজ বিনষ্ট। অতীতের কাম্যকূপ অর্থাৎ কামনা করে কূপের জলে প্রাণ দিলে পূরণ হতো পরজন্মে সে কামনা। একটি সুন্দর উপকাহিনীতেও আছে কাম্যকূপ আর অক্ষয়বট নিয়ে রয়েছে অনেক কথা।

কিংবদন্তি, মুকুন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লীশ্বর হবার কামনা করে কাম্যকূপে মৃত্যুবরণ করেন। নবজন্ম ঘটে দিল্লীশ্বর আকবর রূপে ব্রহ্মচারীর। উত্তরকালে কূপটি বুজিয়ে ফেলে দুর্গ গড়েন দিল্লীশ্বর আকবর। কূপটি লোপ পেতে লাগোয়া অক্ষয়বট থেকে যমুনায় ঝাঁপিয়ে মোক্ষলাভের মোহে আত্মাহুতির প্রথা চলতে থাকে। সত্যতা পাওয়া যায় হিউয়েন সাং (৬৪৪ খ্রি.)-এর ভারত বিবরণীতে। অন্ধ সংস্কার থেকে জীবন বাঁচাতে বৃক্ষটিও কেটে ফেলেন দিল্লীশ্বর। চার যুগের এই বটবৃক্ষ ছিল কেল্লার হাত বিশেক নিচে আঁধারি পরিবেশে দুর্গ অন্দরে। প্রথমটি রেখে আরও হাত বিশেক যেতে মূল বটবৃক্ষের অবস্থান। গাছটি অতীতে ছিল পূর্ব দেওয়ালের দরজা দিয়ে যেতে যমুনার পাড়ে। সুন্দর অলংকৃত, নানান দেবদেবীর মূর্তি খোদিত প্রাচীনতম এই মন্দিরে শ্রীরামও এসেছেন বনবাসকালে। Commandant, Ordnance Depot, Forte-এর বিশেষ অনুমতিতে দেখার প্রথা আছে। উৎসাহীদের উচিত হবে দিন পনেরো আগেই চিঠি লেখা। তবে নাও ঘাটের (পূর্ব) দরজা দিয়ে গিয়ে দুর্গের একটা অংশ দেখে নেওয়া যায়। দুর্গের পাতালপুরী মন্দিরের বাঁয়ে

দুটি বটবৃক্ষের গুড়ি সযত্নে রক্ষিত, তারও নাম অক্ষয়বট। গুড়ি দুটিতে যত্রতত্র ডালপালা বেঁধে সজীব করার (ব্যর্থ) প্রচেষ্টা পূজারী প্রাপ্তির আশায় বসে। এরাই মূল বটবৃক্ষ বলে চলেছেন পূজারী। কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। এখানে পুরাণের অনেক দেবদেবীরও সমাবেশ ঘটেছে। কালোপাথরে রাজা যুধিষ্ঠিরও রয়েছেন সিঁড়ি দিয়ে নামতেই। তেমনই আছে আওরঙ্গজেবের তরবারির আঘাতে ফেটে যাওয়া খয়েরি রঙের সিদ্ধনাথ বা প্রয়াগেশ্বর শিব। আর আছে গঙ্গার পাড়ে আরেক পৌরাণিক মন্দির কালবাসুকি।

ভরদ্বাজ আশ্রম

আজকের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়টি রূপ পেয়েছে রামায়ণে বর্ণিত ত্রেতাযুগের ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম স্থলে, অতীতে পাঠ দিতেন মুনি-শিষ্যের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। ১৯৬৮ শতকে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে সংস্কার হয়েছে। বিগ্রহ হয়েছে ভরদ্বাজ মুনি ছাড়াও নানা দেবদেবীর চত্বর জুড়ে।

কৌশাম্বী

বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত কৌশম (৮ খ্রি.পূ./৬ খ্রি.) আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত। বাসস্ট্যান্ড থেকে সোজা পিচঢালা পথে ৩ কি.মি. যেতে অশোক পিলার স্থল। মাটির প্রাচীরে ঘেরা ৬ কি.মি. ব্যাপ্ত আয়তাকার ছিল দুর্গ চত্বর। যমুনার জলে পুষ্ট পরিখাও ছিল সেকালে। খননে নানান কিছু আবিষ্কৃত হলেও অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের দুর্গটি লুপ্ত। জনশ্রুতি আছে, গঙ্গার প্লাবনে হস্তিনাপুর ধ্বংস হতে পাণ্ডবরা এসে কৌশম গড়েন। বৎস্য রাজ উদয়নের রাজ্যপাটও ছিল বুদ্ধের কালে কৌশাম্বীতে। তবে, হুনদের আক্রমণে ধ্বংস পায় অতীত। বুদ্ধও এসেছেন কৌশল তথা কৌশাম্বীতে। স্মারকরূপে ২টি বিহার হয়েছে। সম্রাট অশোকও ২টি অশোক পিলার গড়েন কৌশাম্বী নগরীতে। ১টি তার স্থানান্তরিত হয় এলাহাবাদ দুর্গে, দ্বিতীয়টি ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে। আর ছিল বৌদ্ধবিহার ঘোসিটারাম যা আজ লুপ্তপ্রায়। ১ কি.মি. পশ্চিমে শ্বেতগম্বুজ শিরে দিগম্বর জৈন মন্দির।

রাজা অশোকের দুর্গ

আকবর দুর্গের ফটকের বিপরীতে অশোক পিলার। খ্রি.পূ. ২৪২ শতকে তৈরি ১০.৩ মি. উঁচু বেলেপাথরের শিলালিপিতে সম্রাট অশোকের অনুশাসন ছাড়াও পরবর্তীকালে সমুদ্রগুপ্তের (৩২৬-৩৭৫ খ্রি.) বিজয়গাথাও খোদিত হয়েছে। ১৬০৫ শতকে জাহাঙ্গীরও কিছু লিপিবদ্ধ করেন পিলারে। সম্ভবত কৌশাম্বী থেকেই স্থানান্তর ঘটে শিলালিপির। তবে দীর্ঘকাল পড়ে থাকা শিলালিপিটি নতুন করে প্রোথিত হয় ১৮৩৭ শতকে। আজ স্পষ্টও বটে লিপি। প্রতিদিন ১০টায় সিকিউরিটি অফিসারের অগ্রিম অনুমতিতে দুর্গের সীমিত অংশ দেখার ব্যবস্থা আছে। বিদেশিদের প্রবেশ নিষেধ।

বড় হনুমান মন্দির

সঙ্গমের কাছে এই অভিনব মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় পবনপুত্র হনুমানের বেশ বড় আকারে শায়িত মূর্তি। এখানে বছরে একবার হলেও সঙ্গমের জল ফুলে উঠে পবনপুত্রের চরণ ধুয়ে দেয়।

বারাণসী (কাশী)

বারাণসীর মূল আকর্ষণ গঙ্গা। সেকালের কাশী আজকের বারাণসী সনাতন ধর্মের পবিত্রতার প্রতীক। পুণ্যতোয়া অর্ধ চন্দ্রাকৃতি গঙ্গার পশ্চিম তীরে বরুণা ও অসি নদীর সঙ্গমে বিশ্বের প্রাচীনতম লিভিং সিটি বারাণসী। খ্রি.পূ. ৭ শতকে ব্যাবিলন ও নিনেভার সমতুল্য বারাণসী। তবে, হানাদারের হানায় বারবার অতীত ধ্বংস পেলেও পুনের পেশোয়, ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, বারাণসী রাজাদের হাতে মন্দির ও ঘাট তথা শহর গড়েছে নতুন করে। উপনিষদেও সকল তীর্থের সেরা-তীর্থরাজ কাশীর নাম পাওয়া যায়। সপ্তপুরীর এক পুরীও বারাণসী। পুরাণে আছে, খ্রিষ্টের জন্মের ১২০০ বছর আগে সুহোত্র-পুত্র কাশ্য পত্তন করেন নগরী। কাশ্য থেকে নাম হয় কাশী। দ্বিমতে আছে, সূর্যোদয়ে বারাণসী আকাশ গোলাপি লাল অর্থাৎ কষায় (গৈরিক) রং ধরে। কষায় থেকে কাশী (The City of Light) নামকরণ। আরও পরে কাশীরাজ বরণা বারাণসী নামে এক দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। নামান্তর ঘটে কাশী হয় বারাণসী। আবার বামন পুরাণে মেলে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত অব্যয় পুরুষের দক্ষিণ পদ থেকে সর্বপাপহরা মঙ্গলদায়িনী বরুণ (উত্তরে) ও বামপদ থেকে অসি (দক্ষিণে) নদীর উদ্গাম। দুইয়ের মিলনে বারাণসী। মধ্যযুগে কিছুকালের জন্য কনৌজের অধীনে ছিল কাশী। তারও পরে ৭ শতকে কাশী যায় বাংলার পাল রাজাদের দখলে। পাল রাজাদের পর কাশী যায় মুসলিম নৃপতিদের হাতে। মুহম্মদ ঘোরি (১০৩৩), কুতুব-উদ্-দীন ঘোরি (১১৯৪), আলাউদ্দীন খিলজি (১২৯৪-১৩১৬), আওরঙ্গজেবের (১৭ শতক) হাতে বিনষ্ট হয় নানা মন্দির বারাণসীর। ১৮ শতকে মোহম্মদাবাদ নামও হয় স্বল্পকালের জন্য কাশীর। অবশেষে ১৭৩৮ শতকে হিন্দু রাজ্য গড়ে ওঠে বারাণসীতে। ব্রিটিশরা আসে ১৭৭৫ শতকে। ১৯১০ শতকে রামনগরকে সদর করে বারাণসীকে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গড়ে তোলে ব্রিটিশরা। আর ১৯৪৯ শতকে উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় বারাণসী।
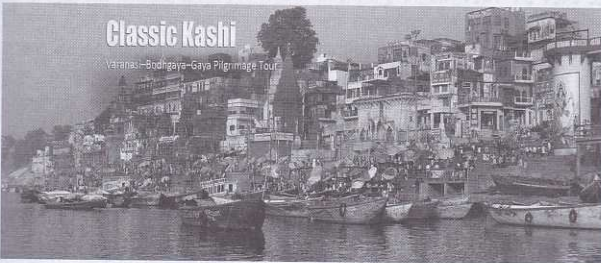
বারাণসী বিশ্বনাথের মন্দির সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র স্থান। প্রবাদ আছে যে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে যত তীর্থ আছে-কাশীখণ্ডের গঙ্গা তাদের মধ্যে অন্যতম। পুরাণ

বলে, গঙ্গাতীরে বাস করে মুক্তিলাভ পাওয়া যায়। এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল পানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। তিনরাত্রির পঞ্চকোশী রোডে বেষ্টিত গঙ্গাতীরে বাস করলে নরক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তাই ছুটে আসেন পুণ্যার্থীর দল গঙ্গার ঘাটে স্নান করে পুণ্য অর্জনের তরে। তেমনই একান্ন সতী পীঠেরও এক বারাণসী। দেবীর কুণ্ডল পরে মণিকর্ণিকা ঘাটে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিও আজ ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্ব-ভুবনময়। কাশী ভ্রমণার্থীদের কাছে সারনাথ ও রামনগরের আকর্ষণও অনবদ্য। রাজগীর থেকে মথুরা সার্কিট আরেক বৌদ্ধ-তীর্থ সারনাথে বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ঘটে। তবে, সবেরই উর্ধ্বে ভারতীয় পর্যটন মানচিত্রে বারাণসী আজ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। পর্যটকও আসছেন দেশ-দেশান্তর থেকে বারাণসীতে। যাঁহা বনতা হ্যায় (শিল্পের) রস অর্থাৎ বেনারস বা বানারস ব্রিটিশের মুখে সমধিক খ্যাত হলেও ১৯৫৬ শতকে ২৪শে মে সরকারি বিধানে বারাণসী বা কাশী নাম স্বীকৃত। গ্রীষ্মের খরতাপ (৪৬.০১ ডিগ্রি-৩২.০২ ডিগ্রি সে.) আর জুন থেকে সেপ্টেম্বরে মনসুন এড়িয়ে চলা যেতে পারে ৮০.৭১ মি. উঁচু বারাণসী। জুলাই থেকে আগস্টের মৌসুমে ভয়াবহ আকার নেয় গঙ্গা। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস বারাণসী বেড়াবার মনোরম সময়। শীতে তাপমাত্রা থাকে ১৫.৫-৫ ডিগ্রি সে.।

শ্রীবিশ্বনাথ মন্দির

সব দেবতার সেরা কাশীর বিশ্বনাথ। সনাতন ধর্মের কাছে পবিত্র তীর্থ। দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে দক্ষিণে এগুতেই ডানহাতি, আর গোধূলিয়া বরাবর বামহাতি পথ গিয়েছে বিশ্বনাথের গলি। সঙ্কীর্ণ গলিপথে সনাতন ধর্মের নানান দেবদেবী। সামনেই মূল মন্দির–দেবতা কালোপাথরের বিশ্বেশ্বর।

শ্রীবিশ্বনাথ মন্দিরের পূর্বকথা

১১ থেকে ১৭ শতকে বারবার মুসলিমদের আক্রমণে বিনষ্ট হয়েছে মন্দির। সংস্কারও হয় প্রতিবার। ১৮৫৫ শতকে আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের সংস্কার করা আদি মন্দিরটি ধ্বংসের পর ১৭ শতকের গোড়ায় বেণীমাধব রাও সিন্ধিয়ার গড়া মন্দিরটি ১৬৬৯ শতকে আওরঙ্গজেবের হাতে ধ্বংস হয়। গ্রেট মস্ক তথা আলমগীর মসজিদও গড়ে আওরঙ্গজেবের ধ্বংস করা হিন্দু মন্দিরের উপর। মসজিদের শিরে ৭১ মি. উঁচু আজান মিনার দুটি বেণীমাধবের ধ্বজা নামে সমধিক খ্যাত। আজকের মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে, মসজিদের পিছনে ছিল আদি মন্দির। তবে, ধ্বংসাবশেষও বিনষ্ট হয়েছে ১৯৪৮ শতকের ভয়াবহ বন্যায়। ধ্বংসস্তুপে পথ গিয়েছে বড় রাস্তা হয়ে ঘুরপথে। তবে, মন্দির স্থাপত্যের নানান নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় মসজিদের ভিতরে ও পেছনের অংশে। ১৩ শতকে রাজিয়া মসজিদটিও আরেক ধ্বংসের পর গড়ে ওঠে।

হিউয়েন সাং-এর বিবরণীতে জানা যায়, সেকালের মন্দিরে বিগ্রহ ছিল ১০০ হাত উঁচু, রং ছিল তামাটে। অতীত ধ্বংস হতে ১৭৭৭ শতকে ইন্দোরের রানি অহল্যাবাঈ হোলকার বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করেন। আর পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং মন্দিরের শিখরগুলো
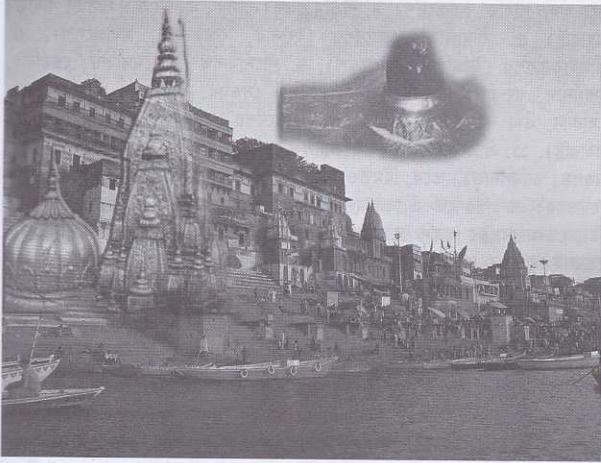
তামার পাতে ৮২০ কেজি সোনা দিয়ে মুড়ে দেন ১৮৩৯ শতকে। মন্দিরের সুঁচালো মূল শিখরটিও সোনার। এর উচ্চতা ৫১ ফুট। মূল শিখরটির চারপাশ ঘিরে অনেকগুলো ছোট ছোট শিখর। মন্দিরের সুন্দর ঘন্টাটি নেপালের মহারাজার দান। আর গলিপথে মন্দিরের বামে নহবতখানাটি ওয়ারেন হেস্টিংসের ভেট।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুই দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সংঘাত। দুজনই অটল, অনড় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ছাড়তে। সংঘাত যখন জটিল থেকে জটিলতর হয় তখন হঠাৎ এক আলোস্তম্ভ থেকে উদ্ভাসিত জ্যোতিতে দুই দেবতাই দম্ভ ভুলে গিয়ে পরম বিস্ময়ে বিহ্বল। বিষ্ণু বরাহ রূপ নিয়ে পাতাল আর ব্রহ্মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ঈগলের রূপ নিয়ে হাজার বছর ধরে জ্যোতির উৎস উদ্ভাবনে বিশ্ব চরাচর তোলপাড় করেও ব্যর্থ হলেন। দাম্ভিক দেবতাদ্বয় চিন্তায় আকুল; একান্তই বিহ্বল হয়ে অবলোকন করলেন জ্যোতির স্তম্ভ থেকে স্বয়ং শিবঠাকুরের উদ্ভব। দুই দেবতারই তখন দাবি ভুলে শ্রদ্ধা নিবেদনের সাথে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি জানালেন শিব ঠাকুরকে। লিঙ্গরূপী দ্বাদশ জ্যোতি স্তম্ভ অর্থাৎ দ্বাদশ লিঙ্গ থেকেই বিচ্ছুরিত হয়ে থাকবে– শিব ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের উদ্ভব ঘটে এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ থেকে। শৈবধর্মের কাছে মহান তীর্থও এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের স্থান

১. শ্রীবিশ্বেশ্বর বা কাশী বিশ্বনাথ (বারাণসী, উত্তর প্রদেশ), ২. শ্রীকেদারনাথ (হরিদ্বার-রূদ্রপ্রয়াগ-গৌরীকুণ্ড-কেদার, উত্তরাঞ্চল), ৩. শ্রীমল্লিকার্জুন স্বামী (শ্রীশৈলেন

হয়ে ঋষভ পাহাড়, অন্ধ্রপ্রদেশ), ৪. শ্রীভীম শঙ্কর (নাসিক, মানচর হয়ে সহ্যাদ্রি পাহাড়, মহারাষ্ট্র) ৫. শ্রীমান্ধাতা ওঙ্কারেশ্বর (ইন্দোর, ওঙ্কারেশ্বর, মধ্যপ্রদেশ), ৬. শ্রীমহাকালেশ্বর (উজ্জয়িন, মধ্যপ্রদেশ), ৭. শ্রীসোমনাথ (আহমেদাবাদ, ভেরাবল, সোমনাথ, গুজরাট), ৮. শ্রীবৈদ্যনাথ (জসিদি দেওঘর, ঝাড়খণ্ড), ৯. শ্রীনাগেশ্বর (দ্বারকা, ওখা নাগেশ্বর, গুজরাট) ১০. শ্রীঘৃষণেশ্বর (মানমদ, ওরঙ্গাবাদ, ইলোরা, মহারাষ্ট্র), ১১. শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর (মুম্বাই, নাসিক, মহারাষ্ট্র), ১২. শ্রীরামেশ্বরম (চেন্নাই, মণ্ডপম, তামিলনাড়ু)। তবে, দ্বিমতও আছে কোনো কোনো জ্যোতির্লিঙ্গে। শ্রীবৈদ্যনাথ (দেওঘর)-এর পরিবর্তে শ্রীবৈজনাথ (কাংড়া পালামপুর/হিমাচল প্রদেশ), আবার ভিন্নমতে মহারাষ্ট্রের পারলি বৈজনাথকে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অষ্টম বলে মনে করেন। তেমনই নাগেশ্বর-এর বদলে মহারাষ্ট্রের আয়ুধ নাগনাথকেও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের নবম লিঙ্গ বলে থাকেন লোকে।

জ্ঞানভাপী কূপ

মন্দির ও মসজিদের মাঝে বিশ্বনাথ মন্দির লাগোয়া উত্তরে জ্ঞানের কূপ জ্ঞানভাপী-রুদ্ররূপী ঈশান তাঁর ত্রিশূল দিয়ে খনন করেন এই কূপ। আর কূপের এক হাজার কলস জলে স্নান করান বিশ্বনাথকে। দ্বিমতে, মুকুন্দ ব্রহ্মচারী কাশীধামে এসে বিশ্বেশ্বর পূজার জল পেতে আপন মুষ্ট্যাঘাতে মৃত্তিকা খনন করতে যোগবলে ভোগবতী ওঠেন। কালাপাহাড় অর্থাৎ গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান কালাচাঁদ রায় ইসলাম হয়ে কাশীতে আসেন মন্দির ধ্বংস করতে, তখন বিশ্বনাথ এই জ্ঞানভাপীতে আশ্রয় নেন। জ্ঞানভাপীর জলে আত্মাহুতিতে মোক্ষলাভ হয়। আর জ্ঞানভাপীর মন্দিরটি ১৮৩০ শতকে গোয়ালিয়রের রানি বৈজাবাঈ-এর তৈরি।

মাতা অন্নপূর্ণা মন্দির দর্শন

বিশ্বনাথ মন্দিরের বিপরীতে গলিপথেই ১৭২৫ শতকে পেশোয়া বাজীরাও (১ম)-এর তৈরি অন্নপূর্ণা মন্দির। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নকূট উৎসবের অন্নভোগ দেখবার মতো। স্বর্ণনির্মিত মূল দেবী-মূর্তিরও দর্শন মেলে উৎসবকালে। শোনা যায়, মন্দিরের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে বারাণসীতে। এদের মধ্যে ৮ কিমি. দক্ষিণে অসিতে ১৮ শতকে বাংলার রানি ভবানীর তৈরি নাগারা শৈলীর গৈরিক রঙা শক্তির দেবী দুর্গা মন্দিরটিতে অভিনবত্ব আছে। পাঁচটি শিখর মিলেমিশে এক হয়েছে। অর্থ তার পরম ব্রহ্মে লীন হয়েছে পঞ্চভূত। প্রচুর বানরের অবস্থানহেতু মাংকি টেম্পল নামেও সমধিক খ্যাত। তবে সাবধানতা পদে পদে বানর থেকে। মন্দির লাগোয়া কুণ্ডের জলে স্নানে পুণ্য হয়।

তুলসী মানস মন্দির

রামচরিত মানস স্রষ্টা তুলসীদাসের স্মৃতিতে ১৯৬৪ শতকে তৈরি শিখধর্মী তুলসী মানস মন্দিরটিও কাশীর দর্শনীয়। মন্দিরে দেবতা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা। দুপাশে লক্ষ্মী-নারায়ণ-অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথ। এখানে বাসও করতেন তুলসী দাস। হিন্দিতে

অমরকাব্য রামচরিত মানস রচনাও করেন কবি এখানে। মৃত্যু হয় তুলসী দাসের ১৬২৩ শতকে। শ্বেতমর্মরে উৎকীর্ণ হয়েছে রামচরিত মানস অর্থাৎ হিন্দিতে রামায়ণের আটখণ্ড দোঁহা। দ্বিতলে, ডিজনিল্যান্ড সম রামায়ণ আখ্যান প্রদর্শিত হয়েছে সচল পুতুলে। বৈচিত্র্য আছে ক্যান্ট স্টেশনের দক্ষিণে বিদ্যাপীঠ রোডে বাবু শিব প্রসাদ গুপ্তা ও দুর্গাপ্রসাদ ক্ষেত্রীর উৎসর্গিত ভারত মাতার মন্দিরে। গোধূলিয়া থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিমে ১৯৩৬ শতকে দ্বারোদ্ঘাটন করেন জাতির জনক গান্ধীজী।

ভৈরবনাথ মন্দির

১৮২৫ শতকে বাজীরাও (২য়)-এর গড়া কাশীর কোটাল কালভৈরব তথা ভৈরবনাথের মন্দির, কুকুর তার বাহন। কাছেই দণ্ডপাণির মন্দির ও কামরূপ। জনশ্রুতি আছে, এই কূপের জলে নিজ মুখ দেখতে না পেলে মৃত্যু নাকি তার অনিবার্য। এছাড়া রয়েছেন গণেশ, অন্নপূর্ণা, শুক্রেশ্বর, শনৈশ্চর। প্রবাদ আছে, কাশী এলে গণেশ মন্দিরে জানিয়ে যেতে হয় ফেরার কথা। পুরীতে আছেন সাক্ষীগোপাল। তেমনই সঙ্কটত্রাতা সঙ্কটমোচন রয়েছেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। অদূরে হনুমান মন্দির। বাঙ্গালি টোলার কাছে তিলেভাণ্ডেশ্বর মন্দির। জনশ্রুতি আছে যে, তিলে তিলে দেবতা বেড়ে চলেছেন আজও এখানে।

কাশীর গঙ্গা-উত্তর বাহিনী গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে কাশী বা বারাণসী নগরী। ঘিঞ্জি, সঙ্কীর্ণ গলিঘুজি, গাড়িঘোড়াও ঢুকতে অক্ষম কাশীর নানান গলিতে। সূর্যালোকেরও প্রবেশ নিষেধ। তারই মাঝে ৩৬৫টি ঘাট হয়েছে কাশীর গঙ্গায়। ৩ কি.মি. ব্যাপ্ত ঘাট সদাই ব্যস্ত। ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয় ঘাটের। ঘাটগুলো সেকালের রাজা-মহারাজ-শ্রেষ্ঠীদের তৈরি। দক্ষিণে হরিশ্চন্দ্র তথা মহাশ্মশানে ঘাটের শুরু আর শেষ হয়েছে উত্তরে মণিকর্ণিকায়। আর রয়েছে সারি দিয়ে বাড়ি হেলেদুলে, কখনওবা ঝুলে পড়ে স্নান সারছে গঙ্গার জলে।

কাশীখণ্ডের গঙ্গার মাহাত্ম্যের কথা ভাষায় অবর্ণনীয়। তীর্থযাত্রীদের কাছে পবিত্রতার, পরিত্রাণের প্রতীক এই গঙ্গা। বারাণসীর নবতম উৎসব গঙ্গামহোৎসব। এক কথায় বলা চলে, কাশীর গঙ্গায় স্নান করলে সর্বরোগ দূর হয়, সর্বপাপ ক্ষয় হয়। গঙ্গাতীরে তিন রাত্রি বাস করলে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি ঘটে। এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল পানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। গঙ্গা ক্ষেত্রে দান করলে পুণ্য অর্জন হয়। আবার গঙ্গাতীরে দান গ্রহণ করলে পাপের শামিল হয়। তেমনই কাশীর গঙ্গা পলিউশনেও আজ ভারত সেরা।

পণ্ডিতদের শহর কাশী। ঘাট জুড়ে ছাতা নিয়ে বসে আছে পণ্ডিতের দল, জন্ম থেকে মৃত্যু অনেক হিন্দু-উপাচার পালিত হচ্ছে, মাথা কামাচ্ছে নাপিত। হঠযোগীরাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের শরীরচর্চায়। চলে কুস্তির কসরত, যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম–আসর বসে কথকতার। তারই মাঝে আট থেকে আশি বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ স্নান করছেন অতি নির্লিপ্তভাবে। স্নানান্তে উদিত সূর্যের প্রথম রশ্মিকে প্রণাম জানাতে আসেন শহর ভেঙ্গে পুণ্যার্থীর দল। ইতি-উতি ক্যামেরা হাতে ট্যুরিস্ট। সন্ধ্যায় (৭টায়) দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা

সেবানিধির ও গঙ্গা মাইয়ার আরতি দেখতেও দর্শনার্থী আসেন সারা বারাণসী থেকে। গঙ্গা আরতি শেষ হতেই দিয়াও ভাসান গঙ্গায়, প্রসাদও মেলে গঙ্গা মায়ের। গঙ্গারতি শেষ হতেই সন্ধ্যা আরতি শুরু হয় বিশ্বনাথ মন্দিরে।

কিংবদন্তি আছে যে, শিব এই শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হিন্দু মহাকাব্য মহাভারত-এর নায়ক পাণ্ডব ভ্রাতা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে উদ্ধার পেতে শিবের খোঁজ করতে করতে এই শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে আছে, যে সাতটি শহর মোক্ষ প্রদান করতে পারে, সেগুলোর একটি হলো এই বারাণসী। বারাণসীতে যে সবচেয়ে পুরানো পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে অনুমিত হয় গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই শহরে জনবসতি ও বৈদিক ধর্ম ও দর্শন শিক্ষাকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীতে। এইজন্য বারাণসীকে বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি মনে করা হয়। বারাণসী একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে ওঠে। এই শহর মসলিন ও রেশমের বস্ত্র, সুগন্ধি দ্রব্য, হাতির দাঁতের কাজ ও ভাস্কর্য শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের গায়েই দেখবেন আওরঙ্গজেবের তৈরি বিতর্কিত বেণীমাধব কা দারেরা নামে মসজিদ।

ভারত কলা ভবন ও নিউ বিশ্বনাথ মন্দির

পণ্ডিত মদনমোহন মঙ্গল কাব্যের সক্রিয় উদ্যোগে গড়া বেনারস ইউনিভার্সিটি কমপ্লেক্সের মধ্যেই রয়েছে ভারত কলা ভবন নামে মিউজিয়াম এবং বিড়লাদের সুউচ্চ নিউ বিশ্বনাথ মন্দির।

চুনার

বারাণসী থেকে ৩৫ কি.মি. দূরে চুনারের প্রধান আকর্ষণ গঙ্গার ধারে সুবিশাল দুর্গ। পুরাণ মতে, বামন অবতারে ভগবান বিষ্ণু তাঁর প্রথম চরণ স্থাপন করেন এখানকার পবিত্র ভূমিখণ্ডে, তাই এর নাম হয় চরণাদ্রি। উজ্জয়িনীর শাসক মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ভাই ভৃতহরি এখানে কঠিন তপস্যা করার পর জীবন্ত সমাধি নিয়েছিলেন। চুনার দুর্গের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে রাজা সহদেব ১০২৯ সালে বর্তমান দুর্গটি নির্মাণ করেন। রাজা সহদেবের সাহসী কন্যা সোনহা বা সোনওয়ার সঙ্গে তৎকালীন মাহবা মহারাজা আলহাখন্দের বিবাহস্থল হিসেবে নির্মিত "সোনহা-মণ্ডপ" আজও দুর্গের প্রধান দ্রষ্টব্য। এই দুর্গের প্রথম নির্মাতা রাজা বিক্রমাদিত্য। সোনহা মণ্ডপের পেছনে দেখবেন বিক্রমাদিত্যের ভাই ভৃতহরির সমাধি। প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর ১৫২৫ সালে এই দুর্গের অধিকার নেন। মাঝে শেরশাহের হাত চলে যাবার পর আবার পুনরায় দুর্গ জয় করেন ১৫৭৪ সালে। এরপর টানা প্রায় দুশ বছর মোঘলদের অধীনে থাকার পর ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দখল করে ঐতিহাসিক চুনার ফোর্ট। জনশ্রুতি আছে যে, এই দুর্গ থেকে একটি ঐতিহাসিক গোপন সুড়ঙ্গ পথ গঙ্গায় নেমে গেছে। বর্তমানে ভারত সরকার এখানে গড়ে তুলেছে প্যাকের (প্রভিনশিয়াল আর্মড কোর) ট্রেনিং সেন্টার। তাই কেবলমাত্র সোনহা মণ্ডপ ও ভৃতহরির সমাধি ছাড়া দুর্গের

অভ্যন্তরে সাধারণ পর্যটনদের প্রবেশ অধিকার নেই। দুর্গ ছাড়াও চুনারে দেখবেন হজরত সুলেমানের দরগা, পাথর খোদাই শিল্পের কাজ ও প্রায় ২ কি.মি. দুর্গা মন্দির ও কালী মন্দির।

বিন্ধ্যাচল (সতীর একান্ন পীঠের এক পীঠস্থান)

বারাণসী থেকে ৭০ কিমি. দূরে সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম বিন্ধ্যাচল প্রধান দ্রষ্টব্য বিন্ধ্যাবাসিনী মন্দির। এই স্থানে সতীর বাম পায়ের আঙ্গুল পড়েছিল। পুরাণ মতে, এই সেই স্থান যেখানে দেবী স্বহস্তে শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন।

সীতাকুণ্ড

বনবাসকালে ফেরার পথে বিন্ধ্যা পর্বতে তৃষ্ণার্ত সীতাদেবীর তৃষ্ণা মেটাতে তীর মেরে জলের ধারা বের করেন দেবর লক্ষ্মণ। স্মারকরূপে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও সিংহবাহিনী দুর্গা মায়ের মন্দির রয়েছে। সীতা এখানে স্নানও করেছিলেন।

অষ্টভুজা মন্দির

৪৮ ধাপের সিঁড়ি উঠে সীতাকুণ্ড হয়ে পথ গিয়েছে অনুচ্চ আর এক পাহাড় চুড়োয় অষ্টভূজার মন্দিরে। নামে মন্দির হলেও আসলে গুহার দেওয়ালে দেবীর মূর্তি। গুহার প্রবেশটি খুবই সংকীর্ণ। বিন্ধ্যাবাসিনী দুর্গাই এখানে অষ্টভূজা। পূরাণ মতে, যশোদার গর্ভজাত মহামায়াকে কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ভেবে আছাড় মারতে উদ্যত হলে মহামায়া আকাশবাণী শুনিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। এরপর বর্তমান মন্দির স্থলে আবির্ভূত হয়ে ভগবতী দুর্গা রূপে এখানে সদা বিরাজমান। সংকীর্ণ গুহাপথে ভেতরে গিয়ে মূর্তি দর্শন করতে হয়।

কালীখোহ

বিন্ধ্যা পর্বতের উপরে একটা গুহার মধ্যে মা কালীর জাগ্রত মুখ কালীখোহ নামে প্রসিদ্ধ। পুরাণ মতে, রাক্ষসদের হাতে দেবতাদের লাঞ্ছিত হবার কথা শুনে এই স্থলে গৌরবর্ণ পার্বতী এত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে, উনার স্বর্ণ অঙ্গ কাজলের মতো হয়ে যায় (দেবীর নাম তখন থেকে কালী)। এখানেও দেবীর নাম কালী, চণ্ডী ও চামুণ্ডা। ধর্মপ্রাণ ভক্তরা পার্বত্য পথে বিন্ধ্যাবাসিনী অষ্টভুজা কালীখোহের মধ্যে মহাত্রিকোশ পরিক্রমা সম্পন্ন করেন।

আরো দর্শনীয়– ব্রহ্মকুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড, কংতিত শরীফ, তারকেশ্বর মন্দির, বুরনাথের মন্দির, নারদ মন্দির, গেরুয়াতালাও, মোতিয়া তালাও, ক্ষেত্রপাল মন্দির, কামাখ্যাদেবী মন্দির, শিবখোব, রাবণের তপস্যাস্থল, সাক্ষীগোপাল মন্দির, সংকটমোচন হনুমান মন্দির।

রামনগর ফোর্ট ও মিউজিয়াম

গঙ্গার অপর পাড়ে বারাণসীর অতীত রাজাদের দুর্গ তথা প্রাসাদের একাংশে গড়ে উঠেছে মিউজিয়াম। এখানে দেখবেন রাজাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন আমলের ঘোড়ার গাড়ি, পালকি, চৌদোলা, কার্যমণ্ডিত হাওদা, পোশাক পরিচ্ছদ, অভিনব ঘড়ি, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, দুর্গের একটা অংশে দেখবেন রামনগরের বিখ্যাত রামলীলার কিছু দৃশ্যের ফটোগ্রাফ।

সারনাথ
বারাণসী থেকে মাত্র ১০ কি.মি. দূরে সারনাথের বৌদ্ধ ধর্মের উন্মেষ হয়েছিল। বোধগয়ায় 'বোধি' লাভের পর বুদ্ধদেব সারনাথে এসে এখানকার মৃগ উদ্যানে সবার প্রথমে ধর্মীয় উপদেশ দান করেন। বৌদ্ধদের কাছে এই ঘটনা 'মহাধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে খ্যাত। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, বুদ্ধদেবের আমলে এই সুপ্রাচীন জনপদের নাম ছিল 'ঋষিপত্তন'। সারনাথ নামটা এসেছে সারঙ্গনাথ (সারঙ্গ শব্দের অর্থ মৃগ) থেকে। সারনাথে দেখবেন সারঙ্গনাথেশ্বর বা সজ্ঞেশ্বর মহাদেব মন্দির।

চৌখণ্ডী স্তূপ
সারনাথের প্রবেশের পথেই বাদিকে এই বিশাল স্তূপকে ছোটখাটো টিলা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট অশোক ২৩৪ খ্রি. পূর্বে এখানে এসেছিলেন। উনি এই সুবিশাল স্তূপটি নির্মাণ করান।

ধামেক স্তূপ
সারনাথের সবচেয়ে উলেখযোগ্য দ্রষ্টব্য চোঙ্গাকৃতি সাড়ে তেতাল্লিশ মিটার উঁচু ধামেক স্তূপ। ভূমির কাছে এই স্তূপের ব্যাস ২৮ মিটার এবং নিচের অংশে দেখবেন গুপ্তযুগের স্থাপত্য নিদর্শন।

মূলগন্ধকুটি বিহার
সারনাথের অপর আকর্ষণ মহাবোধি সোসাইটি নির্মিত এই আধুনিক বুদ্ধ মন্দির। এখানে দেখবেন জাপানের অগ্রণী শিল্পী কেতসু নোসুর আঁকা অসাধারণ কিছু ফ্রেস্কো। আদি মূলগন্ধকুটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ কিছু দূরে।

সারনাথ মিউজিয়াম
এই সরকারি সংগ্রহশালায় অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তির সংগ্রহ বিস্ময় উদ্রেক করে। এখানে প্রত্যক্ষ করুন বৌদ্ধ শিল্প ও ভাস্কর্যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো এবং অশোক স্তম্ভের (জাতীয় প্রতীক) শীর্ষদেশের চারটে পরস্পর সংলগ্ন সিংহমূর্তি। শুক্রবার মিউজিয়াম বন্ধ থাকে। অন্য দিন খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

শ্রীদশাশ্বমেধ ঘাট
স্নানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা কাশীর রাজা করলেন দিব্যোদাস (রিপুঞ্জয়)-কে। ব্রহ্মার পরামর্শে রাজা দিব্যোদাস রুদ্র সরোবরের তীরে দশ+অশ্ব+মেধ (যজ্ঞ) করেন। নামেরও বদল ঘটে সেই থেকে। ব্রহ্মার বাঞ্ছাপূরণে একে একে দেবতাদেরও সরালেন কাশী থেকে দিব্যোদাস। শিবও কাশী ছাড়ার উদ্যোগ নিতে ব্রহ্মাই দিব্যোদাসের প্রতি তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। আর আছে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রজেশ্বর শিব মন্দির। দানের প্রত্যাশায় সারি বেঁধে বসে ভিখারির দল। ভিখারিদের গার্ড অব অনার পেরুতেই ডানে দেবী শীতলার মন্দির।

দশাশ্বমেধ-এর দক্ষিণে

প্রয়াগ ঘাট, শীতলা ঘাট, ইন্দোরের রানি অহল্যাবাঈ-এর তৈরি অহল্যাবাঈ ঘাট, মুনশি ঘাট লাগোয়া দ্বারভাঙ্গার রাজবাড়ি, দ্বারভাঙ্গা ঘাট, উদয়পুরের মহারানা ও রানির তৈরি রানা মহল ঘাট, ধোবি ঘাট, ৬৪ যোগিনীর মন্দির তথা চৌষট ঘাট, দিগপতিয়া ঘাট, পাড়ে ঘাট, পুনের বালাজী পেশোয়া রাওয়ের তৈরি রাজঘাট (রাজঘাটের শিরে ২০ শতকের মালব্য সেতু, বাঁয়ে ১৭৭৩ শতকের লালখান কা রৌজা), নারদ ঘাট (জনশ্রুতি আছে, স্বামী-স্ত্রী একত্রে স্নানে নামলে দাম্পত্য কলহ অবশ্যম্ভাবী, অম্বররাজ মান সিং-এর তৈরি শিবের বাড়ি কৈলাস ও মানসের স্মরণে মানস সরোবর ঘাট, কেদার ঘাটের শিরে কেদারনাথের মন্দিরে কালোপাথরের লিঙ্গমূর্তি, স্নানে নানান ব্যাধির পরিহার, সোমেশ্বর (চন্দ্র) ঘাট, চৌকি ঘাটে বৃক্ষতলে নাগ দেবতা (জনশ্রুতি আছে, বুদ্ধও নাকি পিপুল বৃক্ষতলে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন), লীলা ঘাট, পুরাণখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যা-রুহিতাস্য স্মৃতিমণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র ঘাট তথা মহাশ্মশানে লোকালয় থেকে দূরত্ব হেতু শব আসছে কম। আরও যেতে হনুমান ঘাট, বারাণসীর রাজার প্রাইভেট শিবালা বা কালীঘাট, চেতসিং-এর দুর্গ পেরিয়ে বাঙ্গালি মাতা আনন্দময়ী ঘাট, অতীতের লোলারকা ঘাট আজ হয়েছে তুলসীদাসের স্মরণে তুলসী ঘাট। তবে, লোলারকা কুণ্ডে আজও আগস্ট-সেপ্টেম্বরের লোলারকা মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন সন্তান কামনায়। জৈনরাও ঘাট গড়েছে–বেচারাজ ঘাট। তিনটি জৈন মন্দিরও হয়েছে ঘাটে। অদূরে জানকী ঘাটের কাছে বৈদ্যুতিক চুল্লির শ্মশান। অসি ঘাট, অসি নদীর মিলনও ঘটেছে গঙ্গায় এখানে। কিংবদন্তি আছে, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর দুর্গার অসি পড়ে এই ঘাটেই। পিপুল বৃক্ষতলে শিবঠাকুরও রয়েছেন লিঙ্গে। পবিত্র অসি ঘাটের পূর্ব তটে রামনগর। দক্ষিণী বিহারও শেষ অসি ঘাটে।

দশাশ্বমেধ-এর উত্তরে

উত্তর দিকে রয়েছে রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাট, ১৬০০ শতকের অম্বররাজ মান সিং-এর তৈরি মানমন্দির ঘাট, অতীতের প্রাসাদে ১৭১০ শতকে মানমন্দির (৯৩০-১৭৩০) অর্থাৎ অবজারভেটরিও গড়েন জয়পুররাজ জয় সিং। লাগোয়া ডোম রাজা লালুয়া ডোমের ইমারত, সমাজে তথাকথিত অস্পৃশ্য (শবদাহী) হলেও বাড়িটি সুন্দর। মীরা বাঈয়ের তৈরি মীরা ঘাট তথা দেবী বিশালাক্ষী ছাড়াও ধর্মকূপ রয়েছে। অদূরেই বাৎসল্য প্রেমের নানান ভাস্কর্যমণ্ডিত পশুপতিনাথ মন্দির। মন্দিরের চুড়োটি তৈরি হয়েছে দেড় মণ সোনায়। আর আছে জলসেন ঘাট।

মণিকর্ণিকা ঘাট

খুবই পবিত্র আর মাহাত্ম্যে দশাশ্বমেধের পরেই মণিকর্ণিকা ঘাটের (১৭৩০ শতকে) স্থান। প্রবাদ আছে, শিব-জায়া পার্বতীর কুণ্ডল পড়ে এখানে। খুঁজে পেতে মাটি খোঁড়ায় রূপ নেয় কুণ্ড আর ক্লান্ত শিবঠাকুরের ঘামই হয় কুণ্ডের জল। দ্বিমতে, গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের আগে স্বয়ং বিষ্ণু কুণ্ড খোঁড়েন শবদাহের জল পেতে। আর আছে কূপ ও ঘাটের মাঝে চন্দ্র পাদুকা–পাথর ফলকে বিষ্ণু পদচিহ্ন। ঘাটে গণেশ মন্দিরও হয়েছে।

মহাশ্মশান রূপেও কাশীর অন্যতম এই মণিকর্ণিকা। শবদাহের ব্যস্ততা লেগে থাকে দিনরাত জুড়ে মণিকর্ণিকায়।

দত্তাত্রেয় ঘাটটিও যথেষ্ট পবিত্র, সাধকের পায়ের ছাপ রয়েছে মন্দিরে। বিরাটাকার সিন্ধি ঘাটটি ১৮৩০ শতকে বৈজাবাঈ সিন্ধিয়ার তৈরি। তবে, উত্তরকালে ভেঙ্গে যেতে সংস্কার হয়েছে ১৯৩৭ শতকে। বয়সের ভারে গঙ্গার জলে ঝোঁকা শিব মন্দিরও রয়েছে। ঘাটের শিরে সিধা ক্ষেত্র-ভক্তের মনস্কামনা পূরণে অনেক দেবতাও রয়েছেন। জয়পুর মহারাজার তৈরি রাম ঘাট, উদয়পুরের রানার তৈরি রানা ঘাট, আরেক পবিত্র পঞ্চগঙ্গা ঘাট-অতীত কালে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, তৃণা, দুর্গা এই নদীর মিলন ঘটে এখানে। ঘাটের শিরে ১৭ শতকে বেণীমাধব রাও সিন্ধিয়ার তৈরি বিষ্ণু মন্দির ধ্বংস করে হিন্দু ও মোগলী শৈলীতে আলমগীর মসজিদ গড়েন আওরঙ্গজেব। মসজিদের আজান মিনার থেকে বারাণসী দেখে নেওয়া যায়। গাই ঘাট অর্থাৎ পাথরে মূর্তি হয়েছে গরুড়, ত্রিলোচন ঘাট, রাজ ঘাট ছাড়াও ঘাট রয়েছে আরও নানান-স্ব-স্ব মাহাত্ম্যে অনন্য এরা। ত্রিলোচন ঘাটের শিরে শিবের ত্রিলোচন লিঙ্গমূর্তি। তেমনিই আদি কেশব ঘাটে বিষ্ণুর প্রথম পদার্পণ ঘটে। তবে, মাহাত্ম্যে ও পবিত্রতায় দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা, কেদার ও অসি ঘাট আজও বরেণ্য। স্নানে পুণ্য হয়। এমনকি পিণ্ডদানের প্রথাও আছে বারাণসীর এই পঞ্চতীর্থ যাত্রায় অর্থাৎ পাঁচ ঘাটে।

গোধূলি বেলায় চলুন গোধূলিয়ায়-প্রদীপ দিন মা গঙ্গাকে। নৌকাবিহারেরও ব্যবস্থা আছে কাশীর গঙ্গায়। সাঁঝ-সকালে নৌকাবিহার খুবই মনোহর। উচিতও হবে প্রত্যুষে শ'-দেড়েক টাকার চুক্তিতে এক ঘন্টার সফরে নৌকাবিহার করে ঘাট তথা কাশী শহর দেখে নেওয়া। তবে ঘাটের ছবি তোলা নিষেধ। শবদাহের ছবি নৈব নৈব চ।

কাশীর গঙ্গায় রাজা হরিশ্চন্দ্র ঘাট থেকে শুরু মণিকর্ণিকা পর্যন্ত মোট ৩৬৫টি ঘাট রয়েছে। যথাক্রমে-প্রয়াগ ঘাট, শীতলা ঘাট, অহল্যাবাঈ ঘাট, দ্বারভাঙ্গা ঘাট, রানামহল ঘাট, ধোবি ঘাট, চৌষট ঘাট, দিগপতিয়া ঘাট, পাড়ে ঘাট, রাজঘাট, নারদ ঘাট, মান সরোবর ঘাট, কেদার ঘাট, সোমেশ্বর ঘাট, চৌকি ঘাট, লালী ঘাট, হনুমান ঘাট, শিবালা বা কালী ঘাট, আনন্দময়ী ঘাট, তুলসী ঘাট, বেচারাজ ঘাট, জানকী ঘাট, অসি ঘাট, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাট, মানমন্দির ঘাট, মির ঘাট, জলসেন ঘাট, ললিতা ঘাট, সিন্ধিয়া ঘাট, রাম ঘাট, পঞ্চগঙ্গা ঘাট ইত্যাদি। তার মধ্যে দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা, কেদার ঘাট ও অসি ঘাট মাহাত্ম্যে ও পবিত্রতায় আজও বরেণ্য। পিণ্ডদানের প্রথাও আছে বারাণসীর এই পঞ্চতীর্থ যাত্রা অর্থাৎ পাঁচ ঘাটের।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান কাশী। কালে কালে বহু মুনি-ঋষি, দার্শনিকরা কাশী এসেছেন জ্ঞান আহরণের জন্য। কেউবা এসেছেন শিষ্যের খোঁজে, কেউবা তাদের সমাজসংস্কারক, কেউবা ধর্মগুরুর খোঁজে। তাদের মধ্যে বুদ্ধ, শংকরাচার্য, রামানুজ, কবির, নানক, তুলসীদাস, চৈতন্য মহাপ্রভু, ত্রৈলঙ্গস্বামী অন্যতম।

কাশী ভ্রমণে গঙ্গার পূর্বপাড়ে রামনগরে ১৭ শতকের কাশীর রাজবাড়িটি দ্রষ্টব্য। রাজবাড়ির রাজকীয় গেটে প্রহরী দাঁড়িয়ে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ১০-১২টি কামান। রাজবাড়ি তথা অস্ত্রাগার ও প্রাচীন সংগ্রহশালা দেখার জন্য ৭ টাকার টিকিট লাগে। অস্ত্রের সংগ্রহও উল্লেখ্য। ১৮৭২ শতকে তৈরি ঘড়িটিও অভিনব। ঘড়িতে চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থান, দিন-ক্ষণ-সময় সবই নির্ভুল মেলে আজও। আর রয়েছে রাজপরিবারের রুপোর পালকি। হাওদা, হাতির দাঁতের মাদুর, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও নানান সম্ভার মিউজিয়ামের অলঙ্কার হয়ে রয়েছে। বাসও করেন রাজপরিবার প্রাসাদ অংশে।

প্রাসাদের পিছে গঙ্গা, কিনারে রাজা জৈৎ সিং নির্মিত দুর্গামন্দিরটিও দেখার মতো। সারি সারি প্যানেলে নানান মূর্তি, কোনো প্যানেল জীবজন্তুর, কোনোটা বা দেবদেবীর। মন্দিরে রাজপরিবারের আরাধ্য দেবী চতুর্ভুজা দুর্গার পূজা হয়। ১৮৩০ শতকে শুরু হয়ে প্রতি বছর আশ্বিন মাসে এক মাসব্যাপী রামলীলা জাঁকালো উৎসব চলে এখানে।

কাশী রামনগর পথে পড়ে ব্যাসকাশী। আর রাজবাড়ির পেছনে গঙ্গার পাড়ে ব্যাসদেবের মন্দিরে অষ্টধাতুর তিন মূর্তি-মাঝে ব্যাসদেব, দুপাশে শুকদেব ও বিশ্বনাথ। মন্দিরে ২৫০ বছরের প্রাচীন ব্যাসদেবের একটি (কল্পিত) তৈলচিত্রও আছে।

কাশীতে আরো দর্শনীয়

সংকটমোচন মন্দির, হুণ্ডিরাজ গণেশ মন্দির, বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত নির্মিত ভারতমাতা মন্দির, কালভৈরব মন্দির, বিশালাক্ষী মন্দির, বিখ্যাত মান মন্দির, সংকটা দেবীর মন্দির।

শ্রীরামের জন্মভূমি অযোধ্যা

অযোধ্যা মথুরা কাশী, কাঞ্চীহ্যবন্তিকা তথা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতাঃ মোক্ষদায়িকাঃ।

শ্রীরামের জন্মভূমি অযোধ্যা। রামচন্দ্রের পিতা সূর্য-বংশীয় (ইক্ষাকু/রঘুবংশীয়) রাজা দশরথ রাজত্ব করেন মনুর সৃষ্টি অযোধ্যায়। ত্রেতা যুগের বিষ্ণুর ৭ম অবতাররূপী রামচন্দ্রের জন্মও এই অযোধ্যায়। ঘাঘরা অর্থাৎ সরযু নদীর দক্ষিণ তীরে সপ্ততীর্থের (মথুরা, হরিদ্বার, বারাণসী, অযোধ্যা, উজ্জয়িন, দ্বারকা, কাঞ্চী) অন্যতম পুণ্য হিন্দু তীর্থ তথা মোক্ষপুরী অযোধ্যা। ৪৮×৮ ক্রোশ ব্যাপ্ত অযোধ্যা নগরীর অতীত গরিমা লোপ পায় বংশ লুপ্ত হতে। গুপ্তকালে (২০০ থেকে ৪০০ খ্রি.) বিক্রমাদিত্য অতীত পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেও সবই লীন হয় কালের প্রভাবে। উত্তরকালে (১৭-১৯ শতক) অযোধ্যার নবাবেরাও ইতিহাসখ্যাত। ১৮ শতকের গোড়ায় Nawab Saadat Khan Burhan-ul-Mulk -এর হাতে বংশের পত্তন। আর পরে নামান্তর ঘটে অযোধ্যা হয় আয়ুধ (Auadh)। তবুও অনেক মন্দির অযোধ্যার পথেঘাটে।

বাসস্ট্যান্ড থেকে দেড় কি.মি. দূরে সরযু নদী ৪-৫ কি.মি. পরিসরে ৭ হাজার মন্দির অযোধ্যায়। অর্ধ কি.মি. দূরে বামহাতি গলিপথে অযোধ্যা প্রহরী হনুদের গড়া গড় অর্থাৎ

দুর্গ হনুমানগড়ি। বিশাল চত্বর জুড়ে দুর্গরূপী মন্দিরে দেবতা রাম-সীতা। আর আছে সিন্দুরে চর্চিত হনুমানের বিশাল মূর্তি। রুপোর পাতে মোড়া দরজা। অল্প কিছুদূর যেতে রাম কচহরী অর্থাৎ শ্রীরামের কাছারী-বিগ্রহ হয়েছে রাম-সীতা-ভরতের। ভরত মিলাপও বলে থাকে একে। জনশ্রুতি আছে, লঙ্কা বিজয়ের পর এখানেই প্রথম দর্শন ঘটে ভরতের সঙ্গে শ্রীরামের। অদূরে টিকম গড়ের রাজার গড়া কনক ভবন বা সোনে কা ঘরে, সোনার দেবতা রাম-সীতা। বর্ণাঢ্য এই মন্দিরে দেবতা রয়েছেন আরও নানান। বাল্মিকী আশ্রমে রামচরিত মানস, পাশেই সুমিত্রা ভবন, রাজগদ্দি অর্থাৎ শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক স্থল, দশরথজী কা মহল-ইচ্ছা ভবন, দশরথজী রাজগদ্দি নিত্যযাত্রা মন্দির, স্বর্গদ্বার অর্থাৎ শ্রীরামের শেষকৃত্য স্থল, লক্ষ্মণ ঘাট, সীতা ঘাট, দাঁতন করতে যাওয়া পুকুর রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের দাঁতন ক্ষেত্র, সীতাদেবীর রসুইখানা, কৈকেয়ী ভবন, ত্রেতাকে ঠাকুর, আমাওয়ান মন্দির, জৈন মন্দির, ব্রহ্মকুণ্ড, ২ কি.মি. দক্ষিণে বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত মণি পর্বত, কুবের পর্বত, সুগ্রীব পর্বত, হনুমান গদী, রাজা দশরথের রাজবাড়ি, বাল্মিকী রামায়ণ মন্দির, রামবল্লভ মন্দির, জানকীবল্লভ মন্দির, কুশ প্রতিষ্ঠিত নাগেশ্বরনাথ শিবমন্দির পর্যটক ও তীর্থযাত্রী দুয়েরই কাছে আদরণীয়।
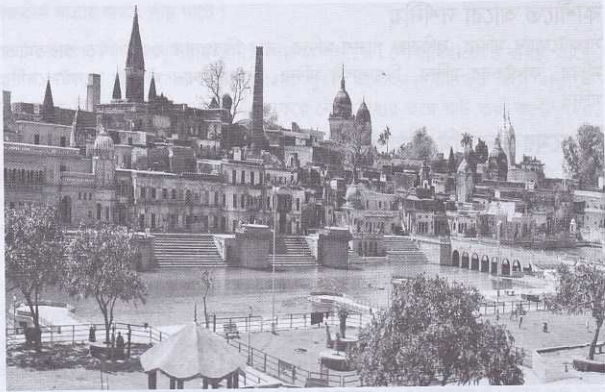
১৯৭৮ শতকে গঠিত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডির অতীত সন্ধানের গবেষণা আজও চলছে। রাম জন্মভূমির সঠিক বৃত্তান্ত না মিললেও খ্রি.পূ. ৭ শতক বা তারও অতীত থেকে খ্রিষ্টাব্দ ৪ শতকের নানান নিদর্শন মিলেছে। হনুমানগড়ির পিছে কিংবদন্তিতে ঘেরা রাম জন্মস্থান আকর্ষণে আজ অদ্বিতীয়। অতীতের মূল মন্দির ধ্বংস পেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ৮৪টি থামসহ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। জন্মভূমিতে শ্রীরামের ছোট্ট মন্দির। সঙ্কীর্ণ গলিপথে পুলিশের

বেড়াজাল ডিঙিয়ে দর্শন। ৫০ মি. দূরত্বে জন্মস্থান। ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে সংবাদের শিরোনামও হয়েছে পুণ্যভূমি অযোধ্যা। রামমন্দির ও বাবরি মসজিদ বিতর্কে সারা বিশ্ব আজও উদ্বেলিত। রাজনীতি পরিবেশকে যেন আরও কলুষিত করে তুলেছে। কিংবদন্তি আছে, শ্রীরামের জন্মস্থানে লঙ্কা থেকে আনা ১৪টি কষ্টিপাথরের থামের উপর গড়া মন্দির ভেঙ্গে ১৫২৮ শতকে বাবরের ফরমান বলে গড়ে উঠে বাবরি মসজিদ। মসজিদটি রুদ্ধ, অলিন্দে (জন্মস্থান) পূজা হতো রাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবীর। নতুন করে প্রস্তুতি নেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৫০ কোটি টাকায় শ্রীরামের নবরূপে রামমন্দির গড়ার।

১৯৮৯ শতকে ৯ই নভেম্বর মসজিদের মুখোমুখি ২৭০ মি. দূরত্বে শিলান্যাসও সম্পন্ন হয়েছে রাম মন্দিরের। মন্দির গড়তে ক্ষতির আশঙ্কায় আদালতের দ্বারস্থ হয় বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি। নানা ঘটনার ঘনঘটায় অবশেষে ১৯৯০ শতকের ৩০শে অক্টোবর করসেবায় মন্দির গড়তে অংশ নেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ভারত জুড়ে শ্রীরাম রথযাত্রার ঐতিহাসিক মিছিলের গতিরোধ হয় বিহার রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণে। সরকার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আলোড়ন ওঠে ভারত রাষ্ট্রের সংসদ ভবনে। পতন ঘটে ভি পি সিং-এর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের। সাময়িকভাবে স্তিমিত হলেও গবেষণা চলছে আজও শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে মন্দির-মসজিদ বিতর্কের সমাধান খুঁজে পেতে। তবে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ শতকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করসেবকদের করে ধূলিসাৎ হয়েছে মন্দির-মসজিদের অতীত সৌধ। পরিণতি রূপে রক্তস্নাত হয় সারা বিশ্ব। প্রস্তাব উঠেছে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে নতুন করে মন্দির ও মসজিদ গড়ার। ৬৭ একর জমি অধিগৃহীত হয়েছে বিতর্ক এড়িয়ে মন্দির ও মসজিদ গড়ার জন্য। বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমির দখল নিয়ে ২০১০ শতকের এলাহাবাদ কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সব পক্ষই আজ দ্বারস্থ হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের। আর হয়েছে রাম-কি-পাউরি সরযুতে-যেখানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় শ্রীরামের। স্নানেও পুণ্যি মেলে সরযুর জলে। এরই দক্ষিণ-পশ্চিমে লক্ষ্মণ ঘাটে স্নান করতেন লক্ষ্মণ। আর আছে অজস্র লালমুখো হনুমান সারা অযোধ্যায়। তবে রোষ নেই যাত্রীর প্রতি এদের। আবার বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থরূপেও সমধিক খ্যাত অযোধ্যায়। কথিত আছে, ১৪টি গ্রীষ্ম কাটান বুদ্ধ অযোধ্যায়। ১ম ও ৪র্থ জৈন তীর্থঙ্করের জন্মও কাটান এই অযোধ্যা নগরীতে।

আরো দর্শনীয় স্থানসমূহ: হনুমান গদী, রাজা দশরথের রাজবাড়ি, কনক ভবন, বাল্মিকী রামায়ণ মন্দির, রামবল্লভ মন্দির, জানকীবল্লভ মন্দির।

নৈমিষারণ্য

দেবী ভাগবতে বর্ণিত কলি থেকে অব্যাহতি পেতে ষাট সহস্র মুনি-ঋষি ব্রহ্মার ছোঁড়া চক্রনেমির ভূমিস্পর্শ ক্ষেত্র উৎপলারণ্যে এসে বসতি গড়েন। নামও হয় নেমি থেকে নৈমিষারণ্য। তবে, নিমষারও বলে থাকে লোকে একে। চক্রতীর্থ সরোবরটিও নেমির ভূমিস্পর্শ স্থলে হয়েছে। বামণপুরাণে আছে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ এই নৈমিষারণ্য। দ্বিমতে—পুরাণ বলে, গৌরমুখ মুনি নিমেষে অসুর ভস্মীভূত করেন, সেই থেকে নৈমিষারণ্য নাম। গোমতীর জলে স্নানে পুণ্য হয়। সরোবরকে ঘিরে অসংখ্য মন্দির রয়েছে এখানে।

একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম ললিতাদেবীর মন্দির রয়েছে। জনশ্রুতি আছে, দেবতা ও অসুরদের সংগ্রামকালে দেবতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আদ্যশক্তি মহামায়ার ললিতারূপে আবির্ভাব। চক্রতীর্থের দক্ষিণ-পশ্চিমে গোমতী নদীর তটে টিলার টঙ্গে বিরাট রাজার কেল্লাটির ধ্বংসাবশেষও অতীত রোমন্থন করায়। বনবাসকালে পাণ্ডব গুহায়

পাণ্ডবরাও বেশ কিছুকাল বাস করেন। মূর্তিও হয়েছে শ্রীকৃষ্ণসহ পঞ্চপাণ্ডবের। কেল্লা পেরিয়ে উপরে উঠতে হনুমান গদীতে পবনদেবতা হনু। হনুর দুই কাঁধে রাম ও লক্ষ্মণ। বিশাল মূর্তির কটিদেশ থেকে দৃশ্যমান হলেও পদযুগল পাতালস্পর্শী কূপের মধ্যে। জনশ্রুতি আছে, পাণ্ডবদের তৈরি কূপ এটি। ব্যাসদেবও কিছুকাল বসবাস করেন, মহাভারতও রচনা করেন ব্যাসগদীতে। শিষ্য-সুমন্থপৈল, জৈমিনী ও বৈশাম্পনকে বেদ পাঠ দেন ব্যাসদেব। এছাড়াও ১০০০ শিবলিঙ্গের নাটমন্দির, আনন্দময়ী আশ্রম, চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত পরমহংস মঠ, সরস্বতী আশ্রম, পুরাণ মন্দির, দ্রাবিড়ীয় কৃষ্টিতে সৃষ্ট বালাজী মন্দির, শুকগদ্দি। পুলস্ত্যও বলেছেন, বিশ্বের সব তীর্থের সমাহার ঘটেছে নৈমিষারণ্যে। তেমনই ৯ কি.মি. দূরের মিশ্রিত তীর্থে আছে সব দেবতাদের কমণ্ডলু থেকে সব তীর্থ মিশ্রিত সলিলে সৃষ্ট দধীচি কুণ্ড তথা চতুষ্কোণ সরোবর। কালে কালে মিশ্রিতই হয়ে থাকবে। প্রবাদ আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে মহর্ষি দধীচি কুণ্ডের জলে স্নান করে দেহত্যাগ করে ইন্দ্রকে নিজ অস্থি দেন বজ্র গড়ে বৃত্রাসুরকে বধ করতে। দধীচি মন্দির ছাড়াও মন্দির হয়েছে অনেক কুণ্ডকে ঘিরে মিশ্রিত তথা মিশ্রক তীর্থ।

বড় হনুমান মন্দির/হনুমানের পাতাল বিজয়

সঙ্গমের কাছে এই অভিনব মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় পবনপুত্র হনুমানের বেশ বড় আকারে শায়িত মূর্তি। এখানে বছরে একবার হলেও সঙ্গমের জল ফুলে উঠে পবনপুত্রের চরণ ধুয়ে দেয়।

মথুরার উৎপত্তি

পুরাণ বলে, লবণসুরকে বধ করে বিষ্ণু ষষ্ঠ অবতার রামের অনুজ মধুরার শত্রুঘ্ন পত্তন করেন। যাদব রাজধানী মধুরাপুরী রূপান্তরিত হয়েছে মতুরামণ্ডল—কালে কালে মথুরা।

তবে, কুষাণদেরও রাজধানী ছিল ১ম ও ২য় শতকে। ২য় ও ৩য় শতকে বৌদ্ধ কেন্দ্ররূপেও এর প্রসিদ্ধির কথা তোলেমি ও হিউয়েন সাং (৬৩৪ খ্রি.)-এর লেখায় পাওয়া যায়। ২০টি বৌদ্ধ মনাষ্ট্রিতে হাজার তিনেক বাস ছিল সেকালে, স্বয়ং বুদ্ধও মনাষ্ট্রি গড়েন খ্রি.পূ. কালে। তেমনই ১৯তম ও ২১তম জৈন তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও নেমিনাথের জন্ম ও কর্ম এই মথুরায়। তাই জৈনতীর্থ রূপের ও মথুরার প্রসিদ্ধি ছিল অতীতে। কিংবদন্তির সিল্করুটে অবস্থানহেতু বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতিতেও যথেষ্ট রমরমা ছিল মথুরা। ১০১৭ শতকে গজনীর সুলতান মাহমুদ লণ্ঠন দ্বারা জ্বালিয়ে দেয় মথুরা নগরী। ধ্বংস পায় হিন্দু ও বৌদ্ধ অতীত। ১০০ উটের পিঠে সোনা, রুপো মানিক্য গড়া ১০০ দেব-দেবীর বিগ্রহ গজনী যায় মাহমুদের সঙ্গে। আবার ধ্বংস সিকান্দার লোদির হাতে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে। তবে, সংস্কারে এগিয়ে আসেন মোঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর। আর ১৬৬০ শতকে আওরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলার শিকার হয় ব্রজভূমি মথুরা। মোঘল অবলুপ্তিতে জাঠ ও মারাঠারাও জড়িয়ে পড়ে সংগ্রামে। সবশেষে ১৮০৩ শতকে মথুরা যায় ব্রিটিশ দখলে। দখলের সাথে সাথে ক্যান্টনমেন্ট গড়ে ব্রিটিশ।

সূর্যকন্যা যমের বোন যমুনার পশ্চিম কিনারে ভারতের অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থ মথুরা। এই পশ্চিমেই বৃন্দাবন, গোবর্ধন, কুসুম সরোবর, বর্ষাণার, নন্দগাঁও আর যমুনার পূর্বে গোকুল মহাবন বলদেও। কারুকার্যময় হোলি গেটে শহরে প্রবেশ। সপ্ততীর্থের অন্যতম নগরীতে খ্রিষ্টজন্মের ১৫শ বছরের আগে দ্বাপর যুগে মথুরার অত্যাচারী রাজা তথা ভাই কংসের কারাগারে দেবকী ও বসুদেবের বন্দিবাসকালে অষ্টম সন্তানরূপে বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। সোনার ইটের বেদীতে চতুর্ভুজ দেবতা বা পাশে দেবী রুক্মিণী। দ্বিমতে, ২০০ মি. দূরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পোতারা কুণ্ডের কাছে। কংসের হাত থেকে নবজাতককে বাঁচাতে জন্মমুহুর্তেই কারাগার থেকে ব্রজপুরী গোকুলে স্থানান্তরিত হয় পালক পিতা নন্দ-যশোদার গৃহে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর কাটে মথুরায়। সেই স্মৃতিকে ঘিরে সহস্রাধিক মন্দির হয়েছে মথুরায়। এর মধ্যে কেন্দ্র মণি কেশবদেব মন্দিরটি অন্যতম। কুষানকালে বুদ্ধিষ্ট মনাষ্ট্রির ধ্বংসস্তুপের উপর উত্তরকালে জয়পুরের রাজা মান সিং-এর গড়া কংস কেল্লায় (শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি) শাক্য রাজারা প্রথম কৃষ্ণমন্দির গড়েন। দ্বিতীয়টি গড়েন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ১০১৭ শতকে, গজনীর সুলতান মাহমুদ সেটি ধ্বংস করে। ১২৫০ শতকে মহারাজ বিজয় পালের গড়া তৃতীয় মন্দিরটি ধ্বংস পায় সিকান্দার লোদীর হাতে। ১৬১৩ শতকে জাহাঙ্গীরের কালে ওর্চার রাজা বীর সিং দে-এর গড়া প্রাচীরে বেষ্টিত চতুর্থ মন্দিরটি ১৬৬১ শতকে ধ্বংস করে আওরঙ্গজেব। ধ্বংসস্তুপে (শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি) মকবারা অর্থাৎ লাল বেলেপাথরের ঈদগাহ মসজিদে গড়ে আওরঙ্গজেবের গভর্নর Abd-un-Nadi চারটি আযান মিনার। ফ্যাসাডের উপরে বহুবর্ণ এনামেল টালিতে আল্লাহর নাম (৯৯) খোদিত ছিল অতীতে। এবার মন্দির গড়েন গুজরাটি ব্যবসায়ী গোকুল দাস পারেল ১৮৭১ শতকে। তবে ১৯৮২ শতকে অতীতের মকবারকে অক্ষুণ্ণ রেখে জন্মভূমে সামনে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশালাকার ভাগবত ভবন তথা গীতা মন্দির নির্মাণ করেন। কারুকার্যময় মন্দিরের

আকার যেমন বিশাল তেমনই বৈভবে ভরা। সিলিং ও দেওয়ালে ভাগবত গীতা আখ্যান মূর্ত হয়েছে। পূজাও পাচ্ছেন অনেক দেবতা মন্দিরময়। ১১.২৫ কেজি পারদের লিঙ্গমূর্তি রয়েছে।

যমুনার উত্তর সীমানায় কংস কেল্লাটি সংস্কার করেন অম্বরের রাজা মান সিং, আরও পরে আকবর। তবে, অতীতকালের দুর্গ আজ টিলায় রূপ নিয়েছে। জয়পুর রাজ জয় সিং (দ্বিতীয়)-এর তৈরি যন্তর-মন্তরটিও ধ্বংস হয়েছে। মথুরার আরেক অতীত তার কুণ্ড। অতীতের ১৫৯টির মধ্যে ৪টি-শিব তাল, পাটোরা, বলভদ্র ও সরস্বতী কুণ্ড আজও অতীত রোমন্থন করায়। শৈব তীর্থ রূপেও শহরের পশ্চিমে ভূতেশ্বর, পুবে পিলেশ্বর, উত্তরে গোকর্ণেশ্বর, দক্ষিণে রঙ্গেশ্বর মহাদেব ছাড়াও অনেক মন্দির রয়েছে এখানে। সদর বাজারের কাছে যমুনা বাগে ছত্তিশ দুটিও দেখে নেওয়া যায় চলতে ফিরতে। এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসেন ১৫১৫ শতকে।

মথুরার রাসলীলারও প্রশস্তি আছে তীর্থযাত্রী তথা পর্যটক মহলে। মথুরার পাণ্ডাদেরও যথেষ্ট খ্যাতি যাত্রী উৎপীড়নে। তবে রাবড়ি, দই, প্যাড়া, খাজা ও পিঠার স্বাদ নেওয়া একান্তই উচিত হবে মথুরার দোকানপাটে। শিল্পনগরী রূপেও সমধিক খ্যাত মথুরা আজ।

মথুরার মাহাত্ম্য

সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, বজ্রপাত ভয়ে পর্বত যেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, গরুড় দর্শনে সর্পকুল ও পবন তাড়িত মেঘ যেরূপ অদৃশ্য হয়, তদ্রুপ তত্ত্বজ্ঞান হলে যেরূপ দুঃখ নাশ পায় এবং সিংহ দেখে মৃগগণ যেরূপ নষ্ট হয়, তদ্রুপ শ্রীমথুরা দর্শনে ক্ষণকালে পাপসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। মথুরামণ্ডল বিংশতি যোজন বিস্তৃত। এই মণ্ডল মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। হে দেবী, মথুরাধামে পুণ্যস্থানাদিতে গৃহে চত্বরে (চবুতারায়) পথে যে কোনো স্থানে মৃতব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করে, অন্যথা হয় না। বহু জন্মব্যাপী অন্যত্র সঞ্চিত পাপসকল মথুরায় নিবৃত্ত হয়ে যায়। আর মথুরাতে উৎপন্ন পাপ ক্ষণমাত্র কালে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মথুরার কথা বললে হরিনামের জপের ফল, কিছু শ্রবণ করলে কৃষ্ণনাম শ্রবণের ফল, কিছু স্পর্শ করলে শ্রেষ্ঠ জল স্পর্শ ফল, কিছু আঘ্রাণ করলে তুলসী আঘ্রাণের ফল লাভ হয়। যা কিছু দর্শনে হরিদর্শনের ফল এবং গমনে পদে পদে তীর্থযাত্রা ফল হয়ে থাকে। হে রাজন! তুমি শ্রবণ কর কোটি জন্মব্যাপী রাজহন্তা, জাতিঘাতী ও ত্রৈলোক্য হত্যাকারী নরও মথুরাবাস প্রভাবে যোগেশ্বরগণের গতি লাভ করে থাকে।

মথুরায় অবস্থিত টিলাসমূহ

ধ্রুবটিলা, ঋষিটিলা, কলিটিলা, বলিটিলা, রজকবধটিলা, কংসটিলা, অম্বরীশ টিলা, হনুমানটিলা, গতশ্রমটিলা।

মথুরায় চারটি দরজা– হলি, ভরতপুর, ডীগ, বৃন্দাবন। মহাদেব– শ্রীভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, পিপলেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, গলতেশ্বর, কালিন্দ্রীশ্বর, সোমেশ্বর, রামেশ্বর, বীরভদ্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি ও নক্ষত্র

বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান- মথুরা, পিতা–শ্রীবসুদেব মহারাজ। মাতা- শ্রীমতী দেবকী, মাস-ভাদ্রমাস, পক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ, তিথি-অষ্টমী, দিন-বুধবার, সময়-রাত্র দ্বিতীয় প্রহর (মধ্যরাত্র), নক্ষত্র-রোহিণী,

প্রকৃতি-আকাশখানি বিজলী-গাজ্জর্ন এবং মেঘযুক্ত। নদ-নদী, সরোবর শৈল, সিন্ধু সমস্তই তখন সুশীতল, স্নিগ্ধ বাতাস বইতেছিল ইত্যাদি। যোগপীঠে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর, বসন-পীতাম্বর, গঠন-ইন্দ্রনীলমণি, বয়স- ১৫/৯/৭, পদ্মদলের মধ্যস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, চতুর্দিকে অষ্টসখী ও মঞ্জরীগণ পরিবেষ্টিত, কুঞ্জ- শ্রীগোবিন্দানন্দকুঞ্জ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান/কংসের কারাগার

মথুরা পৃথিবীর মধ্যে ধন্য, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোক থেকে ভূলোকে লীলা করবার জন্য এই স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বাপর যুগ হতে বর্তমানও এই জায়গাটি দর্শনীয়। মন্দিরে গমন করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে শান্তি ও প্রেমের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির ভেতরে এক বিশাল শ্রীমদ্ভাগবত ভবন বিরাজিত। দর্শনীয় বিগ্রহাদি– শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবী, শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীমন্মহাপ্রভুবিগ্রহ, শ্রীহনুমানজী, শ্রীকেশবজী, শ্রীশিবলিঙ্গ, মা দুর্গা, কংসের কারাগার এবং যে স্থানে ছয় পুত্রকে বধ করা হয়েছিল সে স্থান।

বিড়লা মন্দির দর্শন

মথুরা বৃন্দাবন পথে ৫ কি.মি. যেতে বিড়লা মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির বিড়লা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রাম-সীতা এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এটি গীতা মন্দির নামেও খ্যাত। এক স্তম্ভের উপর সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতা লিখিত আছে। মন্দিরের স্থাপত্য ও শিল্পকলা অতীব সুন্দর।

নন্দগ্রাম

গিড়োহ হতে দুই মাইল অগ্নিকোণে এবং লহরবাড়ী হতে ৪ কি.মি. পূর্বভাগে নন্দগ্রাম অবস্থিত। শ্রীনন্দমহারাজ মহাবনে গোকুলে অবস্থানকালে কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য অনেক অসুরকে প্রেরণ করেছিলেন এখানে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এসে সকলেই নিহত হয়েছিলেন। সেই অসুরদের ভয়ে বাৎসল্যভাবে শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করবার জন্য মহাবন হতে এই স্থানে চলে আসেন। শ্রীনন্দমহারাজ এই স্থানে বসবাস করবার জন্য এই গ্রামের নাম হয়েছে নন্দগ্রাম।

নন্দীশ্বর পর্বতে নন্দমহারাজের মন্দির

নন্দবাবার বাসভবন এই নন্দীশ্বর পর্বতের উপরে অবস্থিত ছিল। নন্দীশ্বর পর্বতের চতুর্দিকে প্রায় দেড় কি.মি. সীমা নিয়ে বাসভবনটি অবস্থিত ছিল। সেজন্যই এই পর্বতের নাম হয়েছে নন্দীশ্বর। শ্রীনন্দমহারাজের বসবাস ভবনে শ্রীনন্দবাবার মন্দির প্রাচীনকাল হতে বর্তমানেও দর্শনীয়। মন্দিরাভ্যন্তরে মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম, দক্ষিণ পার্শ্বে মাতা যশোদা, তদ্দক্ষিণে শ্রীমতি রাধারাণী এবং ছোট আকারে রোহিণী ও রেবতীদেবী, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাম পার্শ্বে শ্রীনন্দমহারাজ, তাঁর বাম পার্শ্বে মুখসখা ও মনমুখা–দুই সখার বিগ্রহ দর্শনীয়। এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে (শ্যামবর্ণ ত্রিভঙ্গ মুরলী হস্তে) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শন লাভ হয়ে থাকে। দুই বিগ্রহ একই স্বরূপে প্রকাশ।

পাবন সরোবর তীরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটির দর্শন

শ্রীকৃষ্ণ সরোবরের নাম পাবন সরোবর। এর তীরে মনোরম ক্রীড়াকুঞ্জসমূহ বিরাজ করতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল দাসগোস্বামীপাদ 'স্তবাবলী' গ্রন্থে ব্রজবিলাস স্তবের ৫৯ নং শ্লোকে বলেছেন–জলাহরণজলে কমলনয়না ব্রজসুন্দরীগণ প্রীতিভরে বারম্বার যে স্থানে যাতায়াত করত সবিনোদ গোপেন্দ্রনন্দনের নিকট অভিসার ও তাঁর সাথে জলবিহারাদি করে থাকেন, মধুপঝঙ্কারে মুখরিত কদম্বতরুসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই পাবন সরোবর আমায় রক্ষা করুন। এই সরোবরের তটে বহু কুঞ্জ, কদম্বের বৃক্ষ, ফুলের বাগান, ভ্রমর-ভ্রমরী ইত্যাদি বিরাজিত। বর্তমানে সরোবরের উত্তর তটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান ও শ্রীবল্লভাচার্যের বৈঠক দর্শনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজধাম ভ্রমণকালে এই স্থানে আগমন করে উপবেশন করেছিলেন, সেই স্মৃতিচিহ্ন স্মরণ রাখবার জন্য এই স্থানে অদ্যাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈঠক দর্শন লাভ হয়ে থাকে। কুণ্ডের পূর্ব তীরে শ্রীবিহারীলাল জিউর মন্দির, দক্ষিণ তীরে শ্রীহরিদাস সদন এবং শ্রীল সনাতনগোস্বামী পাদের ভজন কুটির দর্শনীয়। গোস্বামীপাদ নন্দগ্রামে অবস্থানকালে এই স্থানে বসে ভজন করেছিলেন। সেই ভজন কুটির অদ্যাবধি দর্শনীয়।

বর্ষণা

গোবর্ধন পর্বত হতে ২১ কি.মি. দূরে বর্ষণা গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমতি রাধারাণীর পিতা শ্রীবৃষভানু মহারাজ শ্রীনন্দমহারাজকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শ্রীনন্দমহারাজ গোকুল গ্রামে অবস্থানকালে শ্রীবৃষভানুমহারাজ রাভেল গ্রামে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু শ্রীনন্দমহারাজ

বাৎসল্য প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করবার জন্য গোকুল হতে যমুনা নদী অতিক্রম করে নন্দগ্রামে বসবাস করতে থাকলে সেই সময় শ্রীবৃষভানু মহারাজও শ্রীমতি রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে রাভেল গ্রাম হতে যমুনা নদী অতিক্রম হয়ে এই পর্বতের উপর বসতি স্থাপন করেন। সেই পর্বতের নাম (মহারাজের নামানুসারে) ভানগড় পর্বত, এই পর্বতের দ্বিতীয় নাম ব্রহ্মগিরি পর্বত এবং তিনি এই স্থানে বসবাস করবার জন্য গ্রামের নাম দেন বর্ষণা। এটি শ্রীমতি রাধিকার জন্মভূমি। শ্রীমতি রাধারাণীর অতীব সুন্দর মন্দির দর্শনীয়। ২৫২ সিঁড়ি উঠে টিলার টঙের মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ। সিঁড়িগুলো পাথর দিয়ে বাঁধানো। পাহাড়ের চারদিক ব্রহ্মার চতুর্মুখের প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার নন্দগ্রামে সখাগণের সাথে কুমার বয়সে বিভিন্ন প্রকার খেলা খেলেছেন সেই প্রকার শ্রীমতি রাধারাণীও বর্ষণা গ্রামে সখীগণের সঙ্গে কুমারী বয়সে বিভিন্ন প্রকার খেলা করেছিলেন। একটু দূরে প্রেমসরোবর শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম দর্শন স্থল। চারপাশের প্রকৃতিও সুন্দর।

ময়ূরকুঞ্জ

ব্রহ্মগিরি পর্বতের উপর ময়ূরকুঞ্জ অবস্থিত। একদা শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রীমতি রাধারাণী মান করে বসে রইলেন। তখন কৃষ্ণ কিছুতেই মান ভঞ্জন করতে পারলেন না। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর মান ভঙ্গ করবার জন্য এক ময়ূররূপ ধারণ করে রাধারাণীর চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকার ভঙ্গির মাধ্যমে নৃত্য করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মহিমা কিছুই বুঝতে পারলেন না। ময়ূরের নৃত্য দেখে মন থেকে মান চলে গেলে তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপ প্রকাশ করে যুগলরূপে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। দ্বিতীয়ত, কোনো একদিন এই

স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বেষ্টন করে ময়ূর সকল পুচ্ছ-বিস্তার ক্রমে নৃত্য করেছিলেন, সেইজন্য এইস্থানের নাম ময়ূরকুঞ্জ বলে জগতে বিখ্যাত।

মানসরোবর/পোখর হৃদয়

পাণিগ্রাম হতে ২ কি.মি. পূর্বে পোখর হৃদয় বা মানসরোবর অবস্থিত। এই স্থানের অপর নাম শ্রীরাধারাণী এবং মান সরোবর। কিংবদন্তি আছে যে, কোনো কারণ বিশেষে শ্রীমতি রাধারাণী মান বশতঃ এই স্থানে উপবেশন করে অশ্রু বর্ষণ করলে সেই অশ্রুই সরোবররূপে প্রকটিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারাণীকে লক্ষ করে বললেন, হে দেবী এই সরোবর এবং হৃদয় এই স্বরূপ। শ্রীমতি রাধারাণীও বললেন, হ্যাঁ? ইহা আমারও হৃদয়স্বরূপ। এই কুণ্ডে স্নান করলে মানব আমার হৃদয়ে অবশ্যই স্থান পাবে। সেই বার্তালাপের পর হতেই এই সরোবর পোখর হৃদয় নামে পরিচিত হয়েছেন। গ্রামবাসী সকলে এই সরোবরকে এই কারণে রাধারাণী প্রকাশ করেছেন। সরোবরের তীরে শ্রীরাসবেদী, শ্রীমতি রাধারাণীর মন্দির, পদতলে বসে স্তবরত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। পার্শ্বে শ্রীবল্লভাচার্যের, শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীবিঠলনাথ জিউর বৈঠক বিরাজিত।

শ্রীরেবতী রমণ/বলদেব মন্দির

এটি শ্রীবলদেবের বিহার স্থান। এইস্থানে শ্রীবলদেব কেবল স্বইচ্ছায় গোপবালকগণকে নিজরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। সেই জন্য এই গ্রামের নাম বলদেব। গ্রামে প্রসিদ্ধ শ্রীবলদেব মন্দির বিরাজিত। এছাড়াও মহাদেব ও কুণ্ড দর্শনীয়। এইস্থান ব্রজমণ্ডলের যমুনা তটস্থ শেষ সীমান্ত। উত্তর-পূর্বভাগে শ্রীবলদেব যেইভাবে খাম্বী স্থাপন করে ব্রজের সীমা নিরুপণ করেছেন, ঠিক সেইভাবে শ্রীবলদেব জিউ এই স্থানেও শ্রীবলদেব গ্রাম নামের মাধ্যমে ব্রজের দক্ষিণ-পূর্ব সীমা নিরুপণ করেছেন। শ্রীবলদেব জিউর মন্দিরে শ্রীবলরাম ও শ্রীরেবতী রমণ মূর্তি দর্শনীয়।

শ্রীমতি যশোদা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলা/যমলার্জুন বৃক্ষ

কুবেরের দুই পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব। তাঁরা রুদ্রের অনুচর ছিলেন। একদা বিবস্ত্রাবস্থায় জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। নারদমুনি সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাদের অভিশাপ দিলেন যে, "তোমরা বৃক্ষদেহ প্রাপ্ত হয়ে ভূতলে অবস্থান কর।" শতবর্ষ অতীত হলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের মুক্তিপদ লাভ করবে। ঋষির অভিশাপে গোকুলে অর্জুনবৃক্ষ রূপে অবস্থান করতে লাগলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হলে মা যশোদা কৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করলে কৃষ্ণ সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়ে গেলে বৃক্ষ দুটি মাটিতে পতিত হয়। তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষদ্বয় অভ্যন্তর হতে নলকুবের ও মণিগ্রীব বহির্গত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি ও প্রণাম করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তারা মুক্তি লাভ করলেন।

শ্রীমতি রাধারাণীর আবির্ভাবের সময়, তিথি ও নক্ষত্র

স্থান-রাভেল, মাস-ভাদ্র, পক্ষ-শুক্ল, বার-সোমবার, নক্ষত্র-অনুরাধা, সময়-মধ্যাহ্নকাল, পিতা-বৃষভানু মহারাজ, মাতা-শ্রীমতি কীর্তিদাদেবী, ভ্রাতা-শ্রীদাম, ভগিনী-অনঙ্গমঞ্জুরী, প্রকৃতি-আকাশ মেঘাবৃত, মৃদুমন্দ বাতাস, নদ-নদী সকল প্রসন্ন, সেই সময় স্বর্গ হতে

দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। যোগপীঠে শ্রীমতি রাধারাণী নিত্যকিশোরী, বসন-নীল, গঠন-গলিত হেমবর্ণ, বয়স-১৪-২-২৪। চতুর্দিকে পদ্মদলে অষ্টসখী ও মঞ্জুরীগণ পরিবেষ্টিত। কুঞ্জ-শ্রীগোবিন্দানন্দকুঞ্জ।

গোকুল

মথুরা হতে ৭ কি. মি. এবং মহাবন হতে ৩ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে গোকুল গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে বল্লভাচার্যের সন্তানগণ বসবাস করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কেন্দ্রস্থল। দর্শনীয় স্থান- গোপাল ঘাট, বল্লভ ঘাট, গোকুলনাথ জিউর বাগিচা, বাজনা টিলা, সিংহপৌরী, যশোদা ঘাট, শ্রীবিঠলনাথ জিউর মন্দির, শ্রীমদনমোহন মন্দির, শ্রীমাধব রায়ের মন্দির, ব্রহ্ম ছোকরা বৃক্ষ, গোবিন্দ ঘাট, ঠাকুরাণী ঘাট, শ্রীগোকুলচন্দ্রমার মন্দির, শ্রীমথুরানাথ জিউর মন্দির, শ্রীনন্দমহারাজের গাড়ি রাখবার স্থান, শ্রীনবনীত প্রীয়াজি, দাউজি মন্দির, মদনমোহন মন্দির, দ্বারকাধীশ মন্দির, গোপাল লালজি মন্দির, বালকৃষ্ণ মন্দির, রাজাঠাকুর মন্দির, শ্রীনন্দভবন, শ্রীনন্দকিলা, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মাটি খাওয়ার স্থান।

বিশ্রান্তি ঘাট বা তীর্থ

বিশ্রান্তি ঘাটের উত্তরে ১২টি আর দক্ষিণে ১১টি ঘাট আছে। কংসকে বধ করে এই বিশ্রান্তি ঘাটে বিশ্রাম নেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই এই ঘাটের নামকরণ হয়েছে বিশ্রান্তি ঘাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন আগমন কালে সর্বপ্রথম এই স্থানে আগমন করেন ও স্নান ও বিশ্রামাদি করেছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন

বৃন্দা অর্থাৎ তুলসী গাছ। তুলসী গাছই হয়েছে বৃন্দাবন। আর ব্রজ অর্থ গোচারণ ভূমি বা গরুর আবাসস্থল। গোবিন্দের বক্ষ, মুখমণ্ডল গোপীনাথের আর মদনমোহনের শ্রীচরণ দর্শনে গোবিন্দ দর্শনের পূর্ণতা লাভ হয়। ব্রজভূমি ১৮৭ মি. উঁচু বৃন্দাবনে। এমনকি গোবিন্দ জিউর পূজান্তে গোপীনাথ, মদনমোহন ও অন্যান্য দেবতার পূজার বিধি। পুরাণে বর্ণিত আছে, অসুর বিনাশ করে প্রেমে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যদিও মনুষ্যরূপে আবদ্ধ, তবুও তিনি অসীম ও সর্ববিরাজমান। তিনিই সৎ, চিৎ ও আনন্দ অর্থাৎ পরম প্রকৃতি, পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত বৈষ্ণবতীর্থ তথা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল মথুরা, বৃন্দাবন। বাঁশির সুরে মোহিত গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলা এমনকি যমুনায় স্নানরত গোপিনীদের বস্ত্রও হরণ করেন শ্রীকৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে। ৪০০০-এরও অধিক মন্দির হয়েছে কৃষ্ণপ্রেমের গাথা নিয়ে বৃন্দাবনে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে, সত্যযুগের রাজা কেদারের কন্যা কমলার অংশস্বরূপা, তপস্বিনী, যোগশাস্ত্রে বিশারদ বৃন্দার তপস্যাক্ষেত্র নামটিও নাকি বৃন্দা থেকে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন ঢুকতেই বামে ১৫৯০ শতকে কোটি টাকা ব্যয়ে অম্বরাধীশ মান সিং-এর তৈরি সাত তলা লাল বেলেপাথরের গোবিন্দদেবজী পুরানো মন্দির। আকবরও কিছু লাল বেলেপাথর ভ্যাট দেন রেড ফোর্ট থেকে। রাজস্থানি শৈলীতে তৈরি মন্দিরটি কারুকার্যময়, মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলার অনন্য নিদর্শন। গ্রিক ক্রসের আকারে

তৈরি মন্দিরের দেওয়াল ১০ ফুট চওড়া। ধনুকাকৃতি ছাদ হয়েছে ক্যাথেড্রালধর্মী মন্দিরে। মীরাবাঈ বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবজি মন্দিরেই কৃষ্ণকে পান। আওরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলায় চারটি তলা ভাঙ্গতে মূল দেবতা জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। আরও পরে মূর্তি হয়েছে নতুন করে গোবিন্দ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধারানী। তবে মন্দিরটি আজ ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে। এরই পিছনে শ্রীরাধা গোবিন্দ জিউর মন্দিরে দেবতা গোবিন্দ জিউ। বাজারের ডানে সুউচ্চ (৩০ মি.) গোপুর শিরে ১৮৫১ শতকে ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শেঠ গোবিন্দ দাসের তৈরি শ্রীরঙ্গনাথজীর অর্থাৎ অন্তশয়নে দেবতা বিষ্ণু।

দেবী লক্ষ্মী, সৃষ্টির কর্তা ব্রহ্মাও রয়েছেন দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে তৈরি মন্দিরে। বালাজীও এসেছেন মন্দিরে তিরুপতি থেকে মন্দির চত্বরে। প্রতি শুক্রবার দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়। আর আছেন স্বর্ণ, রৌপ্য অলঙ্কারে ভূষিত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। ধ্বজস্তম্ভ অর্থাৎ ১৬ মি. উঁচু সাড়ে ১২ মণ সোনার পাতে মোড়া তাল গাছ, শিসমহল পুতুল নাচ, জলাশয়, মনোরম বাগিচা, মিউজিয়াম আছে মন্দিরে। পৌষ মাসের প্রথম একাদশীতে সাত দিনের জলবিহার উৎসব, মার্চ-এপ্রিলে রথের মেলা বরণীয় উৎসব। আর হয়েছে নবমতম কাত্যায়ণী অর্থাৎ দুর্গা মন্দির বাজার পেরিয়ে রঙ্গনাথের কাছে। রঙ্গনাথের সামনে গলির পথে স্বল্প যেতে ভজন আশ্রম (মীরাবাঈয়ের আশ্রম), ২০০০ অনাথ মহিলা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করছেন সকাল ও সন্ধ্যায় আহার্যের বিনিময়ে। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, বৃন্দাবনে মৃত্যুতে মোক্ষলাভ হয়। কিংবদন্তি আছে, ঘেরা মুক্তোলতায় ছাওয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি নিধিবন। লীলাশেষে আজও নাকি প্রতিরাতে বিশ্রাম নেন যুগলে। স্বামী হরিদাস মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনও পান এখানে। সমাধিও রয়েছে সাধকের। হরিদাস জয়ন্তীতে দূর-দূরান্ত থেকে গায়করা আসেন। আসর বসে গানের মহারাজ স্মরণে। সুন্দর অলংকৃত ইতালিয়ান শ্বেতমর্মরের ১৮৭৬ শতকে তৈরি শাহজী মন্দিরে সোনার ছোট্ট রাধারমণ মূর্তিটিও সুন্দর। ঝুলন ও রাস উৎসবে ঝাড়লণ্ঠনগুলো আলোকিত হয়। ফোয়ারাও চালু হয় উৎসবকালে। আরো যেতে যমুনা বস্ত্রহরণ ঘাট। ঘাট রয়েছে অতীতখ্যাত আরো ৩৮৫টি, বাকিরা আজ জলাভাবে শুষ্ক। যমুনা সরে গেলেও কদমবৃক্ষটি রয়েছে আজও। লাগোয়া কালীয় দমন মন্দির। অল্প যেতে পিতা-মাতাসহ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত হয়েছেন নন্দ ভবনে। আর গোপীনাথ জিউর মন্দিরে শ্রীরাধিকা, সখী ললিতা ও বিশাখা রয়েছেন। মীরাবাঈ মন্দিরে করতাল হাতে সাধিকা মীরাবাঈ, শ্রীজীব গোস্বামীর রাধাদামোদরজী মহারাজ মন্দিরে শ্রীরাধা দামোদর, রাধামাধব, বৃন্দাবন চন্দ্র ছাড়াও নানা মন্দির নানা দেবতা। দশ টাকায় গোবর্ধন শিলায় শ্রীকৃষ্ণের ডান পায়ের ছাপ, গরুর খুর, বাঁশি, লাঠি দেখে নেওয়া যায়। আর আছে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধি রাধাদামোদর চত্বরে।

নিকুঞ্জ বন বা সেবাকুঞ্জে প্রতি রাতে লীলা বসে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের। মন্দির হয়েছে সখী, সখাসহ রাধাকৃষ্ণের। কুঞ্জও আছে- বাঁশি দিয়ে খোঁড়া ললিতাকুঞ্জ। সন্ধ্যার পরে প্রবেশ নিষেধ।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এবং সখাদির চরণচিহ্ন

এই ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এবং সখাদির চরণচিহ্ন সাত স্থানে বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়। যথা- ১. কাম্যবনে (পাহাড়ের উপরে), ২. নন্দগ্রামে (পাহাড়ের উপরে), ৩. ছোট বৈঠানে (পাহাড়ের উপরে), ৪. ভোজনস্থলির নিকটে ব্যোমাসুরের গুহায় যাওয়ার কালে, ৫. বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে, ৬. যতীপুরায় শ্রীদাউজির মন্দিরে শ্রীগিরিরাজের উপর), ৭. রাধাকুণ্ডে সঙ্গমস্থানে।

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত

বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি স্বরূপ, বৃক্ষ এবং লতা, ফুল ও ফলে পরিপূর্ণ। বৃন্দাবনের পাখির কলরব সামবেদের ছন্দে পূর্ণ এবং জলাশয় অমৃতযুক্ত জলে ভরা। আমার হৃদয় এইভাবে যেন বৃন্দাবনের চিন্তা করে।

বৃন্দাবনে বৃক্ষের পাতা রত্ন, ফল হীরক, কলিমোতি, কচি পাতা লাল কুরব বিন্দ রত্ন, ফল অমৃত স্বাদযুক্ত এবং লাল মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত এবং বর্ষার জল অমৃতময়।

বৃন্দাবন অগণিত খুব সুন্দর সোনালী বৃক্ষে পরিপূর্ণ যা লক্ষাধিক উজ্জ্বল সূর্যের সমান। এই বৃক্ষ দর্শনমাত্র বারবার জন্ম-মৃত্যু থেকে উৎপন্ন ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং আধ্যাত্মিক সুখ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন অগণিত চন্দ্রকিরণ যুক্ত যা আধ্যাত্মিক আনন্দ প্রদানকারী। এখানে সর্বদা দিব্য প্রেমামৃত পূর্ণ শীতলতা বিদ্যমান। এরকম কোনো ব্যক্তি নেই, যার মন বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করতঃ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দের প্রতি আকর্ষিত হবে না।

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ নিজ হস্তে বৃন্দাবনের চারাগাছ, তরুলতাকে সিঞ্চন করেন এবং বৃক্ষে নতুন পুষ্প দর্শন করে খুব আনন্দিত হন। বহুবার জন্মগ্রহণ করার পরও আমরা জানিনা, কতবার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আর কতবার ব্রহ্মা, ইন্দ্রের থেকে বেশি বিষয়সুখ ভোগ করেছি। তাই আসুন, চিন্তা না করে সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম শ্রীধাম বৃন্দাবনের বন্দনা করি। বৃন্দাবনের এক টুকরা তৃণকেও প্রণাম করলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ চরণপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীবৃন্দাবনের দিব্যপ্রেম লক্ষাধিক কুবেরের ধনের থেকেও বেশি। শ্রীবৃন্দাবনের দিব্যপ্রেম বৃহস্পতির বুদ্ধিকেও অতিক্রম করে। এই প্রেম নিজের ঘর, স্ত্রী, পরিজন ছেড়ে আসার বিরহকেও শান্ত করে। কেননা, এই স্থান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ। বৃন্দাবনে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং অন্য ভক্তদের জন্য প্রেমের বিষয়।

শ্রীগোবিন্দ মন্দির

শ্রীরঙ্গজী মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীগোবিন্দ মন্দির অবস্থিত। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ গোমাটিলা হতে শ্রীগোবিন্দ জিউর বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালনার্থে বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় শ্রীবিগ্রহ না দেখতে পেয়ে অন্তরে চিন্তিত হলেন। বিজ্ঞ গোস্বামীপ্রবর বনে বনে, গ্রামে গ্রামে এবং

ব্রজবাসীগণের গৃহে শ্রীবিগ্রহ না দেখতে পেয়ে কাঁদতে ও চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন তিনি যমুনার পবিত্র তটে বসে আছেন, সেই সময়ে ব্রজবাসীরূপধারী সুন্দর এক পুরুষ এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে সেই পুরুষ বললেন, হে স্বামীন্ আপনি দুঃখিত কেন? সে পুরুষের সে বাক্য শুনে গোস্বামীর মন স্নেহে আকৃষ্ট হলো, প্রেমপূর্ণ বাক্যে মনের অবসাদ দূর হলো। তিনি তখন সেই পুরুষকে মহাপ্রভুর সমস্ত আদেশ নিবেদন করলেন। সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে সেই পুরুষ গোস্বামীকে আপনি আসুন বলে গুমাটিলা নামক স্থানে নিয়ে গেলেন এবং তথায় পুনরায় বললেন, স্বামী! এক পরমাসুন্দরী গাভী প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে এই স্থানে দুগ্ধ দিয়ে যায়। স্বামী! মনে এটি বিচার করে যা উচিত করুন। আমি যাচ্ছি। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর কথা শুনে ও রূপ দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি ধীরস্বভাব, অতএব ক্ষণকাল পরে ধৈর্য ধারণপূর্বক চিন্তা করে সমস্ত রহস্য জানতে পেরে লৌকিক চেষ্টার অনুকরণে ব্রজবাসীগণকে বললেন, এই স্থানে শ্রীগোবিন্দ আছেন। তাঁরা শুনে প্রেমবিগলিতচিত্তে বালক ও বৃদ্ধাগণের সাথে মিলিত হয়ে সেই স্থান পরিষ্কার করলেন। যোগপীঠের মধ্যস্থিত কোটি মদনমোহন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কর-শ্রীবলরামের এই আদেশ (দৈববাণী) অনুসারে তারা যত্নের সাথে সেই স্থান সংরুদ্ধ করল। তারপর সেই স্থান খননান্তে শ্রীগোবিন্দ জিউকে প্রাপ্ত হয়ে অভিষেকান্তে সেবাপূজা করতে লাগলেন।

শ্রীমদনমোহন মন্দির

এখানকার মদনমোহন বিগ্রহ (পূর্বে নাম ছিল মদনগোপাল) শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ নির্মাণ করেছিলেন। এই বিগ্রহের বহু বছর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে অদ্বৈত আচার্য প্রভু সেই মূল মদনমোহন বিগ্রহের সন্ধান পান এবং বিগ্রহের সেবা করতেন। পরে নবদ্বীপ যাওয়ার পূর্বে মদনমোহন বিগ্রহকে মথুরায় চৌবে ব্রাহ্মণের কাছে সেবাভার অর্পণ করেন।

শ্রীরাধারমণ মন্দির

নিধুবনের পার্শ্বে শ্রীরাধারমণ জিউর মন্দির অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যে দেশে বেলগুড়ি গ্রামের শ্রীবেঙ্কটভট্ট গোস্বামীর পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী উত্তর দেশে তীর্থভ্রমণ কালে গণ্ডকী নদীর তীরে একখানি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শিলাটি তিনি অতীব প্রেমের সঙ্গে সেবাপূজা করতেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তার প্রেমে প্রসন্ন হয়ে শালগ্রাম শিলা হতে শ্রীরাধারমণ জিউ প্রকটিত হয়েছেন। অদ্যাবধি শ্রীরাধারমণ জিউর পৃষ্ঠদেশে সেই শালগ্রাম চিহ্ন বিরাজ করছেন। ঠাকুর দর্শনমাত্র হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির উদয় হয়। শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে শ্রীমতি রাধারাণীর বিগ্রহ নেই। তৎপরিবর্তে সিংহাসনের বামপার্শ্বে একটি রৌপ্য মুকুট শ্রীমতি রাধারাণীর প্রতিভূরূপে অর্চিত হচ্ছে। মন্দিরের পশ্চাদভাগে শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর সমাধি মন্দির বিরাজিত এবং তিনি যে স্থানে ভজন করতেন সে স্থানটি প্রস্তর দ্বারা বাঁধাই করে নিত্য সেবিত হচ্ছে। আনন্দের বিষয়, কালাপাহাড়ের ভয়ে অন্যান্য বিগ্রহ স্থানান্তরিত হলেও শ্রীরাধারমণ জিউ স্থানান্তরিত হয়নি, অদ্যাবধি শ্রীবিগ্রহ সেই মন্দিরে অতীব সুন্দর দর্শনীয়।

শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির

বৃন্দাবনস্থ লুই বাজারে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির অবস্থিত। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জিউকে প্রকট করে এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সেবা-পূজা এবং শৃঙ্গারাদির পরিপাটি খুবই সুন্দর। অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে এই স্থানে চন্দন শৃঙ্গার অতি মনোরম দর্শনীয়। শ্যামানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের প্রকাশ বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীদামোদর মন্দির

শৃঙ্গার বটের নিকট শ্রীরাধাদামোদর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে চার গোস্বামীর শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। যেমন- ক. শ্রীরাধা বৃন্দাবন চন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত। তার বামে খ. শ্রীজীব গোস্বামীর প্রাণধন শ্রীরাধাদামোদর ও শ্রীললিতাসখী। তার বামে–শ্রীল জয়দেব গোস্বামীপাদের প্রাণধন- শ্রীরাধামাধব জিউ এবং তার বামে গ. শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীপাদের প্রাণধন- শ্রীরাধাছলচিকনীয়া বিগ্রহ দর্শনীয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন যুক্ত যে গোবর্ধন শিলা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা এই মন্দিরে নিত্য পূজিত হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সর্বসাধারণকে দর্শন করবার জন্য চরণচিহ্নকে বাহিরে আনয়ন করা হয়। এই মন্দিরকে একাধারে চারবার পরিক্রমা করলে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন একবার পরিক্রমার ফল লাভ হয়। সেইজন্য পরিক্রমা উপলক্ষে নিত্য এই মন্দিরে বহু বৈষ্ণবের সমাগম দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের ভজন কুটির এবং সমাধি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির বিরাজিত।

বাঁকেবিহারী বা শ্রী বঙ্কুবিহারী মন্দির

শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীবঙ্কুবিহারী মন্দির অবস্থিত। সেবায় পরিপাটিযুক্ত এই মন্দিরটি বহু প্রাচীন। শ্রীহরিদাস স্বামী বিষয়ত্যাগী উদাসী বৈষ্ণব। তাঁর ভজন প্রভাবে শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউ প্রকট হয়েছেন। শ্রীহরিদাস স্বামী বৃন্দাবনে আগমন করে নিধুবনে নির্জন স্থানে বসে একান্ত চিত্তে ভগবানের ভজন কীর্তনে (প্রহরানুসারে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর মাধ্যমে) মগ্ন থাকতেন। স্বামীজীর কীর্তন শ্রবণ করবার জন্য অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং শ্রীবাঙ্কেবিহারী রূপ ধারণ করে নিধুবনে প্রকটিত হয়েছেন। অতঃপর নিধুবনের পার্শ্বে শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউর বিশাল মন্দির নির্মিত হয় এবং শ্রীবিগ্রহকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে সেবাপূজার সুব্যবস্থা করা হয়। কালাপাহাড়ের ভয়-শঙ্কায় বৃন্দাবন হতে বহু বিগ্রহ স্থানান্তরিত হলেও শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউ স্থানান্তরিত হয়নি। অদ্যাবধি প্রেমের সঙ্গে সেই স্থানে সেবাপূজা চলে আসছে। বাহির হতে তৈরি ভোগদ্রব্য দ্বারা ঠাকুরের ভোগ লাগান হয় না। মন্দিরেই ভোগদ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে। ঠাকুর দর্শনের সময় সকাল ৯টা হতে ১২টা এবং বিকাল ৬টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত। বিশেষ দর্শনের দিন তা ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় যুগলচরণ সর্বসাধারণের দর্শন হয়ে থাকে। ভক্তগণের সুকরুণ আহ্বানে শ্রীবিগ্রহ মন্দির হতে সচলাবস্থায় বাইরে চলে আসেন।

একবার কোনো এক ভক্ত ঠাকুরের নয়ন দর্শন করতে করতে প্রেমে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং এমতাবস্থায় প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এই স্থানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভক্তের হৃদয়ে প্রেমোৎপন্ন হলে কি প্রাণ ত্যাগ হয়? উত্তরে–জীবের হৃদয়ে প্রেমোৎপন্ন হলে প্রাণ ত্যাগ হয় না। তবে সেই প্রেমলাভ করে তা বিয়োগ হলে প্রাণ ত্যাগ হয়। সেই ভক্ত ঠাকুরের দর্শন পেয়ে পরক্ষণেই যখন সঙ্গা হারা হলেন তখন পুনঃদর্শন আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে অজ্ঞান ও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন; যদিও সকলে দেখল যে, তিনি প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বুঝতে হবে তিনি তখন থেকে ভগবত রাজ্যে প্রবেশ লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, একবার এক ভক্ত তার স্বামীকে বহু অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে বৃন্দাবনে গমনের অনুমতি স্বীকার করালেন। উভয়ে বৃন্দাবনে আগমন করে প্রেমের সঙ্গে শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউকে দর্শন করতে লাগলেন। কিছুদিন শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউকে দর্শন করবার পর তার স্বামী স্ব-গৃহে ফিরতে চেষ্টা করলে তার স্ত্রী ভগবানের দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত হবে মনে করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু সংসার বন্ধনের জন্য স্ব-গৃহে প্রস্থান করবেন, সেইজন্য শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউর নিকট রোদন করতে-করতে প্রার্থনা জানালেন যে, হে প্রভু! আমি গৃহে প্রস্থান করছি কিন্তু তুমি যেন আমার নিকট চিরকাল অবস্থান কর। এইভাবে প্রার্থনা জানিয়ে উভয়ে ঘোড়ার গাড়ির মাধ্যমে রেল জংশনের দিকে গমন করছেন। এমন সময় শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউ এক গোপবালকরূপ ধারণ করে ঘোড়ার গাড়ির পার্শ্বে আগমন করতঃ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে স্ত্রীর নিকটে প্রার্থনা জানালেন। এই দিকে পূজারী মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দেখতে না পেয়ে তা সেই ভক্তের প্রেমযুক্ত ঘটনা বুঝতে পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই ঘোড়ার গাড়ির প্রতি ধাবিত হলেন। গাড়িতে বালকরূপী শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউকে দর্শন করে পূজারী অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বালককে ফিরে দিতে তার স্ত্রীর নিকট প্রার্থনা জানালেন। উভয়ের মধ্যে এই প্রকার বার্তালাপ চলতে থাকলে সেই বালক হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায়। তখন পূজারী মন্দিরে আগমন করে পুনঃ শ্রীবিগ্রহকে দেখতে পায় এবং এই দিকে ভক্ত ও তার স্ত্রী শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউর স্বয়ং কৃপা বুঝতে পেরে সংসারে গমন ত্যাগকরতঃ বৃন্দাবনে শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউর চরণে জীবনকে উৎসর্গ করলেন। ততকাল হতে ইত্যাদি কারণে শ্রীবিগ্রহের ঝলক দর্শন অর্থাৎ ঝাঁকি দর্শন হয়ে থাকে। ঝাঁকি কথাটির অর্থ হলো শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউ মন্দিরের সম্মুখের দরজায় একখানি পর্দা লাগানো থাকে। সেই পর্দাখানি ১/২ মিনিট অন্তর অন্তর বন্ধ এবং খুলে দেওয়া হয়। শ্রীবঙ্কুবিহারী জিউকে অনেকে শ্রীবাঁকেবিহারী বলে থাকে। ১৮৬৪ শতকে তৈরি মন্দিরে সঙ্গীত-বিশারদ হরিদাস স্বামীর নিধিবনের বিশাখা কুণ্ডে পাওয়া নিকষ কালো অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত বাঁকেবিহারী মূর্তি।

শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির

শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির অবস্থিত। শ্রীল মধুপণ্ডিত গোস্বামীপাদের ভজন এবং প্রেমে প্রসন্ন হয়ে বৃন্দাবনস্থ বংশীবটের নিচে অর্থাৎ তত্রস্থ মাটির ভেতর হতে শ্রীগোপীনাথ জিউ প্রকটিত হয়েছেন। কিছুদিন পরে কালাপাহাড়ের

উৎপাতের আশঙ্কায় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হওয়ার কালে ও পরে সেই স্থানে (বৃন্দাবনের) এবং বিভিন্ন স্থানে নতুন বিগ্রহ স্থাপিত হয়ে প্রেমের সঙ্গে সেবা-পূজা হয়ে আসছে। শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীজাহ্নবা মাতা (শেষের বারে) বৃন্দাবন আগমন করে রামাই ঠাকুরের (নিজ শিষ্য) কাম্যবন দর্শন প্রার্থনায় ভক্তগণ সঙ্গে মাতা কাম্যবনে গমন করলেন। সেখানে শ্রীগোপীনাথ জিউ শ্রীজাহ্নবী মাতাকে বস্ত্রাঞ্চলে আকর্ষণ করে নিকটে বসালেন। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীপরমেশ্বরী (পরমেশ্বর) দাস। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ শাখা। তিনি জাহ্নবী ঠাকুরানীকে শ্রীগোপীনাথের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং মাতা প্রেরিত শ্রীমতি রাধারাণীকে শ্রীগোপীনাথের বাম পার্শ্বে দর্শন করালেন। সেই সময় হতে শ্রীগোপীনাথের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীজাহ্নবী মাতার মূর্তি স্থাপন করে সেবা-পূজা চলছে।

রাজঘাট

আদি বদ্রীঘাটের দক্ষিণে এবং বৃন্দাবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাজঘাট অবস্থিত। এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারাণীকে যমুনা পার করবার ছলে মিলন হয়েছিল। কোনো একদিন শ্রীমতি রাধারাণী মথুরার বাজারে সখীগণ সঙ্গে দুধ, দধি, মাখন ইত্যাদি বিক্রি করবার জন্য যমুনার তীরে আগমন করে যমুনা পার হবার জন্য কোনো মাঝি খুঁজে পাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাবিক সেজে যমুনার ঘাটে উপস্থিত হলেন। সখীগণ নাবিককে এক আনা, দুই আনা ইত্যাদি ভাবে পনের আনা পর্যন্ত দান করতে স্বীকার হলেন, কিন্তু নাবিক ষোল আনার কমে কোনো সখীকে যমুনা পার করতে স্বীকার হলেন না। শেষ পর্যন্ত ষোল আনা দান করবেন রাজি হলে সমস্ত সখী ও শ্রীমতি রাধারাণী নৌকায় উঠলেন। নাবিক অর্ধ যমুনা গমন করে শ্রীমতি রাধারাণীর সমস্ত ননী-মাখন ভোজন করলেন এবং স্বকান্ত (শ্রীকৃষ্ণরূপ) ধারণ করে উভয়ে প্রেমসাগরে নিমগ্ন হলেন। এই লীলা স্মরণ রাখবার জন্য অদ্যাবধি বহুস্থানে "নৌকাবিলাস" লীলাকীর্তন হয়ে থাকে। শ্রীমতি রাধারাণীর এই লীলাটি লৌহবনের নিকটে যমুনাতীরে হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গনাথ জিউ শেঠের মন্দির/জগৎশেঠের মন্দির

প্রাচীন শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ঈশানে পূর্বদিকে এই মন্দির অবস্থিত। দাক্ষিণাত্য দেশের শ্রীলক্ষ্মীচাঁদ শেঠের ভ্রাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণশেঠ ও শ্রীগোবিন্দশেঠ তাঁরা শ্রীগুরুদেবের প্রেরণায় এই বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের এই মন্দির কারুকার্য যুক্ত অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। মন্দিরাভ্যন্তরে সোনার তালগাছ (গরুর স্তম্ভটি) দর্শকের মনে বিস্ময় জাগিয়ে দেয়। মন্দিরের মুখ্য বিগ্রহ হচ্ছে শ্রীরঙ্গনাথ জিউ। এছাড়া এইস্থানে বহু বিগ্রহ এবং বহু প্রকার বাহনাদি দর্শন হয়ে থাকে। যেমন- ইন্দ্রাসন, গজরাজকুণ্ড, বালাজী ভগবান, শিসমহল, বিদ্যুৎ চালিত শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন, চন্দন কাঠের বিশাল রথ, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই প্রথম দরজাখানি কলাকীর্তি যুক্ত নির্মিত, বাহন ঘরে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বিবিধ প্রকার পালকি। যেমন- তোতা, হরিণ, ময়ূর, হাতি, শেষনাগ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জিউ অথবা লালাবাবু মন্দির

শ্রীধাম গোদাবিহার মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ জিউর মন্দির অবস্থিত। কলকাতার প্রখ্যাত জমিদার শ্রীলালাবাবু এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন তিনি বিকালে গৃহে শয্যাবস্থায় আছেন, তখন কর্ণগোচর হলো বেলা গেল–এই কথা শ্রবণ করে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, সত্যি আমার বেলা তো গেল। এর অর্থ সঞ্চিত বয়স হতে আস্তে আস্তে বয়স কমে যাচ্ছে, কিন্তু কীজন্য এই সংসারে আগমন করে কী কর্ম করছি। তখন হতে মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সংসারধর্ম ত্যাগ করে ব্রজধামে চলে আসেন। ব্রজে গোবর্ধনস্থ সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ দাস বাবার আশ্রয় গ্রহণ করে (দীক্ষা লাভ) কঠোর ভজনের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। সংসারের প্রায় সমস্ত ধনরত্ন দ্বারা বৃন্দাবনে একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জিউকে প্রতিষ্ঠা করে সেবা পূজার ব্যবস্থা করে দিলেন। মন্দির স্থাপনান্তে তিনি গোবর্ধনে গমন করে শ্রীভগবৎ ভজনানন্দে নিমগ্ন হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জিউ মন্দিরের সদর দরজার বামপার্শ্বে শ্রীলালাবাবুর সমাধি মন্দির পরিলক্ষিত হয়।

নিধুবন

শ্রীশাহজী মন্দিরের সন্নিকটে নিধুবন অবস্থিত। ভারত বিখ্যাত প্রাচীন গায়ক তানসেনের গুরুদেব শ্রীহরিদাস স্বামী এ স্থানে ভজন করেছিলেন। তিনি গানের মাধ্যমে এই নিধুবন হতে বঙ্কুবিহারী জিউকে প্রকট করেছেন। এস্থানে তাঁর সমাধি দর্শনীয়। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু
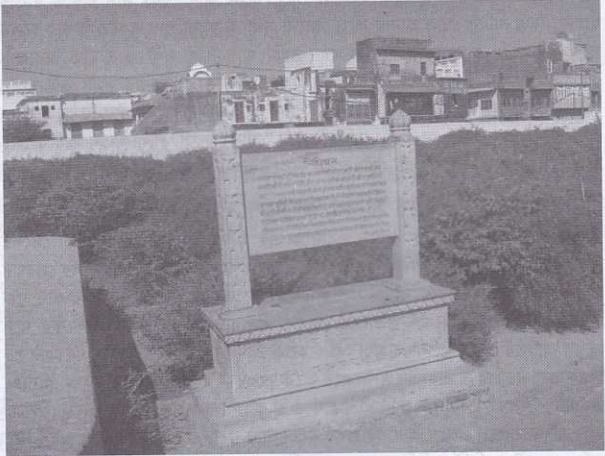
যে স্থানে নূপুর প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে স্থানটি প্রস্তর ফলকে খচিত হয়ে নিত্য পূজিত হচ্ছে, এই বনে শৃঙ্গার মন্দির অবস্থিত। সে স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য শৃঙ্গার বিলাস সুসম্পন্ন

হচ্ছে। বহুযাত্রী এ স্থানে শাঁখা-সিঁদুর (ক্রয় করে) শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার উপলক্ষে প্রদান করে থাকে। তার কাছেই বিশাখাকুণ্ড অবস্থিত।

নিকুঞ্জবন

এই বন গোপালবনের ঈশান কোণে অবস্থিত। নিকুঞ্জবনের দ্বিতীয় নাম সেবাকুঞ্জ। এই নিকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য নৈশবিহার সম্পন্ন করে থাকেন। সেজন্য এই কুঞ্জের দ্বিতীয় নাম সেবাকুঞ্জ। এই স্থানে মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব বিগ্রহ দর্শনীয়। নিত্য মধ্যরাত্রিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে লীলাবিহার করে থাকেন। তাঁদের লীলা বিলাসকালে কোনো প্রাণী জোরপূর্বক তথায় প্রবেশ করলে তারা প্রাণে বাঁচেন না।

কারণ, দুগ্ধ অতি পুষ্টিকর খাদ্য হলেও উদরাময়গ্রস্ত রোগীর পক্ষে বিষবৎ। তদ্রুপ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই লীলাবিলাস সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও সর্বসাধারণ প্রাণীর জন্য এই লীলা দর্শন নিষেধ। কিংবদন্তি আছে, একদা কোনো এক মহাত্মা গোপনে নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু প্রভাতে মৃতাবস্থায় তাকে দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এই বনে দিনের বেলায় কয়েক হাজার বানর এবং পাখির কলরব শোনা যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা পর্যন্ত বন হতে বাইরে চলে যায়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে এই স্থানে বিহার করেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন প্রভাতে মন্দিরের দরজা উন্মোচন করা হয়। পূজারী নিত্য শ্রীবিগ্রহ সেবা-পূজা অন্তে পানের বাটা, পুষ্প, শৃঙ্গারের উপকরণ ইত্যাদি সজ্জিত করে দরজা বন্ধ করেন, কিন্তু প্রভাতে দরজা উন্মোচন করে দেখেন যে, পানের চিকারী ও বিচ্ছুরিত পুষ্প ইত্যাদি মন্দিরাভ্যন্তরে লণ্ডভণ্ড। এই বনাভ্যন্তরে ললিতাকুণ্ড দর্শনীয়। নিকুঞ্জবনটি কদম্ব, শ্যাম, তমাল, পিপুল ইত্যাদি লতা-বৃক্ষ দ্বারা পরিশোভিত। বনের একটি তমালবৃক্ষতলে অসংখ্য শিলামূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই বনকে পরিক্রমা করার জন্য বনাভ্যন্তরে রাস্তা সুরক্ষিত। বৃক্ষগুলো যেন সদাই মস্তক নত করে প্রণাম করছে।

বংশীবট/রাসপুলিন/গোবিন্দস্থল

বৃন্দাবনস্থ যমুনার তটে অত্যন্ত মনোরম এই স্থান। এই বটবৃক্ষের ডালে বসে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা উপলক্ষে বংশীবাদন করেছিলেন বলে এই বৃক্ষের নাম বংশীবট। এই যমুনা তটে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেছিলেন, সেইজন্য এই স্থানের নাম রাসপুলিন এবং লীলাস্মরণের পদ্ধতি অনুসারে শ্রীগোবিন্দ এর নিকটস্থ কুঞ্জে রাত্রে বিশ্রাম করেন। সেজন্য

এই কুঞ্জের নাম গোবিন্দস্থল। অদ্যাবধি শারদীয় রাসপূর্ণিমা তিথিতে এই স্থানে রাসলীলার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পঞ্চক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমা

রমণরেতী অন্তর্গত ভক্তিবেদান্ত গেটের সামনে শ্রীরাম মন্দির। সেখান থেকে শ্রীবনবিহার, তারপর গৌরনিতাই-গৌরাঙ্গ ভবন, শ্রীনিম্বার্ক সদন, শ্রীবরাহ ভগবান মন্দির, বরাট ঘাট, শ্রীকৃষ্ণ কুয়া, শ্রীদাউজি মন্দির, কালীয় দমন মন্দির, কালীয় দমন ঘাট, দ্বাদশাদিত্য ঘাট, অদ্বৈত ঘাট, যুগল ঘাট, ইমলিতলা ঘাট, প্রতাপরুদ্র ঘাট, শৃঙ্গারবট, গোবিন্দ ঘাট, চীরঘাট, ভ্রমর ঘাট, কেশীঘাট, ধীরসমীর ঘাট, শ্রীসুদাকুটির, রামবাগ ঘাট, জগন্নাথ ঘাট, জগন্নাথ মন্দির, টাটিয়া স্থান, চৈতন্যকুটির, পানিঘাট, রাধাবাগ ঘাট, শ্রীহনুমান জিউর মন্দির, বিরাগী বাবার আশ্রম, শ্রীগোরাদাউজি মন্দির, অখণ্ড মোক্ষধাম, রামনাম গুহা, ভক্তানন্দতা আশ্রম, ললিতা আশ্রম, শ্রীরাধা কুয়া পর্যন্ত এসব মন্দির ও ঘাট দর্শন করে আবার ভক্তিবেদান্ত গেটে (অর্থাৎ যেখান থেকে পরিক্রমা আরম্ভ হয়েছিল) এসে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেই পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা সমাপ্ত হয়।

কালীয় দমন

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশসম্ভব বেদশিরা নামক এক মুনি বিন্ধ্যাচলে তপস্যা করতেন। অশ্বশিরা নামক অপর এক মুনি তাহার আশ্রমে তপস্যার্থে সমাগত হলে তাঁকে দেখে রোষরক্ত নয়নে বেদশিরা বলতে লাগলেন যে, 'হে বিপ, আপনি এখানে তপস্যা করতে পারবেন না। অন্যত্র কোথাও চলে যান। তার প্রতিউত্তরে অশ্বশিরা বললেন যে, এই স্থান আপনার নয়, আমারও নয়- ইহা মহাবিষ্ণুর, এইভাবে উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলতে থাকলে অশ্বশিরা বেদশিরাকে বলতে লাগলেন যে, তোমার ক্রোধ সর্পের ন্যায়, অতএব তুমি সর্প হও। বেদশিরাও অভিশাপ দিলেন যে, তুমি কাক হয়ে ভূতলে অবস্থান কর। সেইজন্য অশ্বশিরা নীলগিরি পর্বতে যোগিবর ভুশুণ্ড কাক হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। দক্ষ মহারাজ কশ্যপের কাছে তদীয় মনোহর একাদশ কন্যাকে অর্পণ করলেন। তন্মধ্যে কদ্রু সকলের জ্যেষ্ঠ, সেই কদ্রু কোটি কোটি মহাসর্প প্রসব করেন। এদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ফণিবর পরাৎপর শেষনাগ অনন্ত, এই শেষনাগ হরির বাক্যানুসারে ভূমণ্ডল ধারণ করে রয়েছেন এবং শ্রীভগবান কূর্ম হয়ে তার আধাররূপ মহাভারযুক্ত দীর্ঘ দেহধারণ করলেন। বেদশিরা ঐসকল সর্পমধ্যে মহাফণি কালীয় হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচ, তাহার পুত্র কশ্যপ, তস্যপুত্র গরুড়। এই গরুড় রমণকদ্বীপে প্রতিদিন সর্পগুলোকে ভক্ষণ করতেন, তাতে তারা ক্ষুব্ধ ও ভয়কাতর হয়ে গরুড়কে বলতে লাগলেন যে, হে গরুড়! তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুবাহন, অতএব তুমি যথাবিধি মাসে মাসে (পক্ষে পক্ষে) প্রতি গৃহ হতে বৃক্ষতলে আমাদের প্রদত্ত অমৃত প্রভৃতি উপাচার এবং একটি করে সর্প পর্যায়ক্রমে বলিরূপে গ্রহণ কর। সেই অনুসারে গরুড়কে নিত্য দিব্য বলিদান করতে লাগলেন। একদা কালীয় গৃহে বলি প্রদানের পালা পড়লে সে বলপূর্বক গরুড়ের বলি সকল স্বয়ং ভক্ষণ করলেন। কদ্রুতনয় কালীয় বিষ ও বীর্যমদে আবিষ্ট হয়েছিল, তজ্জন্য গরুড়কে গণ্য না করে স্বয়ং সমুদায় বলি ভোজন করেছিল। কালীয় নিজে দেওয়া ত দূরের কথা

অন্যের প্রদত্ত বলিও নিজে ভোজন করতে লাগল। গরুড় এই অবস্থা দেখে ক্রোধে তার উপর আক্রমণ করলেন। কালীয় ভয়ে সপ্তসমুদ্র সপ্তদ্বীপ ইত্যাদি স্থানে উপস্থিত হয়ে কোথাও রক্ষা পেলেন না। তারপর ভয়াতুরা কালীয় দেবদেব শেষনাগ অনন্তের চরণপ্রান্তে গমন করলেন এবং তাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানালেন। তখন শেষনাগ বললেন যে, তুমি কোথাও রক্ষা পাবে না, তবে এক কাজ কর-পূর্বকালে সৌভরিমুনি শ্রীবৃন্দাবনের যমুনার জলে তপস্যা করবার সময় মীনগণ চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করতেন। সেই সময় গরুড় এসে তাদের ভক্ষণ করত, এতে মীনগণ দুঃখিত হয়ে মুনির নিকট প্রার্থনা জানালে মুনি গরুড়কে অভিশাপ দিলেন যে, এই স্থানে গরুড় কদাপি আগমন করবে না, যদি আগমন করে তবে তার মৃত্যু হবে। সেই ভয়ে গরুড় আর ঐ স্থানে গমন করেন না, অতএব, তুমি সেই স্থানে গমন কর, তার বাক্যানুসারে ভয়াতুর কালীয় স্ব-পরিবার ও বন্ধুবান্ধব সহ শ্রীযমুনার জলে অবস্থান করতে লাগলেন। কালীয়ের বিষাগ্নি দ্বারা সেই জল পাক হয়ে সর্বদাই ফুটত। অতএব, তার উপর দিয়ে পক্ষী প্রভৃতি খেচরগণ গমন করলে তন্মধ্যে পতিত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করত। কালীয় হ্রদের তীরে স্থাবর-জঙ্গমে প্রাণি গমনাগমন করলে কালীয় নাগের বিষ জলের তরঙ্গস্পর্শী এবং দুষ্ট বারিকণাবাহী বায়ু কর্তৃক স্পষ্ট হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ মারা যেত। একদা শ্রীকৃষ্ণ গো ও গোপগণ সঙ্গে বনে গমন করলেন। সেইদিন শ্রীবলরামের বনে গমন হয়নি বলে কেহ কেহ বলে থাকেন, সেইদিন শ্রীবলরামের জন্মতিথি ছিল। সখা ও গোবৎসগণ গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রতাপে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে যমুনার জল পান করলে গতপ্রাণ হয়ে সকলে সলিলের নিকট পতিত হয়ে রইল এবং শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিতে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, কালীয় নাগকে দমন করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যমুনার পার্শ্বে এক কদম্ব বৃক্ষ হতে লম্ফ দিয়ে জলে পতিত হলেন। এখানে সকল বৃক্ষাদির মৃত্যু হলেও এই কদম্ববৃক্ষের মৃত্যু হয়নি। তার কারণ, একদা স্বর্গ থেকে গরুড়জী চন্দ্র হরণ করে শ্রীকালীয়দহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে এই কদম্ববৃক্ষের উপর চন্দ্র রেখে ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। তখন বৃক্ষ সুধাস্পর্শে অমরত্ব লাভ করেছিল। নাগ শ্রীকৃষ্ণকে জলে বিহার করতে দেখে ক্রোধে শরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে বেষ্টিত করে ফণাসকল উন্নতকরতঃ দংশন করতে লাগলেন। দর্শনীয় সুকুমার দেহ মেঘবৎ উজ্জ্বল শ্যাম, শ্রীবৎস ও পীতবসনধারী ঈষদহাস্য সুন্দর বদন, পদ্মের অভ্যন্তরের ন্যায় অরুণ বর্ণ পদতল সেই শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয়ে হ্রদমধ্যে ক্রীড়া করছিলেন, তা দেখে ক্রোধে কালীয় শ্রীকৃষ্ণের সকল মর্মস্থলে দংশন করেছিল ও নিজ শরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করেছিল। সখাগণ দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণকে জলে পতিত দেখে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনন্তর ব্রজে মহাভয়ঙ্কর ত্রিবিধ মহোৎপাত দেখা দিলে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বলতে লাগলেন যে, শ্রীবলরাম আজ বনে গমন করেনি, শ্রীকৃষ্ণ একা বনে গমন করেছে, অতএব পথে কিছু অমঙ্গল ঘটেছে। ইত্যাদি ভেবে চিন্তা করতে করতে গাভীদিগের পদচিহ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজাবজ্র পদ্ম ইত্যাদি যুক্ত পদচিহ্ন দর্শন করতে করতে যমুনাতটস্থ কালীয়দহে এসে উপস্থিত হলেন।

অনন্তর ব্রজে স্বভাবত মহাভয়ঙ্কর, আসন্ন ভয়সূচক ত্রিবিধ মহোৎপাত ভূমি স্বর্গ ও আত্মাতে লক্ষিত হতে লাগল। সেই সকল দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করে ভয়োদ্বিগ্ন নন্দ প্রভৃতি গোপগণ শ্রীবলরামকে না নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ একাকীই গোচারণ করতে গেছেন। তা জেনে কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ কৃষ্ণগত প্রাণ, কৃষ্ণগত মন, নন্দাদি গোপগণ সেই সকল দুর্নিমিত্ত দ্বারা কৃষ্ণ নিধন প্রাপ্ত হয়েছেন মনে করে সেই পশুবৃত্তি, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কৃষ্ণদর্শন লালসায় অতি দীনভাবে গোকুল হতে নির্গত হয়েছিল। কালীয়দহ সখাগণের নিকট হতে শ্রীকৃষ্ণের জলে গমন বার্তা শ্রবণ করে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ হ্রদমধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। তখন শ্রীবলরাম তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল (তিনি জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ অনাদির আদি গোবিন্দ) যে, শ্রীকৃষ্ণকে কালীয়নাগ কিছুই করতে পারবে না। পরিবর্তে তাকে দমন করে অল্প সময়ের মধ্যে তীরে ফিরে আসবেন। কালীয় যখন মস্তক উন্নত করেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাত দ্বারা তাকে দমন করেছিলেন। সেই মস্তকের উপর শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে কালীয়ের ক্রোধযুক্ত সহস্র ফণা ও গাত্রভগ্ন করেছিলেন এবং কালীয় বহুমুখে রুধির বমন করতে করতে গতপ্রাণ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয়েছিলেন।

হে রাজন, সেই বিচিত্র তাণ্ডব নৃত্যে কালীয়ের সহস্র ফণা ও গাত্র ভগ্ন হয়েছিল, তখন সে বহু মুখে প্রচুর রুধির বমন করতে করতে চরাচর গুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করে মনে মনে তার শরণাগত হয়েছিল। কালীয়ের এই রূপ অবস্থা দেখে স্ত্রীগণ পতির মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চরণে বহু প্রকারের স্তুতি করতে লাগলেন। তাদের স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে বললেন যে, তোমরা এই স্থান ত্যাগ করে পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধবসহ রমণকদ্বীপে গমন কর। আমার পদচিহ্ন তোমাদের মস্তকে দেখতে পেলে গরুড় আর তোমাদের ভক্ষণ করবে না।

হে সর্প, তুমি যার ভয়ে রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করে এই হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলে সেই গরুড় আমার পদচিহ্ন যুক্ত দর্শন করলে তোমাকে আর ভক্ষণ করবে না। এই কথা শ্রবণ করে সকলে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করতে লাগলেন এবং রমণকদ্বীপে প্রস্থান করলেন। কালীয়নাগ চলে গেলে শ্রীযমুনার জল বিষহীন এবং অমৃততুল্য হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যমুনা হতে তীরে উঠে শ্রীনন্দমহারাজ এবং সখাগণের সাথে আলিঙ্গন করলেন। এই হ্রদের মহিমা স্বয়ং ভগবান বলেছিলেন, হে বসুন্ধরে ! কালীয়ের হ্রদে গমন করে তথায় ক্রীড়া করে ও তথায় স্নান মাত্রে সর্বপাপ হতে নিশ্চিতই মুক্ত হওয়া যায়। এইহ্রদে যে প্রাণত্যাগ করে, সে আমার ধামে গমন করে।

বস্ত্রহরণ বা চীর ঘাট (কেলি কদম্ব)

বৃন্দাবনের স্যারহ গ্রামে যমুনার তটে চীরঘাট অবস্থিত। ঘাটের উপরে অতি প্রাচীন কদম্ববৃক্ষ অদ্যাবধি দর্শনীয়। এই বৃক্ষের সন্নিকটে শ্রীকাত্যায়ণী দেবীর মন্দির বিরাজিত। একদা শ্রীকাত্যায়ণী ব্রত উপলক্ষে গোপীগণ রাত তিনটার সময় এই ঘাটে বস্ত্রসকল রেখে যমুনার জলে স্নান করছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে বংশীবাদনের মাধ্যমে

বস্ত্র সকল কদম্ববৃক্ষের ডালে আনয়ন করেছিলেন। অবশেষে গোপীগণের বস্ত্রসকল ফেরত দিয়ে মনবাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন।

ইমলিতলা ঘাট (মহাপ্রভুর বৈঠক)/মহাপ্রভুর বিশ্রাম স্থান

যমুনা তটে অন্ধেরা ঘাটের উত্তরে এই ঘাট অবস্থিত। তেঁতুল বৃক্ষকে হিন্দি ভাষায় ইমলি বৃক্ষ বলা হয়ে থাকে। শ্রীরাধিকার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ অধীর হয়ে এই ইমলিতলার কুঞ্জে উপবেশন করে বিহ্বল অন্তরে শ্রীরাধার নাম জপ করেছিলেন। অনন্তর তিনিই, যিনি কলিযুগে শ্রীরাধাভাব আস্বাদিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়ে যখন বৃন্দাবনে আগমন করেছিলেন সেই সময় এই ইমলিবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন বা বিশ্রাম করেছিলেন। সেই অবধি এই ঘাটের নাম হয় গৌরাঙ্গ ঘাট। ইমলিবৃক্ষের নামানুসারে এই ঘাটের অপর নাম শ্রীইমলিতলা ঘাট। এই ইমলিবৃক্ষ প্রায় ৫৫০০ বছরের পুরানো। এখানে শ্রীনিতাই-গৌর এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

ইস্‌কন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দির

রমণরেতীতে এই মন্দির অবস্থিত। প্রভুপাদ শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী ১৯৭৫ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভুপাদের শিষ্য পরম্পরায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর তত্ত্বাবধানে মন্দিরের সেবাপূজা এবং সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হয়ে

আসছে। মন্দিরের ভেতরে তিনখানা কক্ষ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বিগ্রহ, তার দক্ষিণ পার্শ্বে ললিতা-বিশাখা সখীর সঙ্গে শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের যুগল বিগ্রহ এবং বাম পার্শ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ অতীব সুন্দর দর্শনীয়। মন্দিরের সম্মুখে তথা রাস্তার পার্শ্বে প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামীর সমাধি মন্দির দর্শনীয়।

কেশীঘাট

ধীরসমীর ঘাটের সন্নিকটে কেশীঘাট অবস্থিত। পুরাকালে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের ছত্রধারণকারী একজন অনুচর ছিলেন। তাঁর নাম ছিল কুমুদ। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হলেন। সেই পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের শুভ্র অশ্বটি দর্শন করে কুমুদ তাতে আরোহনের জন্য অভিলাষ করেন। সেজন্য তিনি যখন অশ্বে আরোহন করছিলেন তখন মরুদগণ তাকে দেখে ফেলেন। তারা কুমুদকে ধরে মহারাজ ইন্দ্রের নিকট আনয়ন করলে ইন্দ্র একথা শ্রবণ করে ক্রোধে অভিশাপ দিলেন যে, "রে দুষ্মতে! তুমি রাক্ষস হও এবং অশ্বের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে মর্ত্যধামে বিচরণ কর। সেই অভিশাপে কুমুদ ব্রজের ময়দানবের পুত্র কেশী নামে জন্মগ্রহণ করে কংসের অনুচর হয়েছিলেন। কংস নিজপ্রাণ রক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য কেশী দৈত্যকে প্রেরণ করলেন। কেশী বিশাল অশ্বের রূপ ধারণ করে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে গমন করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার জন্য গমন করে নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড

শ্রীগর্গ সংহিতা গ্রন্থের মাধুর্য খণ্ড হতে কাহিনী সংক্ষেপে অরিষ্টাসুরের পূর্বনাম দ্বিজসত্তমবরতন্তু। তিনি গুরু বৃহস্পতির নিকট বিদ্যাভ্যাস করতেন। কোনো একদিন পড়তে গিয়ে গুরুর সমীপে পাদ প্রসারিত করলে গুরু তা দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন যে, হে দুর্মতে, তুমি বৃষের ন্যায় আমার সম্মুখে অবস্থান করছ, অতএব বৃষ হও। সেই অভিশাপে বরতন্তু বৃষ হয়ে অসুরগণের সংসর্গে অসুরত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। কোনো এক সময় বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুর কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সখা ও গোপগণের মধ্যে গোচারণ লীলায় প্রবেশ করলেন। তার নিষ্ঠুর নিনাদে গোপ-গোপীগণ ভয়ে ত্রস্ত হয়েছিলেন এবং "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রক্ষা কর" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ "তোমাদের ভয় নাই" বলে আশ্বস্ত প্রদান করেছিলেন। সেই অসুর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহাক্রোধে ধাবিত হলে শ্রীকৃষ্ণ তার শৃঙ্গের অগ্রভাগ ধারণপূর্বক মুহুর্মুহু ভ্রামিত করে ভূমিতে পতিত করলেন এবং বিষাণ উৎপাটন করে তদ্দ্বারাই তাকে নিহত করলেন। অসুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়ে মুক্তিপদ লাভ করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেদিন অরিষ্টাসুরকে বধ করে ব্রজবাসীগণের পরমানন্দ বর্ধন করেছিলেন, সেইদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমাগণের সমভিব্যাহারে রাসস্থলীতে রাসলীলার প্রার্থনা করলে গোপীগণ মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে বললেন, হে বৃষাসুর মর্দন! আজ আমাদিগকে স্পর্শ করিও না, আজ তুমি বৃষকে হত্যা করে তোমার গোবিন্দ নামে কালিমা লেপন করেছ। অতএব, তুমি গোবধ পাপে লিপ্ত হয়েছ। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে সুন্দরীগণ! সে তো বৃষ নয়, ভয়ঙ্কর অসুর। গোপীগণ বললেন, শোন! বৃত্রাসুরের ব্রাহ্মণ শরীর হওয়ায় তাকে বধের নিমিত্ত ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করেছিল। তদ্রুপ ইহারও তো বৃষের রূপ ছিল! গোপীগণের যুক্তিপূর্ণ বচন শ্রবণ করে গোবিন্দ বললেন, হে প্রিয়ে! তাহলে বল, আমি এখন এই পাপ হতে কিরূপে মুক্তি লাভ করতে পারি? তদুত্তরে হে প্রিয়তম! তুমি যদি ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থে অবগাহন

করতে পার তবেই তুমি পাপমুক্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি এই ব্রজভূমি ত্যাগ করে এখন ত্রিভুবনের তীর্থস্নানের জন্য কোথায় যাবো? সম্প্রতি আমি ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থকে আহ্বান করে তোমাদের সম্মুখে তাতেই স্নান করব। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে সজোরে চরণের পার্ষ্ণি (গোড়ালী) আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাল হতে ভগবতী গঙ্গা এবং নিখিল তীর্থ এসে উপস্থিত হলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমরা আমার কুণ্ডে বিরাজমান হও। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করে সমস্ত তীর্থ কুণ্ডমধ্যে উপস্থিত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে প্রিয়ে! দেখ সমস্ত তীর্থ এখানে উপস্থিত হয়েছে, গোপীগণ বললেন, আহ! কেবল তোমার কথাতেই আমরা বিশ্বাস করব না। তখন সমস্ত তীর্থ নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করতঃ হাত জোড় করে আপন আপন নাম উচ্চারণ করতে লাগল, আমি লবণ সমুদ্র, আমি ক্ষীর সমুদ্র, আমি অমর দীর্ঘিকা, আমি শোন নদী, আমি তাম্রপর্ণী, আমি পুষ্কররাজ, আমি সরস্বতী, আমি গোদাবরী, আমি গঙ্গা, আমি যমুনা, আমি সরযু, আমি প্রয়াগরাজ, আমি রেবাতীর্থ ইত্যাদি সমস্ত তীর্থের জল পৃথক পৃথক দর্শন করুন এবং আমাদেরকে বিশ্বাস করুন। তদন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করে পবিত্র হয়ে দাম্ভিকতা প্রকাশ করতঃ বললেন, আমি সর্বতীর্থময় এই কুণ্ড প্রকাশ করলাম। তোমরা সকলে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতঃ কোনো ধর্ম পূর্ণ কর নাই, সম্প্রতি এই কুণ্ডে স্নান করে সর্বতীর্থ স্নানের মাহাত্ম্য অর্জন কর। ইহা শ্রবণে শ্রীরাধিকা স্বীয় সখীগণকে বললেন, হে সখীগণ! আমারও এই প্রকার এক কুণ্ড নির্মাণ করা প্রয়োজন। অতএব, তোমরা সকলে মিলে কার্য আরম্ভ কর। স্বামীনি জিউর আজ্ঞা পেয়ে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডের পশ্চিমে বৃষাসুরের খুরের এক বিরাট গহ্বর ছিল, ঐ গহ্বরের নরম মৃত্তিকা স্ব-স্ব হস্ত দ্বারা খনন করে সামান্য দূরে ফেলতে লাগলেন এবং দেখতে দেখতে তথায় এক মনোরম কুণ্ড সৃষ্টি হলো। শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোরম কুণ্ড অবলোকন করে চিন্তাকরতঃ রাধিকাকে বললেন! তোমার কুণ্ড অতীব সুন্দর, কিন্তু এতে তো জল বাহির হয় নাই, অতএব, তুমি সখীগণকে সঙ্গে নিয়ে আমার কুণ্ডের তীর্থজল বহন করে তোমার কুণ্ড পূর্ণ কর। শ্রীরাধিকা বললেন! না তা কদাপি নয়, কারণ তোমার অবগাহনে উহার জলও গোবধ পাতক যুক্ত হয়েছে।

আমি সখীগণকে সঙ্গে নিয়ে কলসী দ্বারা মানস গঙ্গার পবিত্র জলে এখনই কুণ্ড পূর্ণ করবো। তথাপি তোমার কুণ্ডের একবিন্দু জলও লইবো না। এইরূপে জগতে আমি অতুলনীয় যশোরাশি বিস্তার করব। রাধিকার এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তার অভিপ্রায় অবগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে তীর্থগণকে ইঙ্গিত করলে অকস্মাৎ সমস্ত তীর্থ দিব্যমূর্তি ধারণকরতঃ শ্রীশ্রী শ্যামকুণ্ডের বাইরে এসে সভক্তি বিনয়াবনত সাশ্রুপূর্ণ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে করজোড়ে স্তুতি করতে করতে বললেন, হে দেবী! সর্বশাস্ত্র অর্থবেত্তা ব্রহ্মা তথা মহাদেব এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীও আপনার মহিমা অবগত নহে, সর্বপুরুষার্থ শিরোমণি আপনার স্বেদবিন্দু অপনোদনকারী শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অবগত আছেন। অহো! শ্রীকৃষ্ণ আপনার শ্রীচরণকমলে মনোহর যাবকদ্বারা সুসজ্জিত করে প্রতিদিন নূপুর পরিধান করাইয়া থাকেন এবং আপনার কৃপা কটাক্ষ প্রাপ্তিতে পরমানন্দিত হয়ে আপনাকে ধন্যতম মনে করে থাকেন। তারই আজ্ঞায়

আমরা সহসা এখানে সমুপস্থিত হয়ে তারই শ্রীচরণ আঘাত হতে নির্মিত এই কুণ্ডে বাস করবো। অতএব, হে দেবী! যদি আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন তা হলে আমাদের তৃষ্ণারূপী বৃক্ষ ফলফুলে পরিপূর্ণ হবে। নিখিল তীর্থের সবিনয় স্তুতি নতি শ্রবণে পরমানন্দে শ্রীরাধিকা তীর্থগণকে বললেন, হে তীর্থগণ! তোমাদের কী অভিলাষ তা আমাকে বল, তখন তীর্থগণ সহর্ষে স্পষ্টরূপে বললেন, আমরা সকলে আপনার কুণ্ডে যাব। এতে আমাদের মনোরথ সফল হবে। এই আমাদের সকাতর প্রার্থনা। তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনী সখীগণকে জিজ্ঞাসাকরতঃ সর্বসম্মতিক্রমে প্রাণবল্লভের বদন করকমলে স্বীয় নয়ন প্রাপ্ত সংলগ্নকরতঃ মন্দ মন্দ হাসতে হাসতে বললেন, হে তীর্থগণ! তোমরা সকলে আমার কুণ্ডে আগমন করিও। শ্রীরাধিকার শ্রীমুখের কৃপামৃতপূর্ণ আজ্ঞা শ্রবণে তীর্থগণের সঙ্গে স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত সকলেই সুখসাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেল। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আজ্ঞা করুণাপ্রাপ্ত হয়ে তীর্থগণ উভয় কুণ্ডের মধ্যস্থলের আবরণ সজোরে ভেদকরতঃ নিজেদের জলে শ্রীকুণ্ড পরিপূর্ণ করে দিলেন। সেইদিন ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে প্রিয়তমে! জগতে আমার কুণ্ড অপেক্ষা তোমার কুণ্ডে প্রতিদিন স্নান ও জলবিহার করবো। অধিক কি হে রাধে! তুমি যেমন আমার প্রিয়া, তদ্রুপ তোমার কুণ্ডও আমার প্রিয়া। প্রাণকোটিতম শ্রীকৃষ্ণের বচনামৃত শ্রবণ করে শ্রীরাধিকা বললেন, হে প্রিয়তম! আমি সখীগণের সহিত প্রতিদিন তোমার কুণ্ডে স্নান করব। এবং যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে স্নান করবে ও তীরে বাস করবে তাহার শত বাধাবিঘ্ন বিনাশ হবে। এবং সেই ব্যক্তি আমার অবশ্যই অত্যন্ত প্রিয় হবে। এইরূপ বলে সেই রাত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড তটে শ্রীশ্যাম নবজলধরের সঙ্গে থির বিজুরী অলংকৃত হয়ে মহারসময় হর্ষবর্ধন করতে করতে রাসোৎসব সম্পন্ন করে ত্রিলোকের মধ্যে এক অলৌকিক যশোরাশি বিস্তার করলেন।
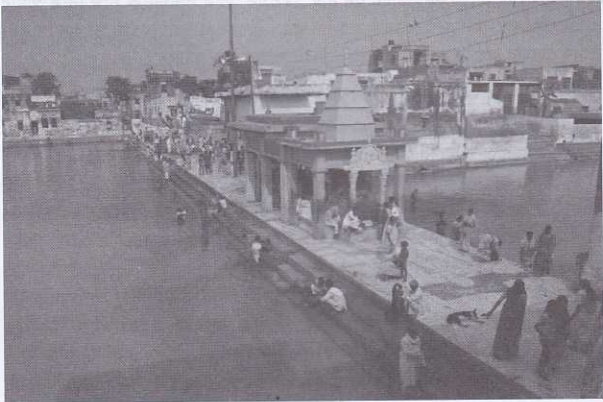
শ্রীরাধা এবং শ্যামকুণ্ডের চতুর্দিকস্থ ঘাটসমূহ-

১। ঝুলনতলা ঘাট; ২। গো ঘাট; ৩। মা জাহ্নবা ঘাট; ৪। দাস গোস্বামী ঘাট; ৫। গোবিন্দ ঘাট; ৬। গোপালভট্ট ঘাট; ৭। যুগল/সঙ্গম ঘাট; ৮। রাসবাড়ী ঘাট; ৯। গো-ঘাট; ১০। কুণ্ডেশ্বর মহাদেব ঘাট; ১১। মানসপাবন ঘাট; ১২। পঞ্চপাণ্ডব ঘাট; ১৩। রাধাবল্লভ ঘাট; ১৪। নন্দিনীমাতা ঘাট; ১৫। জীবগোস্বামী ঘাট; ১৬। ঘনমাধব ঘাট; ১৭। রাধাবিনোদ ঘাট; ১৮। গয়া ঘাট; ১৯। অষ্টসখী ঘাট; ২০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন ঘাট; ২১। পাশাখেলা ঘাট; ২২। শ্রীবল্লভাচার্য ঘাট; ২৩। মদনমোহন ঘাট।

শ্রীশ্রী মা জাহ্নবাদেবীর মন্দির

এই মন্দিরের মধ্যে শ্রীগোপীনাথদেবজী, বামপার্শ্বে শ্রীমতি রাধারাণী এবং দক্ষিণপার্শ্বে মা জাহ্নবার প্রতিমূর্তি দর্শনীয়। শ্রীগোপীনাথ মা জাহ্নবাকে আঁচল ধরে আকর্ষণ করেন এবং নিজপার্শ্বে বিগ্রহরূপে স্থান দিয়েছেন। মন্দিরের ডান দিকে রাধাকুণ্ড তটে মা জাহ্নবার বৈঠক দর্শনীয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি ও ভজন কুটির

শ্রীমানসপাবন ঘাটের নিকটে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটির। এই স্থানে তিনি দেবতুল্য "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীলগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটির বায়ুকোণে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি একই মন্দিরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, মহাপ্রভুর অপ্রকট কথা শ্রবণে এই গোস্বামীগণ একই তিথিতে বিরহে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছিলেন। সেই তিথি স্মরণ রাখবার জন্য একই মন্দিরে তিন গোস্বামীপাদের পুষ্পসমাধি মন্দির স্থাপন করে নিত্য সেবা-পূজা করা হয়।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির

রাধাকুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির অবস্থিত। বর্তমানে আমরা যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দর্শন, জলে স্নান, চতুর্দিকে তটভূমিতে বসবাস করবার সৌভাগ্য লাভ করি ইহাই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অহৈতুকী করুণাতে সম্পন্ন হচ্ছে। সম্রাট আকবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদকে এই স্থানটি তামার পাটায় দলিল করে দিয়েছেন। তখন থেকেই এই স্থান বাঙ্গালি ভজনশীল মহাত্মাগণের ভজনস্থলীরূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড খনন করেছিলেন। পূর্বে ইহা ধান্যক্ষেত্ররূপে ছিল। এই স্থানে অখণ্ড হরিনাম চলছে।

পঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষ

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরের পূর্ব দিকে পঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষরূপে বিরাজমান আছেন। শ্রীল দাস গোস্বামীপাদ পঞ্চপাণ্ডবের স্বপ্নাদেশে শ্যামকুণ্ড সংস্কারকালে ঐ বৃক্ষগুলো ছেদন করেনি। জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, কোনো এক শেঠ নিজ সন্তান কামনার্থে বদ্রীনাথে গমন করে শ্রীবদ্রীনাথ জিউর তপস্যায় মগ্ন হলেন। শ্রীবদ্রীনাথ জিউ শেঠজিকে জানালেন যে, তুমি

বৃন্দাবনান্তর্গত রাধাকুণ্ড গ্রামে গমন কর। তথায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মন প্রসন্ন করলে তোমারও মনঃকামনা পূর্ণ হবে। সেই বাক্যানুসারে তিনি রাধাকুণ্ডে আগমন করে দাস গোস্বামীপাদের চিন্তা করেছিলেন মাত্র–'যদি কুণ্ড দুইটি সংস্কার হয় তবে ভাল হয়।' অন্তর্যামী ভগবান কীভাবে অন্তরের কথা অন্য ভক্তের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। যাক, সেই অনুসারে গোস্বামীপাদ শেঠের দ্বারা কুণ্ড দুইটি সংস্কার করতে শুরু করলেন। রাধাকুণ্ড চৌকোণাকৃতি ছিল সেই অনুসারে শ্যামকুণ্ডকেও চৌকোণাকৃতি করতে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সেই রাত্রে গোস্বামীপাদকে স্বপ্নে জানালেন যে, হে প্রভু! আমরা পঞ্চপাণ্ডব এই স্থানে বৃক্ষরূপে অবস্থান করছি। যদি আপনি শ্যামকুণ্ড চৌকোণাকৃতি করেন তবে, আমাদের পতন অনিবার্য। প্রভাবে গোস্বামীপাদ বৃক্ষগুলোকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত এবং বৃক্ষগুলো রক্ষার জন্য শ্যামকুণ্ডখানি চৌকোণাকারে সংস্কার হয় নি। আজ পর্যন্ত এই পঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষদ্বয় দর্শনীয়।

প্রেম মন্দির

আধ্যাত্মিক গুরু কৃপালু মহারাজ বৃন্দাবনে প্রেম মন্দির স্থাপন করেন। মার্বেল পাথরে তৈরি অসাধারণ মন্দির সনাতন ধর্মশিক্ষার কেন্দ্রস্থলও। বিভিন্ন মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণ রয়েছে মন্দিরে। কৃষ্ণ এখানে বহুরূপে পূজিত।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির

ঠাকুর যেন ভক্তগণকে আহ্বান করে বলতেছেন–"তোমরা কেন সংসারে মায়াবদ্ধ হয়ে ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করছ, সকলে আমার শরণাগত হও, আমি তোমাদের সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত করবো"। এই মন্দিরের সম্মুখে একটি কুয়া আছে। যার নাম জগন্নাথ কুয়া নামে সকলের কাছে পরিচিত। এ ছাড়াও এই স্থানে একটি সিদ্ধ নিমবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষটি অধিকাংশ ভক্ত পরিক্রমা ও বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম ও গড়াগড়ি করে থাকেন। কারণ, কুণ্ড সংস্কার করার সময় রাধাকুণ্ডের রজ বা ধুলি এই বৃক্ষের নিচে রেখে বেদীটি তৈরি করা হয়।

ললিতা কুণ্ড

শ্রীললিত বিহারী জিউর মন্দিরের সন্নিকটে ঝুলন স্থান ও হীণ্ডলাবেদী। সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই ঝুলন ঝুলানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার নর্তন-কীর্তনের মাধ্যমে ঝুলাতে থাকেন। অষ্টসখীর মধ্যে অন্যতমা শ্রীললিতাসখী, তিনি এই স্থানে শ্রীমতি রাধারাণীকে আনয়ন করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিতেন, সেজন্য এই স্থানের নাম ললিতাকুঞ্জ। কুঞ্জ তটে অবস্থিত কুণ্ডের নাম ললিতা কুণ্ড। এই কুণ্ডের পশ্চিম দিকে নারদকুণ্ড দর্শনীয়।

তমালতলা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন আগমনকালে এই বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম করেছিলেন এবং কারী ও গৌরী নামক কুণ্ড দুটিকে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামে অভিহিত করেছিলেন। ঐ কুণ্ডদ্বয়ের রজ তুলে তিলক রচনা করেছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবন আগমন

মহাবনে সমস্ত গোস্বামীগণই আগমন করেছিলেন। যথা-শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীবিটঠলনাথজী, শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামীপাদগণ। বৃন্দাবনে আগমন করে কেবল পঞ্চক্রোশ বৃন্দাবন দর্শন ও পরিক্রমা করলেই মনে শান্তি পাওয়া যায় না। যারা ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল নিয়ে বৃন্দাবন ধাম জানতে পেরেছেন তারা অবশ্যই বৃন্দাবনে আগমন করে অন্ততঃ মুখ্য স্থানগুলো অবশ্যই দর্শন করবেন। সেজন্য ব্রজে (বৃন্দাবনে) আগমন করবার পূর্বে সাধুসঙ্গের মাধ্যমে অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে বৃন্দাবন সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

ব্রহ্মাণ্ড ঘাট

মহাবনের ১ কি.মি. দক্ষিণে যমুনাতটে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সাথে খেলা করবার সময় মাটি ভক্ষণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাটি খেলে সখাগণ তা দেখে মাতা যশোদার নিকট বলতে লাগলেন। মাতা যশোদা এসে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন শ্রীকৃষ্ণকে-তুমি মাটি খেয়েছো কেন? কৃষ্ণ বললেন, আমি মাটি খাইনি। তখন মা যশোদা দেখতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখালেন। এজন্য এই ঘাটের নাম হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট।

গিরিরাজের মাহাত্ম্য

যে কোনো ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাপূর্বক অথবা অশ্রদ্ধা করে শ্রীগিরিরাজ মহারাজের এক মূর্তির কখনও কোথাও একবার মাত্র স্পর্শ করে সে ব্যক্তি যদি ব্রহ্মঘাতী, বৈঘাতী, নরঘাতী বা চৌর্যকর্মে রত হলেও অন্তকালে স্বীয় উপাস্যদেবের দাসত্ব লাভ করে বৈকুণ্ঠ গমন করে থাকেন।

গৌতমী তীরে বিজয় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তিনি নিজ ঋণগ্রহণার্থ পানাশিনী মথুরায় আগমন করেন। হে মৈথি! তিনি স্বকার্য সাধনান্তে গৃহে যেতে যেতে গোবর্ধন তটে উপনীত হন এবং তথা হতে বর্তুলাকার একখণ্ড শিলা গ্রহণ করতে বনপথে ব্রজমণ্ডল হতে

ধীরে ধীরে বহির্গমন করেন। তিনি সম্মুখে সমাগত এক ঘোররূপী রাক্ষস দর্শন করলেন, ঐ রাক্ষসের হৃদয়, মুখ, তিনখানি পদ, ছয়বাহু, ওষ্ঠ, হস্তত্রয় পরিমিত স্থূল, নাসিকা এক হাত উন্নত লোল রসনা সপ্তহস্তমিত, লোম সকল কণ্টকবৎ, নয়ন অরুণ বর্ণ এবং দন্ত সকল বক্র ও ভয়ঙ্কর। হে রাজন! তদ্দর্শনে অত্যন্ত কম্পিত কলেবর পলায়নে অপারগ ব্রাহ্মণ বসে পড়লেন, তাকে ভক্ষণ করবার জন্য রাক্ষস ঘুর্ঘুর শব্দ করে সম্মুখে আগমন করল। ব্রাহ্মণ গোবর্ধন জাত সেই পাষাণ দ্বারা তাকে প্রহার করলেন, সে গিরিরাজ শিলাঘাতে রাক্ষস তনু ত্যাগ করে পদ্মপত্রবৎ আয়তনের শ্যামসুন্দর দেহ বনমালী পীতবাসর মুকুট কুণ্ডলমণ্ডিত বংশীধর বেত্রকর সৌন্দর্যে দ্বিতীয় কামদেবের মতো হয়ে করজোড়ে দ্বিজকে মুহুর্মুহু প্রণাম করল। সিদ্ধ বললেন, হে মহামতে! তুমি পরত্রাণ পরায়ণ অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও ধন্য আমি তোমা কর্তৃক রাক্ষসত্ব হতে বিমুক্ত হলাম। পাষাণ স্পর্শ মাত্রেই আমার মহামঙ্গল হয়েছে, তুমি ভিন্ন আমায় মুক্ত করতে কেউ সমর্থ নয়। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি তোমার বাক্যে বিস্মিত, তোমাকে মুক্ত করবার শক্তি আমার নেই, পাষাণ স্পর্শের ফল আমি বিদিত নহি, হে সুব্রত! তুমি তাহা বল, সিদ্ধ বললেন, শ্রীমান গিরিরাজ গোবর্ধন হরির রূপান্তর তার দর্শনমাত্রে মানব কৃতার্থতা লাভ করে। মানব গন্ধমাদন যাত্রায় যে ফল লাভ করে গিরিরাজ গোবর্ধন দর্শনে তার কোটিগুণ বেশি ফল লাভ হয়। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর তপস্যায় যে ফল হে বিপ্র! মানব ক্ষণমাত্রে তা গোবর্ধনে লাভ করতে পারে। মলয়াচলে একভার সুবর্ণ দানে যে ফল গোবর্ধনে একরাত্র বাস করে তাহার কোটি গুণ ফল লাভ হয়। গোবর্ধন পর্বতের মঙ্গল প্রস্থ নামক স্থানে যে ব্যক্তি সুবর্ণ দক্ষিণা দান করে, সে শতপাপযুক্ত হলেও বিষ্ণু সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, আর গিরিরাজের দর্শনে বিষ্ণুপদ লাভ হয়ে থাকে। গিরিরাজের তুল্য পবিত্র অন্য কোনো তীর্থ নাই। এইরূপ ঋষভ পর্বত, কুটক পর্বত ও কোলক পর্বতে যে মানব সুবর্ণ শৃঙ্গযুক্ত কোটি গোদনকের এবং যত্নপূর্বক বিগ্রহগণের পূজা করে তার মহাপুণ্য হয়। হে দ্বিজ! তার লক্ষগুণ পুণ্য গোবর্ধন গিরিতে লাভ হয়ে থাকে। ঋষ্যমূক সহ্য এবং দেবগিরি এমনকি সমস্ত পৃথিবী যাত্রায় যে পুণ্যফল একরাত্র গিরিরাজ গোবর্ধন যাত্রায় তার কোটিগুণ ফল লাভ হয়। গিরিরাজের সমান তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। সুকৃতি মানব শ্রীপর্বতের বিদ্যাধর কুণ্ডে দশবর্ষ স্নান করে শত যজ্ঞের ফল লাভ করে, কিন্তু গোবর্ধনের পুচ্ছ কুণ্ডে, মানব একদিন মাত্র স্নান করে সেই ফল ও কোটি যজ্ঞের পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই।

বেঙ্কট, বারিধার মহেন্দ্র ও বিন্ধ পর্বতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নর ইন্দ্র হয়। আর এই গোবর্ধন পর্বতে যজ্ঞ করে উত্তম দক্ষিণা দানে ইন্দ্র পদ ভোগ করে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। হে দ্বিজোত্তম! শ্রীরামনবমী দিনে চিত্রকুটের পয়স্বিনীতে বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় পারষাত্রে পূর্ণিমায় কুকুর পর্বতে, দ্বাদশী দিনে নীলাচলে এবং সপ্তমীতে ইন্দ্রকালে যে স্নান দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া, ভারতের এইরূপই পুণ্য প্রভাব যে, তৎসমস্ত কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। আর হে দ্বিজ! গোবর্ধন পর্বতে তৎসমস্ত অনন্ত ফলপ্রদ হয়ে থাকে। গোদাবরীতে সিংহরা-শিগত বৃহস্পতিতে, হরিদ্বারে কুম্ভস্থ বৃহস্পতিতে, পুষ্করে পুষ্যানক্ষত্রে, কুরুক্ষেত্রে

সূর্যগ্রহণে, কাশীতে চন্দ্রগ্রহণে, নৈমিষারণ্যে ফাল্গুন মাসে, শুকর তীর্থে একাদশীতে, গণমুক্তিতে কার্তিক মাসে, মথুরায় জন্মাষ্টমীতে, খাণ্ডবে দ্বাদশী দিনে, বটেশ্বর মহাবটে কার্তিকী পূর্ণিমায়, প্রয়াগে মকরার্কে, বহিষ্মতীতে বৈধৃতিযোগে, অযোধ্যার সরযুতীরে শ্রীরামনবমী দিনে, বৈদ্যনাথের শুব বনে চতুর্দশীতে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সোমবারে অমাবস্যায় সেতুবন্ধে দশমী দিনে, শ্রীরঙ্গে সপ্তমী দিনে-হে দ্বিজোত্তম! এ সকল দান, তপ, স্নান, জপ, দেব ও দ্বিজপূজা সমস্তই কোটিগুণ ফলপ্রদ আর ঐ সমস্তের তুল্যফল একমাত্র শ্রীগিরিবর গোবর্ধনের বিশদ গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করে তার কৃষ্ণসারূপ্য লাভ হয়, ইহাতে কোনো সংশয় নাই। সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞফল গোবর্ধনের একমাত্র মানসী গঙ্গার পুণ্যফলের তুল্য নহে। হে দ্বিজ! তুমি সাক্ষাৎ গিরিরাজের দর্শন, স্পর্শন ও তথায় স্নান করিয়াছ, তোমার থেকে ভূতলে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। এই যদি না মান, তবে অত্যন্ত মহাপাপী আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আমি গোবর্ধন প্রস্তর স্পর্শে কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

সপ্তক্রোশ গোবর্ধন পরিক্রমা বা গিরিরাজ পরিক্রমা

রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন, পুছরী ইত্যাদি যে কোনো স্থান হতে যে কোনো সময় পরিক্রমা আরম্ভ করা যায়। প্রথমে গোবর্ধনস্থ দানঘাটী হতে পরিক্রমা শুরু করে রমণরেতী, আনোর গ্রামে সঙ্কর্ষণ কুণ্ড দর্শন, গোবিন্দ কুণ্ড, পুছরীগ্রামে শ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দির, শ্রীলোঠাজী মন্দির, মহুয়া, হরজীকুণ্ড, জতীপুরা গ্রামে মুখারবিন্দ দর্শন, মারকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির, কলাধারী আশ্রম, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গোবর্ধন গ্রামে শ্রীচাকেলেশ্বর মহাদেব জিউ, তথা হতে উদ্ধবকুণ্ড, শ্রীগিরিরাজ মন্দির, শিবখোর, শ্রীকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীরাধাকুণ্ড তটে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, ললিতাকুণ্ড দর্শন, কুসুমসরোবর, হরিগোকুল, মানসীগঙ্গায় মুখারবিন্দ ও শ্রীহরিদেবমন্দির দর্শন, পাপমোচনকুণ্ড তথা হতে দানঘাটীতে শ্রীদানবিহারী মন্দির দর্শন করলে সপ্তক্রোশ গোবর্ধন পরিক্রমা বা গিরিরাজ পরিক্রমা সমাপ্ত হবে।

গোবর্ধন পর্বতের উৎপত্তি

ভারতের পশ্চিম প্রদেশে শাল্মলী দ্বীপ মধ্যে গোবর্ধন দ্রোণ পর্বতে জন্মলাভ করেন। গোবর্ধন জন্মিলে দেবগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ এবং হিমালয় সুমেরু আদি গিরিবরগণ তথায় আগমন করে যথাবিধি গোবর্ধনের পূজা প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ উত্তম স্তব করেছিলেন। শৈলগণ বলিলেন, তুমি স্বয়ং পরিপূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্রের গোপগোপী ও গোগনযুক্ত গোলোকের বৃন্দাবনে গোবর্ধন নামে বিরাজ করিতেছ, তুমিই সম্প্রতি আমাদের সমগ্র গিরি সমাজের রাজা। বৃন্দাবন তোমার ক্রোড়ে বিরাজিত, তুমি গোলোক মুকুট, তোমাকে নমস্কার। হে গোবর্ধন! তুমি পূর্ণব্রহ্মের ছত্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। সন্নন্দ বললেন, অনন্তর শৈলগণ এইরূপে স্তুতি করে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। গোবর্ধন গিরিরাজ নামে অভিহিত হলেন। একদা তীর্থযাত্রী মুনিসত্তম পুলস্ত্য দ্রোণাচল নন্দন শ্যামসুন্দর গিরি গোবর্ধনে আগমন করেন। মহামুনি পুলস্ত্য মাধবীলতা পুষ্প-শোভিত, ফলভার সমাকুল নির্ঝরনাদিত মঙ্গলময় কন্দরশালী, শান্ত, তপোযোগ্য, রত্নময়, শতশৃঙ্গ, মনোহর বিচিত্র

ঋতুরাগরঞ্জিত, সশব্দ পক্ষিপরিবৃত, হরিণ বানরাদি পশুপরিব্যাপ্ত, ময়ুরধ্বনি মণ্ডিত এবং মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদ সেই গোবর্ধন গিরি দর্শন করলেন। মুনিশার্দুল পুলস্ত্য গোবর্ধন গিরির প্রাপ্তি কামনায় তৎপিতা দ্রোণাচল সমীপে গমন করলেন এবং দ্রোণাচল কর্তৃক পূজিত হয়ে পুলস্ত্য বলতে লাগলেন। পুলস্ত্য বললেন, হে গিরি দ্রোণ! তুমি সর্বদেব পূজিত, দিব্য ঔষধিসমন্বিত ও সর্বদা মানবগণের জীবনপ্রদ। আমি কাশীবাসী মহামুনি হইয়াও তোমার সমীপে আসিয়া প্রার্থী হইয়াছি। তোমার তনয় গোবর্ধনকে আমায় দাও। অন্য কোনো প্রার্থনা আমার নাই। দেব দেব বিশ্বেশ্বরের যে কাশীনাম্নী মহাপুরী আছে, সেখানে পাপী মরিয়া সদ্য পরম মুক্তি লাভ করে, যেখানে গঙ্গা আছেন এবং স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তথায় বাস করেন। তথাপি লতাতরু সমাকুল তোমার পুত্র গোবর্ধনকে তথায় স্থাপিত করে আমি সেই স্থানে তপস্যা করিবার অভিলাষ করেছি। সন্নন্দ বললেন, পুলস্ত্যবাক্য শ্রবণে সুত স্নেহবিহ্বল দ্রোণাদ্রির নয়নঅশ্রু দ্বারা আর্দ্র হইল, তিনি মুনিকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বললেন।
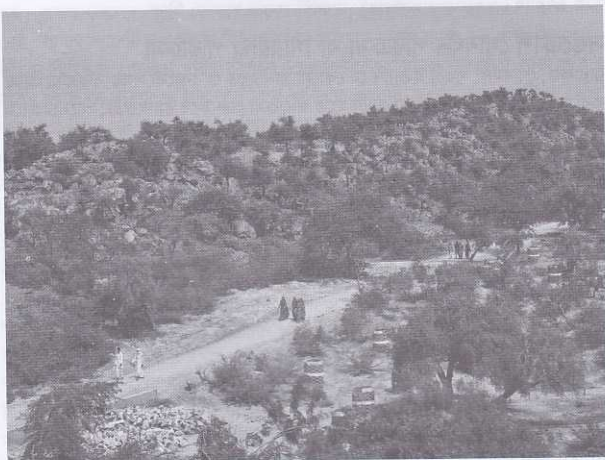
দ্রোণ বললেন, এই পুত্র আমার অতি প্রিয়, তাই আমি পুত্রস্নেহাকুল। তথাপি হে মুনে! আপনার শাপ ভয়ে ভীত হয়ে পুত্রকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি। হে পুত্র! শুভ ভারত কর্মভূমি, তথায় মানবগণ ত্রিভুবন এমনকি সদ্য মুক্তিলাভে সমর্থ, অতএব, তুমি মুনির সহিত ভারতে গমন কর। গোবর্ধন বললেন, আমি অষ্টযোজন দীর্ঘ, পঞ্চযোজন বিস্তৃত ও দুই যোজন উচ্চ, হে মুনে! কেমন করে আমাকে নিয়ে যাবেন। পুলস্ত্য বললেন, হে পুত্র! তুমি স্বচ্ছন্দে আমার হস্তে অবস্থান করে গমন কর, আমি করে (হস্তে) করিয়া তোমাকে কাশী পর্যন্ত নিয়ে যাব।

গোবর্ধন বললেন, হে মুনে! যেতে যেতে ভারবোধ হলে আমাকে যে স্থানে স্থাপন করবে আমি তথায়ই থেকে যাব। সে স্থান হতে আর উত্থিত হবো না। আমার এই প্রতিজ্ঞা। পুলস্ত্য বললেন, শাল্মলী দ্বীপ হতে কোশল দেশ পর্যন্ত তোমাকে হস্ত হতে পথে কোথাও নামাব না। আমারও এই শপথ। সন্নন্দ বললেন, অশ্রুপূর্ণ লোচন মহাবল গোবর্ধন পিতা দ্রোণকে প্রণাম করে মুনিকরতলে আরোহন করিলেন। মুনি মানবগণকে স্বীয় তেজ প্রদর্শন করিতে করিতে গোবর্ধনকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে ধীরে ধীরে যেতে যেতে ব্রজমণ্ডল পর্যন্ত আগমন করলেন। জাতিশ্বর গোবর্ধন পথের মধ্যে চিন্তা করতে করতে মনে মনে বললেন, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই ব্রজে অবতীর্ণ হবেন। হরি এখানে গোপাল বালকদের সহিত বাল্য ও কৈশোর লীলা এবং দান লীলা ও মান লীলা করবেন। অতএব, পবিত্র যমুনা তীরে এই ব্রজভূমি আমি পরিত্যাগ করবো না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে গোলোক হতে এখানে আগমন করবেন। আমি দুর্লভ দর্শন তাহাদিগকে অবলোকন করে কৃত্যকৃত হবো। গোবর্ধন মনে মনে এইরূপ বিচার করে মুনির হস্তে ভূরিভার প্রদান করলেন। তখন ভারপীড়িত মুনি শ্রান্ত ও পূর্ব প্রতিজ্ঞা বিস্তৃত হয়ে কর হতে গোবর্ধনকে অবতরণ করে ব্রজমণ্ডলে স্থাপনপূর্বক নিঃশঙ্ক হয়ে জপাদি নির্বাহার্থ গমন করলেন। মুনিসত্তম পুলস্ত্য শৌচান্তে জলে স্নান করে গিরিবর গোবর্ধনকে বললেন, গাত্রোত্থান কর। ভুরভার গিরিগোবর্ধন উত্থিত হলেন না, মুনি স্বীয় তেজোবলে তাহাকে করদ্বয়ে গ্রহণ করতে উপক্রম করলেন। মুনি কর্তৃক গৃহীত দ্রোণনন্দগণ গিরিরাজ তদীয় বাক্যে অঙ্গুলিমাত্রও চালিত হলেন না। পুলস্ত্য বললেন, হে গিরিবর! গমন কর, গমন কর ও আর ভার দিও না। তুমি রুষ্ট হয়েছো, ইহা আমি জানতে পেরেছি, এখন স্বীয় অভিলাষ আমার নিকট প্রকাশ কর। গোবর্ধন বললেন, হে মুনে! এ বিষয়ে আমার দোষ নাই, আপনিই আমাকে স্থাপন করেছেন আমাকে রেখে দিলে আমি যে আর উত্থিত হব না, এ শপথ আমি পূর্বেই করেছি। সন্নন্দ বললেন, হতোদ্যম মনিশার্দুল পুলস্ত্যের ক্রোধে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিচলিত হলো, তিনি ওষ্ঠ কম্পিত করে দ্রোণতনয়কে অভিশপ্ত করলেন। পুলস্ত্য বললেন, হে গিরি! তুমি অত্যন্ত ধৃষ্টতা করে আমার মনোরথ পূর্ণ করলে না; অতএব, প্রতিদিন এক এক তিল করে ক্ষয়প্রাপ্ত হও। সন্নন্দ বললেন, হে নন্দ! পুলস্ত্য এইরূপ বলে কাশী চলে গেল। এই গোবর্ধন গিরি প্রতিদিন এক তিল করে ক্ষীণ হতে লাগলেন। যে যাবৎকাল পর্যন্ত ভূতলে ভাগীরথী গঙ্গা ও গোবর্ধন গিরি বিদ্যমান থাকবেন, সে পর্যন্ত কলির প্রভাব কুত্রাপি হবে না। হে নন্দ! গোবর্ধন পর্বতের উৎপত্তি কথা ও পবিত্র চরিত্র মর্ত্যে মানবগণের মহাপাপ হর। এই মনোজ্ঞ উত্তম মুক্তিপ্রদ বিচিত্র কথা আপনার সমীপে বর্ণন করলাম, ইহা আশ্চর্য মনে করবেন না।

বি.দ্র.

প্রতিবছর মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রচলিত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হয়ে থাকে। বারোটি বন, চব্বিশটি উপবন, পাঁচটি পর্বত নিয়ে গড়া তথা মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, বরসানা, গোবর্ধন, বলদেও, নন্দগাঁও অর্থাৎ ৮৪ ক্রোশ বন পরিক্রমা (২৬৯ কি.মি.) করা হয়।

কুসুম সরোবর

এই সরোবরের শোভা অতি মনোরম। এই সরোবরের তীরে শ্রীমতি রাধারাণী সখীগণ সঙ্গে কুসুম চয়ন করেন।

মানস গঙ্গা

গোবর্ধন গ্রামের মধ্যস্থলে মানসী গঙ্গা অবস্থিত। এক সময় কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীনন্দাদি গোপগণ, যশোদা মাতা গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে করে ভাগীরথী গঙ্গায় স্নান করবার জন্য যাত্রা করলেন। নন্দগ্রাম হতে চলতে চলতে গোবর্ধন সমীপে উপস্থিত হলে সন্ধ্যা হলে তখন রাত্রি অতিবাহিত করবার জন্য গোবর্ধন তটে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, "ব্রজভূমি মহিমায় আকৃষ্টচিত্ত হয়ে এই ব্রজে নিখিল তীর্থসকল বিরাজ করতেছে। কিন্তু ব্রজবাসীগণ এই ভূমির মহিমা আদৌ অবগত নয়, সুতরাং আমার ইহার সমাধান করতে হবে।" শ্রীকৃষ্ণের মনে গঙ্গাদেবী স্মরণ মাত্র গঙ্গাদেবী এই স্থানে জলাশয় সৃষ্টি করে স্বরূপ ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্তুতি করতে লাগলেন। সেইজন্য এই জলাশয়ের নাম মানসীগঙ্গা হয়েছে। প্রভাতে ব্রজবাসীগণ সহসা গঙ্গাদেবীর এই স্থানে আবির্ভাব দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পরস্পর নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদেরকে বলতে লাগলেন যে, ব্রজভূমিকে সেবা করবার জন্য ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থই এসে বিরাজ করতেছেন। আপনারা গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত ব্রজের বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছেন, ইহা বুঝতে পেরে পতিত পাবনী মা গঙ্গা আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। অতএব, আপনারা অতিসত্বর গঙ্গাদেবীর পবিত্র জলে স্নানকার্য সুসম্পন্ন করুন। হে গোপগণ! আজ হতে এই তীর্থ শ্রীমানসীগঙ্গা নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। এই কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিকে স্মরণ করবার জন্য আজ পর্যন্ত এই স্থানে প্রতি বছর দীপাবলী পর্ব উপলক্ষে শ্রীমানসীগঙ্গা স্নান, গোবর্ধন পরিক্রমা, অন্নকূট মহোৎসব, গোবর্ধন পূজা হয়ে থাকে।

চাকলেশ্বর শিব

মানসীগঙ্গার উত্তর তীরে চাকলেশ্বর শিব অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে নন্দাদি গোপগণ দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে শ্রীগিরিরাজের পূজা আরম্ভ করলে দেবরাজ ইন্দ্র তৎশ্রবণে ক্রোধান্বিত হয়ে ব্রজে ঘোরতর বৃষ্টি শুরু করলেন। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদেরকে বৃষ্টির জল হতে রক্ষা করবার জন্য শ্রীগিরিরাজ পর্বতকে (শ্রীনারায়ণী শক্তি দ্বারা) বামহস্তে ধারণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে তখন সুদর্শনচক্র গিরিরাজের উপরে চালিত হয়ে সমস্ত বৃষ্টি কণাকে শোষণ করতে লাগলেন। তখন সেই পর্বতের তলদেশে রাশি রাশি বৃষ্টির জল আসতে দেখে ভগবান সুদর্শন ও শেষ নাগ অনন্তকে আদেশ করলেন। হে মৈথিল! অগস্ত যেমন সার পান করছিলেন তদ্রুপ কোটি দিবাকরক্রান্তি সুদর্শনচক্র পর্বতের উর্দ্ধে ধারণাকারে পতিত মেঘজল পান করলেন, আর শেষনাগ স্বদেহ কুণ্ডলী করে তলদেশ উপবেশন পূর্বক বেলা যেরূপ সাগর জল অবরোধ করে, সেইরূপ বর্ষণজল রোধ করে রইলেন। দেবরাজ সাতদিন যাবৎ বৃষ্টি প্রবাহের পরও যখন ব্রজবাসীদেরকে কোনো প্রকার অনিষ্ট সাধন করতে পারলেন না তখন বৃষ্টি ধারা বন্ধ

করে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে স্তুতি করেছিলেন। বৃষ্টি ধারা বন্ধ হলে এই স্থানে সুদর্শনচক্র ভগবানের (চতুর্ভুজ নারায়ণের) হস্তে স্থাপিত হয়, সেইস্থানের নাম চক্রতীর্থ বলে জগতে প্রসিদ্ধ। কৈলাশাধিপতি শ্রীমহাদেব শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা দর্শন করবার জন্য এই স্থানে আগমন করেছিলেন, এবং এই গিরিরাজধারণ লীলা দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁহার এই স্থানে আগমনের জন্য এই স্থানের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের নাম হয় শ্রীচক্রেশ্বর মহাদেব। কালে কালে চাকলেশ্বর মহাদেব নাম হয়। শ্রীবজ্রনাভ কর্তৃক এই মহাদেবজীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরে বর্তমানে শ্রীমহাদেব, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ এবং বৃষের বিগ্রহ দর্শনীয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীবল্লভাচার্য এই স্থানে আগমন করেছিলেন এবং মন্দিরের পাশেই তাঁহাদের উপবেশন স্থান দর্শনীয়।

দানঘাট

গোবর্ধন পর্বতের উপরে দানঘাট অবস্থিত। এই দানঘাটে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারাণীর সঙ্গে দানলীলাকালে মিলিত হয়েছেন।

গোবিন্দ কুণ্ড

ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ইন্দ্রপূজা না করে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন পূজার অনুষ্ঠান করেছেন শুনে দেবরাজ সপ্তাহব্যাপী মুষলধারে প্রলয়কালীন শিলাবৃষ্টি ও নানাবিধ শক্তি প্রয়োগ করেও যখন অকৃতকার্য হলেন তখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু ও ভগবান বলে স্বীকার করলেন। তখন স্বীয় অপরাধ হতে মুক্ত হবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হন এবং এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে নানা তীর্থের জলে অভিষেক করে গোবিন্দ নাম প্রদান করেছিলেন। এই কুণ্ডের পূর্বদিকে গোবিন্দ মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি বিরাজিত। এই স্থানে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী ভজন করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক রূপ ধারণ করে দুগ্ধ দান করেছিলেন।

উদ্ধবকুণ্ড

এই কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ সোপান শ্রেণি বিবিধ মণি সমূহের দ্বারা নিবদ্ধ এবং এই কুণ্ডের তীরে সতত ভক্তগণ বাস করতেছেন। এই কুণ্ডের জলে আচমন করলে সকল প্রকার পাপ-তাপ এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে যায়।

স্বামী নারায়ণ মন্দির অক্ষরধাম

১০০ একর জমি নিয়ে গড়া স্বামী নারায়ণ অক্ষরধামটি দিল্লি ভ্রমণের নবমতম আকর্ষণ। যমুনা কিনারে মনোরম পরিবেশে ভগবান স্বামী নারায়ণের স্মরণে ১৪১ ফুট উচ্চ, ৩১৬ ফুট চওড়া, ৩৫৬ ফুট দীর্ঘ এবং ৯ অনিন্দ্যসুন্দর গম্বুজ, ২০টি চুড়োর গোলাপী পাথরের মন্দির জুড়ে কুড়ি হাজারের বেশি অপূর্ব ভাস্কর্য মূর্ত হয়েছে। মন্দির ঘিরে ১০টি কারুকার্যময় প্রবেশপথ, মণ্ডপ, প্রদর্শন কক্ষ, স্বামী নারায়ণের পদছাপ, মিউজিক্যাল ফাউন্টেন, উদ্যান, জায়েন্ট স্ক্রিন থিয়েটার, বোট রাইট-এর নানান আয়োজন করা হয়েছে।

আরো দর্শনীয় স্থানসমূহ-জে.কে. টেম্পল, কানপুর ইস্‌কন মন্দির, বিঠুর, বিন্ধ্যাচল, কাশম্ভরী তীর্থ, কনক ভবন, গুপ্তারঘাট, কুশীনগর, বৌদ্ধতীর্থ ইত্যাদি।

দিল্লি

অতীত আর বর্তমান ভারতের প্রতীক দিল্লি। হাজার তিনেক বছর বয়স হবে দিল্লি নগরীর। খ্রিষ্টজন্মেরও ১০০০ বছর আগে থেকে ৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মহাভারতের পাণ্ডবরা রাজত্ব করে গেছেন আরাবল্লী রেঞ্জের বুকে পুরানো দিল্লির কাছে যমুনা কিনারের এই দিল্লিতে। তখন নাম ছিল তার ইন্দ্রপ্রস্ত। অবস্থানও ছিল আজকের পুরানো কেল্লাকে ঘিরে।

আগ্রা

যমুনার পশ্চিম পুলিনে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরের লীলাক্ষেত্র দ্বাদশ বনের অন্যতম অগ্রবন তথা মোগল বাদশার আকবরাবাদ উত্তরকালের আগ্রা আজ তাজের জন্য বিখ্যাত। মহাভারতের সংস্কৃতের পীঠস্থান বলে উল্লেখিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরের দ্বাদশ লীলাক্ষেত্রের অন্যতম হিন্দু রাজাদের অগ্রবন অর্থাৎ আগ্রা। তারও আগে আর্যগৃহ নাম ছিল আগ্রার।

আগ্রার তাজমহল দর্শন

মোঘল সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি তাজ সৃষ্টি। সম্রাট তার প্রধানা বেগম মমতাজের সমাধির উপর তৈরি করেন প্রেমের এই সৌধ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দোপারসিক স্থাপত্যে গড়া শ্বেতমর্মরের তাজ আজ ভুবন বিখ্যাত। দেশ বিদেশ থেকে পর্যটক আসেন
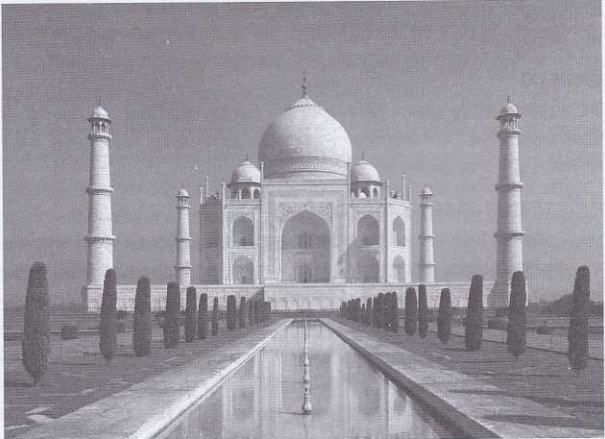
তাজ দেখতে বছরজুড়ে। কোজাগরী (শারদ) পূর্ণিমাতে (আশ্বিন/অক্টোবর) বা শীতে তাজ যেন সজীব হয়ে ওঠে, দর্শনার্থীদের ভিড়ও বাড়ে তাজ দেখার জন্য পূর্ণিমার রাতে। নক্ষত্র আলোকিত রাতে চন্দ্রালোকে বা ঊষাকালে তাজের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে দর্শককে। ক্ষণে ক্ষণে রঙেরও বদল ঘটে ঊষাকালে। দুগ্ধধবল রূপালি রং নেয় ঊষায়, রূপালি থেকে গোলাপি-লালে। চাঁদের আলোয় মনে হবে পরীর দেশের জাহাজ ভাসছে যমুনার জলে, আর বিদায়ী চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় তাজকে মনে হবে চলমান। সূর্যাস্তে সোনা রং ধরে তাজ। স্বর্গসম তাজের এই সুষমা মোহিত করে দর্শককে। তাজ দর্শন- দিনের বেলায় (৬- ১৭-৩০) ২০ পূর্ণিমার রাতে (পূর্ণিমার দিন ও পূর্ণিমার আগে-পরের ২ দিন। মোট ৫ দিন; ২০-৩০ থেকে আধ ঘণ্টা ছাড়া ৮টি ব্যাচে) ৫১০। পূর্বের লাল বেলেপাথরের গেস্ট প্যাভিলিয়ন থেকে সূর্যোদয়ে আর পশ্চিমের মসজিদ থেকে সূর্যাস্তে তাজকে সুন্দর দেখায়। তেমনই মৌসুমে তাজের যেন রূপ বাড়ে। তাজের বর্তমান বয়স ৩৫০ বছর ছাড়িয়ে গেছে।

লোটাস টেম্পল

দিল্লির লোটাস মন্দির হলো বাহাই ধর্মে বিশ্বাসী একাত্ম মানুষদের জন্য ধর্মাচরণের একটি জায়গা, এটি বিশ্বের সবচেয়ে এক অন্যতম সর্বাধিক পরিদর্শনীয় স্থাপত্য বিস্ময়।। বাহাই হলো বিশ্বের নবীনতম ধর্ম। লোটাস মন্দিরটি বাহাই ধর্মবিশ্বাসীদের আড়ম্বরতার মধ্যদিয়ে তার নকশার মাধ্যমে তাদের সুন্দর সরলতাকে তুলে ধরার জন্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। নকশাটি যদিও তার নিজস্বতাতেই মহীয়ান হয়ে উঠেছে, তবে আড়ম্বরপূর্ণ সুশোভিতকরণের এক সতেজ প্রদর্শিত হয়। নবীনতা এবং বাহাই বিদ্যালয়ের চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে। লোটাস মন্দির ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে তাল মিলিয়েই পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা তার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভূতির প্রতিফলনে লক্ষ করা যায়। মন্দিরের প্রধান স্থাপত্যশিল্পী ছিলেন ফেরীবোর্জ সাহবা। মন্দিরটির নকশার আসন্ন ধারণার সময় সাহবা কয়েকটি জিনিস মাথায় রেখেছিলেন–মন্দির পরিদর্শনে, তার ব্যবহৃত প্রতীকগুলো ভারতীয় মানুষদের নিকট যেন পরিচিত হয়, এটি কোনো বিদ্যমান ইমারতের অনুকরণের মতো দেখতে না হয় এবং চিত্রাবলী, শৈলী এবং প্রতীকি যেন বাহাই বিশ্বাস সম্পর্কে একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে। যদিও তার এই কার্যোদ্ধার বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল এবং তেমনি এক উত্তেজনাকর ফলাফল হয়েছিল, যার ফলে সাহবার সমকালীন এটি এক বিস্ময়কর হিসেবে প্রশংসিত হয়। বহু যুগ ধরে পদ্মফুল ভারতীয়দের কাছে পবিত্ররূপে গৃহীত হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে এবং গৌতম বুদ্ধের জীবনীতে এটি ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া গেছে। অনেক ভারতীয় ভাষায় পদ্মফুল পঙ্কজ নামে সুপরিচিত। এর অর্থ হলো যা পঙ্কিল জল বা পাঁকে জন্মায় এবং তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ ও অকলুষিত থাকে। ভারতীয় পুরাণে পদ্মফুল হলো সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর ব্রহ্মার আসনস্থান। তাই ফুলটিকে সৃজনশীলতা ও অমরত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এছাড়াও পদ্মফুলের শিল্পপ্রতীক বা মোটিফ জরাথুস্ত্রীয় (পার্সি) স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়। পদ্মফুল ভারতজুড়ে বিভিন্ন
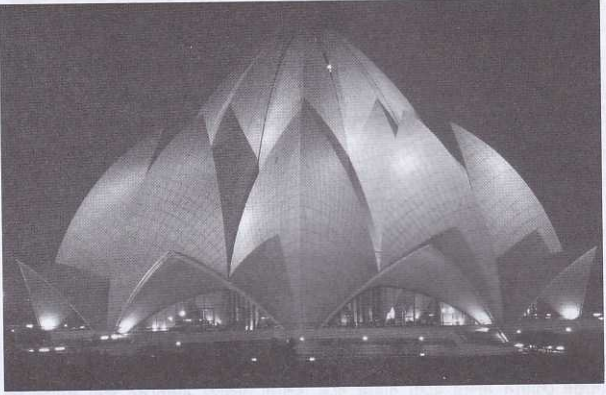
স্থাপত্যশৈলীর মধ্যে আবৃত মোটিফ হওয়ার দরুণ স্থপতিবিদরা তাদের মূল নকশা হিসেবে পদ্মফুলকে বেছে নিয়েছে। পরিকাঠামোটি তিনটি স্তরের, প্রত্যেকটিতে ৯টি করে মোট ২৭টি পদ্মফুলের পাঁপড়ির ন্যায় সমন্বয়ে গঠিত। বহির্ভাগের পাঁপড়িগুলো আসমানি আলো হিসেবে কাজ করে এবং মৃদু ব্যাপ্ত আলো ছড়ায়। জলের উপর ভাসমান পদ্মফুলের প্রভাব প্রতিভাত করার জন্য নয়টি পুকুর লোটাস মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে। রাতের বেলায় উজ্জ্বল কৃত্রিম বহিঃস্থ আলো পদ্মফুলের পাঁপড়ির বাইরের প্রান্তগুলো উদ্ভাসিত করে তোলে, অন্যদিকে ভেতরটিকে আলোকিত করার জন্য স্ফীত মৃদু আলো ব্যবহৃত হয়। এইভাবে একটি পদ্মফুলের ছাপ সম্পূর্ণ করা হয়। পাঁপড়ি পৃষ্ঠগুলো মার্বেল দ্বারা আবৃত, যেগুলো গ্রিসের পেন্টেল্যি পর্বত থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এটি ১৯৮৬ সালে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে প্রবেশের কোনো প্রবেশমুল্য লাগে না। এখানকার প্রাঙ্গণটি নির্মল, পরিচ্ছন্ন ও খুব সুন্দর দর্শনীয়। স্বাভাবিকভাবে লোটাস মন্দির ভারতের রাজধানীতে মানুষদের অবশ্য পরিভ্রমণমূলক স্থানগুলোর মধ্যে উচ্চ স্থানে রয়েছে। সারা বিশ্বে পূজার্চনার আরো ছয়টি বাহাই স্থান রয়েছে। যথা- আপিয়া (পশ্চিম সামোয়া সিডনি (অস্ট্রেলিয়া), কামপাল (উগান্ডা), পানামা সিটি (পানামা), ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানি), এবং উইলমেট্যে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। ঠিকানা- লোটাস টেম্পল রোড, শম্ভু দয়াল বাগ, বাহাপুর, নতুন দিল্লি-১১০০১৯। সোমবার বন্ধ থাকে। লোটাস মন্দিরের নিকটে আরো দর্শনীয় স্থানগুলো হচ্ছে- অক্ষরধাম মন্দির, কনট প্লেস, ভৈরোঁ মন্দির, কালকাজী দেবী মন্দির, বালাজী হনুমান মন্দির ইত্যাদি।

জাতীয় মিউজিয়াম

১৯৫৫ শতকে জওহরলাল নেহরুর হাতে ভিত্তিপ্রস্তর করে ১৯৬৫ শতকে সম্পূর্ণতা পেয়ে প্রদর্শন শুরু হয়। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, লোথাল, কালিবঙ্গান ছাড়াও অতীত দিনের অনেক সংগ্রহ স্থান পেয়েছে এই মিউজিয়ামে। পাঁচ হাজার বছরের অতীত প্রদর্শিত হয়েছে এখানে। সিন্ধুসভ্যতা, ব্রাহ্মণ্যকাল, জৈন ও বুদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শনও রয়েছে মিউজিয়ামে। ম্যুরাল মিনিয়েচার ধর্মী রঙিন চিত্রকলার সংগ্রহও উল্লেখ্য। মোগল, রাজপুত, ডেকান ও পাহাড়ি শৈলীর ছবির সম্ভার দেখার মতো। এছাড়াও গীতগোবিন্দ, সুন্দর অলঙ্কৃত মহাভারত, সোনালী হরফের ভগবদ্গীতা, অষ্টকোণী ক্ষুদে কোরান, বাবরের হাতে লেখা দিনপঞ্জি, তিন শতেরও অধিক বিভিন্নধর্মী বাদ্যযন্ত্র, নানা ধরনের উপজাতীয় পোশাক মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইন্দিরা স্মারক মিউজিয়াম

১নং সফদরজং রোডের বাড়িতে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার স্মৃতিতে আরেক জাতীয় মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে ২৭ মে ১৯৮৫ শতকে। দেহরক্ষীর গুলিতে এই বাড়িতেই ইন্দিরা গান্ধী মৃত্যুবরণ করেন ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৪ শতকে। কাচের আঁধারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে জায়গাটি। আর হয়েছে গুলিবিদ্ধ হবার আগের মুহূর্তে হেঁটে আসা বাগিচাপথে চেক সরকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি ইস্পাতের পাতে স্ফটিক দিয়ে গড়া ৩৩ গুণ ২৫ মিটারের কৃত্রিম এক জলপ্রবাহ। তৈরিও এটি চেক স্থপতি জারোস্লাভ মিরিচের।

ইন্ডিয়া গেট

১৯৩১ শতকে তৈরি ৪২ মিটার উঁচু ইন্ডিয়া গেট বা ভারত তোরণ। ব্রিটিশের পক্ষে মিত্রশক্তির হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধে (১৯১৯) নিহত ব্রিটিশ ও ভারতীয় ৯০,০০০ সেনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি ওয়ার মেমোরিয়াল আর্চ নামও খোদিত হয়েছে ১৩,৫১৬ সেনার। কার্নিসের নিচে সূর্য দুপাশে খোদিত। খাল কেটে জলপথে সংযোগ ঘটেছে মহাকরণ পর্যন্ত। নৌকা বিহারের ব্যবস্থাও আছে। আলোকোজ্জ্বল এই তোরণটি রাতের বেলায় সুন্দর দেখায়।

রাষ্ট্রপতি ভবন

Sir Edwin Lutyens-এর নকশায় মোঘল ও পাশ্চাত্য ধারায় ব্রিটিশ ভাইস রিগ্যাল Lord Hardinge-এর বাসভূমি রূপে নিজ বাসভূমের আদলে ১৯২১-২৯ শতকে তৈরি। এইচ হরফের আকারে ধূসর আকাশি রঙা তাম্রনির্মিত মূল গম্বুজটি সাচীর বৌদ্ধ স্তূপধর্মী, অলিন্দগ হয়েছে হিন্দু মন্দিরের ঢঙ্গে। বাড়িটিতে হাসপাতাল বসার সাধ জাগলেও অপূর্ণ থাকে গান্ধীজির সে বাসনা। রঙ-বেরঙের মর্মরে ২৩ মিটার ব্যাসের

দরবার হল, অশোক হল সর্বদাই ব্যস্ত রাষ্ট্রপতির নানা অনুষ্ঠানে। প্রবেশ ফটকের পূর্বে জয়পুর মহারাজার দান ১৪ মি. উঁচু জয়পুর ধামটি যেন আকাশ ছুঁতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

পার্লামেন্ট ভবন

সদস্যের কাউন্সিল স্টেটস বা রাজ্যসভা ও জনগণের ভোটে পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচিত ৫৪৩ সদস্যের পিপলস হাউজ অর্থাৎ লোকসভা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা এবং কানাডা সরকারের দান ডমিনিয়ন কলামস চারটিও মহিমান্বিত করেছে পরিবেশকে।

উত্তরাখণ্ড প্রদেশ

উত্তরাখণ্ডের পূর্বকথা

উত্তরাখণ্ড সংঘর্ষ সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতি উত্তরাঞ্চল ৯ নভেম্বর, ২০০০ সালে উত্তর প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হলো উত্তরাঞ্চল রাজ্য। আর ২৮ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে সরকারি আদেশবলে রাজ্যের নাম বদলে উত্তরাঞ্চল উত্তরাখণ্ড হয়। রাজধানী ৬৯০ মিটার উঁচু সেনোট্যাফের উপত্যকা অর্থাৎ দেরাদুন। রাজ্যটি মূলত পাহাড়ি হিমালয়ের পাদদেশে অতীতের উত্তর প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমতলের উধম সিং নগর ও ১৩টি পাহাড়ি জেলা দেরাদুন, উত্তরকাশি, তেহরি গাড়োয়াল, রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলী, হরিদ্বার, উধম সিং নগর, পাউরি গারোয়াল, বাগেশ্বর, পিথোরাগড়, আলমোড়া, নৈনীতাল, চম্পাবত নিয়ে গড়া ২৭তম রাজ্য উত্তরাখণ্ড। আয়তনে ছোট হলেও উত্তরাখণ্ডের পর্যটন শিল্প যথেষ্ট মহিমামণ্ডিত। এমনকি মর্ত্যভূমের স্বর্গও বলে থাকেন গারোয়াল হিমালয়কে নানা জনে। সেকালে দেবতাদের বাসও ছিল গারোয়াল হিমালয়ে। সাধুসন্তের লীলাভূমি তথা পর্যটকদের নয়নের মণি হৃষিকেশ ও হরিদ্বার উত্তরাখণ্ডের দুই পুণ্যভূমি। উত্তরাখণ্ডের প্রবেশদ্বার এই হরিদ্বার। হিন্দুধর্মের চারধাম কেদার-বদরী-গঙ্গোনেত্রী-যমুনেত্রীর অবস্থান মহীয়ান করে তুলেছে উত্তরাখণ্ডকে।

হরিদ্বার

কাশী কাঞ্চী চ মায়াখ্যাত্বযোধ্যা দ্বারত্যপি।
মথুরাবন্তিকাচৈতাঃ সপ্ত পুর্যোহত্র মোক্ষদা ॥

কাশী, কাঞ্চী, মায়া অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা এবং অবন্তিকা এই সাতটি পুরী মোক্ষদায়িনী। হরি ও হরের সহাবস্থান ঘটেছে হরিদ্বারে। পুরাণ উল্লেখিত মায়াপুরী আজকের হরিদ্বার পবিত্র হিন্দু তীর্থ। আরও অতীতে কপিলাস্থান নাম ছিল হরিদ্বারের।

সপ্তপুরীরও অন্যতম হরিদ্বার। গঙ্গা হরিদ্বারের মূল আকর্ষণ। নামও ছিল অতীতে গঙ্গাদ্বার, মোক্ষদ্বার, তপোবন। পাহাড় থেকে গঙ্গা নামছে সমতলে হরিদ্বারের হরি-কি-পাউরি ঘাটে। ২০০০ কি.মি. পরিক্রমা সেরে লীন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাগরে। স্নানে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। গঙ্গাজলে ব্রহ্মাণ্ডের সব পাপ ধুয়েমুছে যায়। মূল গঙ্গার প্রবাহও বদল হয়েছে।

শহরের উত্তরে ভীম গদায় বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম স্রোত তৈরি হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন হরি-কি-পাউরি বরাবর ৩ কি.মি. দূরে যা ধর্মার্থী ও পুণ্যার্থীর পরম প্রাপ্তি। স্নানও করেছেন

দিনরাত্রি জুড়ে। লৌহ শিকল ধরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। তবে, দশেরা থেকে দেওয়ালী সংস্কার চলে গঙ্গার–জলপ্রবাহও বন্ধ থাকে হরি-কি-পাউরির গঙ্গায়। মন্দির হয়েছে গঙ্গা মাতার। এছাড়াও দেবতা রয়েছে শতসহস্র। এমনকি বিষ্ণুর পদচিহ্ন অর্থাৎ হরি-কি-পাউরি রয়েছে ঘাটে। ক্লক টাওয়ারও রয়েছে ঘাটে। কিংবদন্তি, বৈশাখ মাসে ১৩ তারিখে জয়ন্ত-বাহিত কুম্ভের অমৃত পড়ে হরি-কি-পাউরি ব্রহ্মাকুণ্ডে। ওই বিশেষ দিনে স্নান করলে পুনর্জন্ম হয় না। কুশবর্ষ ঘাটে পিণ্ডদানের আত্মার মোক্ষপ্রাপ্তি মেলে। জনশ্রুতি আছে যে, মুনি দত্তাত্রেয় এখানে হাজার বছর ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। বিষ্ণুর তপস্যার স্থল বিষ্ণু ঘাটও আরেক পুণ্যতীর্থ। ১২ বছর অন্তর অন্তর কুম্ভ মেলাও বসে হরিদ্বারে। আর ৬ বছর অন্তর বসে অর্ধ কুম্ভ। ২০১০ শতকের পর আগামী কুম্ভ স্নান ২০২২ শতকে। ১৯৮৬ শতকের কুম্ভে ব্যাপক নিরাপত্তা সত্ত্বেও এক অঘটনে ৫০ যাত্রী পদদলিত, ১২ জনের অধিক জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু হয় হরিদ্বারে। আবার হর অর্থাৎ মহাদেবের মহিমার অন্ত নেই সারা গারোয়াল হিমালয়ে। সে কারণে হর-দ্বারও বলেন নানা জনে হরিদ্বারকে। বিশাল মূর্তি হচ্ছে ঘাটে দেবাদিদেব মহাদেবের। পূর্বে চণ্ডি পাহাড়, পশ্চিমে মনসা পাহাড় এরই মাঝে হরি-কি-পাউরিকে কেন্দ্র করে শহরও গড়েছে গঙ্গার পশ্চিমে হরিদ্বারে। ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশপানে চাইতেই দেখবেন বিল্ব পর্বতের

এক টিলার টঙ্গে শ্বেতশুভ্র শিখর শিরে মনসাদেবীর মন্দির। দুর্গারই প্রতিরূপ শক্তিরূপিণী দেবী মনসা। দেবী দর্শনের সাথে গঙ্গারও সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। মনস্কামনা পূরণের জন্য দড়ি বাঁধার প্রথাও আছে মন্দিরে। টাঙা কিছুটা পথ এগিয়ে দেয়, বাকিটা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তবে, আপার রোড থেকে উড়ান খাটালা অর্থাৎ রোপওয়ে চড়েও চলা যায় মনসা মন্দিরে। ১৭৫ মি. উঁচুতে ৬০০ মি. দীর্ঘ রোপওয়ে ৮-৩০ থেকে ১৮-০০ টায় চলে। বিকালে গঙ্গার ঘাটে আনন্দধারায় অবগাহন, দুদণ্ডের তরে শান্তিও মেলে.... সূর্যাস্তে দেখুন হরি-কি-পাউরি ঘাটে গঙ্গারতি। ছয়জন পুরোহিত একসঙ্গে ১০০৮ প্রদীপের গঙ্গারতি করেন। সেই সঙ্গে ভজন...............জয় জয় গঙ্গে মাতা....। প্রত্যুষে দুধ, সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিন মা গঙ্গাকে। দুলকি চালে ভেসে চলে হাজার হাজার সন্ধ্যাপ্রদীপ গঙ্গায়। শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহমানা শীর্ণকায়া মূল গঙ্গা, স্থানীয়দের নীলধারার অপর পাড়ে ৬ কি.মি. পূর্বে নীল পর্বতের চুড়োয় চণ্ডী মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন পায়ে পায়ে পাহাড়ে চড়ে বা ৩৫ টাকার রোপওয়ে । গোলচক থেকে শেয়ারে অটো যাচ্ছে রোপওয়ে স্টেশনে। নীলপাহাড় থেকে লালদিওয়ালা ড্যামটিও দৃশ্যমান। আর বসে শীতে পরিযায়ী পাখিদের মেলা নীলধারা পক্ষীবিহার।

মনসাদেবীর মন্দির

দুর্গারই প্রতিরূপ শক্তিরূপিণী দেবী মা মনসা। মনস্কামনা পূরণে দড়ি বাঁধার প্রথা আছে এখানে। ১৭৫ মিটার উঁচু পাহাড়ে ৬০০ মিটার দীর্ঘ রোপওয়ে চড়ে মন্দির দর্শনে যেতে হয়।

কনখল

কনখল অতি প্রাচীন তীর্থস্থান। হরিদ্বারের এক মাইল দক্ষিণে ও গঙ্গার পশ্চিম কুলে অবস্থিত। অপর পাড়ে গাছপালা, লতাপাতা সমন্বিত হিমালয়স্থিত সবুজবর্ণের নীল পর্বত। পাদদেশে পতিতপাবনী গঙ্গার একটি শাখা নীলধারা নামে হর হর শব্দে প্রবাহিত। হিমালয়ের শান্ত ও নিস্তব্ধ ভাবের মধ্যেও ঐ ধ্বনি অহর্নিশ পরব্রহ্মকে স্মরণ করে দেয়। পর্বতশিখরে চণ্ডী ও অঞ্জনা দেবীর মন্দির। কনখল হিমালয়ের পাদদেশে। মুনি-ঋষিদের প্রাচীনতম তপোভূমি। এখনও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এই পবিত্র স্থানে তপস্যাদি করে আপ্তকাম হচ্ছেন। রাস্তাঘাটে ও আস্তানায় সাধু-সন্ন্যাসীরা 'ওঁ নমো নারায়ণায়' উচ্চারণে পরস্পরকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে থাকেন। প্রত্যেকেই নারায়ণের স্বরূপ এই জ্ঞানে অভিবাদন করা হয়। এই কনখলে প্রজাপতি দক্ষের রাজপুরী ছিল। দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির ও সতীকুণ্ড এই স্থানের প্রধান তীর্থ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, এই দক্ষঘাটে বা গঙ্গায় অবগাহন করলে তত্ত্বজ্ঞান এবং দক্ষেশ্বর শিবের দর্শন ও পূজাদি লাভ করলে মুক্তিলাভ হয়।

এক সময় কয়েকজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দক্ষেশ্বরে শাস্ত্রাদি আলোচনা করতেছেন, এমন সময় ধর্মকেতু নামে জৈনিক খল, ব্যক্তি পণ্ডিতদের অর্থাদি অপহরণ মানসে সেখানে আসে। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ করে তাহার চৈতন্য হয়। নিজকৃত অপকর্মের অনুশোচনায়

দগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণদের নিকট করজোড়ে প্রার্থনাপূর্বক বলল, 'হে পণ্ডিতগণ, আমি একজন দুশ্চরিত্র হীনপ্রবৃত্তি নরাধম। কি উপায়ে আমার সদগতি হবে বলে দিন।' তাঁহারা বললেন, 'এই দক্ষঘাটের গঙ্গায় অবগাহন করে শিবের অর্চনা কর, তা হলেই তোমার সর্বপাপ দূরীভূত হবে ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে।' তখন সেই কনখলে অবস্থান ও গঙ্গাস্নানে মুক্তিলাভ করলেন। সেই থেকে মুনিশ্রেষ্ঠগণ এই স্থানের নাম কনখল রেখেছেন। কনখল তীর্থে স্নান করলে পুনর্জন্ম হয় না। কনখলে গঙ্গা অতি পবিত্র।

দক্ষ প্রজাপতি মন্দির (কনখল) বা দক্ষ যজ্ঞস্থল দর্শন

ব্রহ্মার পুত্র রাজা দক্ষ যজ্ঞ করেন কনখলের দক্ষ প্রজাপতি মন্দিরে। জামাতা শিব নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত। শিবের পত্নী দক্ষকন্যা সতী আসেন যজ্ঞে। পিতা কর্তৃক পতি নিন্দায় সতীকুণ্ড স্থানে দেহত্যাগ করেন দক্ষকন্যা সতী ক্রুদ্ধ শিব! তারই ক্রোধ থেকে জন্ম বীরভদ্র পণ্ড করেন দক্ষের যজ্ঞ–মস্তকও ছিন্ন করেন দক্ষের। ক্রোধোন্মত্ত শিবকে শান্ত করতে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে খণ্ডিত করেন সতীর দেহ। ৫১ টুকরা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশময় যা একান্ন সতীপীঠ নামে খ্যাত। আর দেব প্রশংসায় তুষ্ট শিব ছাগলের মাথা জুড়ে দেন দক্ষের ঘাড়ে। অদূরে সুন্দর বাগিচার মাঝে হরিহর আশ্রমে পারদের শিবলিঙ্গ। জনশ্রুতি আছে যে, কনখলে স্নান ও উপবাস করে তিন দিন-রাতের বাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়।

হৃষীকেশ মুখী আশ্রম মার্গে ৫ কি. মি. দূর উত্তরে পবনধামে হিন্দু পুরাণের দেবদেবীরা মূর্ত হয়েছেন। ভূমা নিকেতনে মূর্তিতে পৌরাণিক আখ্যান ছাড়াও সজীব মডেলে রামায়ণ-মহাভারত আখ্যান রয়েছে। আর অল্প কিছুদূরে ভারতমাতা মন্দিরে ৮তলায় ছবি ও মূর্তিতে হিন্দু পুরাণের দেবদেবী, মুনি-ঋষি-মহাত্মা দেখতে পারেন।

হৃষিকেশ

বৈভ্য নামে জনৈক ঋষি গঙ্গাদ্বারে দশ হাজার বৎসর উর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করেছিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু আম্রবৃক্ষে কুব্জরূপ ধারণ করে দর্শন দিয়ে বললেন, হে বৈভ্য! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি কি বর চাও? ঋষি বৈভ্য

বললেন, হে প্রভো, আমার কিছু প্রয়োজন নাই। আপনি দয়া করে আমার মতো লোকের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন, তাতেই আমি ধন্য হয়েছি। আমি কেবলমাত্র আপনার কৃপা চাই। যদি আমার প্রতি এতই প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন আপনি এই স্থানে নিত্য বিরাজ করুন। আর আপনার শ্রীচরণকমলে যেন আমার দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে এবং আপনার মধুর ভজনে যেন দিনপাত করতে পারি। ভগবান বললেন, তথাস্তু। হে বৈভ্য, তুমি আমাকে আম্রবৃক্ষে কুজরূপে দর্শন করেছ, কাজেই এই তীর্থের নাম হলো 'কুজাম্রকক্ষেত্র।' এই তীর্থে যারা স্নান, দান ও জপ, তপসাদি করবে তাঁহারা পরম ধাম প্রাপ্ত হবেন। এই মহাতীর্থে আমি লক্ষ্মীসহ বাস করবো। আর তুমি আমার দর্শনলাভ মানসে কঠোর তপস্যা করছিলে, সেই কারণেই এই স্থানের নাম হবে হৃষিকেশ। অথবা আমার একচতুর্থাংশ হৃষিকেশ নামে এই তীর্থে নিত্য বিরাজমান হবে। সত্যযুগে বরাহ, ত্রেতাযুগে কৃতবীর্য পরশুরাম, দ্বাপরে বামন এবং কলিতে ভরত নামে এই মহাতীর্থ খ্যাত হবে।

তবে তারও আগে নাম ছিল মায়াপুরী। হৃষিকেশ শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ সলিলা স্বর্গের নদী গঙ্গা পাহাড় ছেড়ে মর্ত্যধামে। রাবণ বধের প্রায়শ্চিত্ত করতে অনুজসহ শ্রীরামও আসেন হৃষিকেশে। স্মারকরূপে রাম মন্দির হয়েছে। মহামতি বিদুরও কলেবর ত্যাগ করেছিলেন এই হৃষিকেশে।

লক্ষ্মণ ঝোলা

হৃষিকেশ হতে তিন মাইল উত্তরে পাহাড়ের উপর গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে লছমনঝুলা। এখানে লছমনজীর মন্দির আছে। লক্ষ্মণ এই পাহাড়ে তপস্যা করেছিলেন। লক্ষ্মণের নাম হতেই গঙ্গা পারাপারের লোহার ঝোলাপুলের নাম হয় লছমন ঝোলা। জনৈক মাড়োয়ারি শেঠ তাঁহার মায়ের আদেশে ১৮৮৯ শতকে এই পুল নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ১৯২৯ শতকে ইস্পাতে রূপান্তর ঘটে। আজকাল লছমন ঝোলা বলতে সমস্ত পাহাড়টিকেই বোঝানো হয়। লক্ষ্মণ ঝোলায় রাধাকৃষ্ণ, ঝোলার মুখে একমাত্র লক্ষ্মণ মন্দির, বিপরীতে ১১.৩ মিটার উঁচু মনোলিথিক শিব, বাঁয়ে সত্য সাঁই আশ্রম।

হরিয়ানা প্রদেশ

হরিয়ানার পূর্বকথা

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর পাঞ্জাবের হিন্দিভাষী এলাকাকে নিয়ে নতুন করে রূপ পেয়েছে হরিয়ানা রাজ্য। হরিয়ানা অর্থাৎ দেবলোক, এককালে পাঞ্জাবের এই অংশে দেবতারা বাস করতেন। মহাভারত খ্যাত কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধও ঘটেছিল আজকের হরিয়ানায়। আজও এরা যুদ্ধবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী। এমনকি ১৮৫৭ শতকে স্বাধীনতা সংগ্রামেও হরিয়ানার অবদান উল্লেখ্য। পঞ্চনদের জন্ম মুহূর্তের ঘাটতি পুরিয়ে আজ সে জোগান দিচ্ছে সারা ভারতকে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনেও হরিয়ানা আজ ভারতরাষ্ট্রে অন্যতম। জাতীয় আয়ে পাঞ্জাবের পরেই ভারতে হরিয়ানার স্থান। ভৌগোলিক অবস্থান পাঞ্জাবেরই মতো। রাজ্যের সদর দপ্তরও বসেছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার চণ্ডীগড় শহরে। ভারতরাষ্ট্রে আয়তনে ২০তম, জনসংখ্যায় ১৬তম স্থানে হরিয়ানা রাজ্য। তবে ভাষার ভিত্তিতে রদবদল ঘটতে চলেছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে আবার।

কুরুক্ষেত্র

পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, বহুনি বর্ষাণ্য মিতেন তেজসা
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্র মিতীহ পপ্রযে॥

পর্যটক আকর্ষণ যথেষ্ট উল্লেখ্য না হলেও হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছে চারযুগের ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র এক পবিত্র তীর্থ। ভারতীয় আর্যজাতির সর্বপ্রাচীন ধর্মক্ষেত্রও এই কুরুক্ষেত্র। পুরাকালে কৌরব ও পাণ্ডবদের পিতৃপুরুষ রাজর্ষি কুরু এখানে তপস্যা করেন আর কুরু থেকে অতীতের সমন্তপঞ্চক হয় কুরুক্ষেত্র। কথিত আছে, মহাভারতে লিপিবদ্ধ ১৮ দিনব্যাপী ধর্মযুদ্ধ ঘটেছিল এই কুরুক্ষেত্রেই। বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধও কুরু ও পাণ্ডবদের এই কুরুক্ষেত্র। ১৮ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিধন হয়। স্বজন নিধনে ব্যাকুল অর্জুন যখন যুদ্ধ থেকে

বিরত থাকতে চান তখন তার সারথী লর্ড শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন জ্যোতিসরে, যা বাণী হয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্থান পেয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হিন্দুদের কাছে অমৃত সমান। স্মারকরূপে সুসজ্জিত বাগিচা হয়েছে। সূর্যগ্রহণ ও ফাল্গুন মাসের শুক্লা একাদশীতে বর্ণাঢ্য মেলা বসে, ওই সময় দ্বাপরের দ্বৈপায়ন হ্রদ তথা আজকের সূর্যকুণ্ড তীর্থে স্নানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। যাত্রীও আসেন সারা ভারত থেকে সূর্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নান করতে। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু হলে আত্মার মোক্ষলাভ হয়। এমনকি কুরুক্ষেত্রের ধূলিকণা সর্বপাপ নাশ করে।

১৩ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ৩৫৬ কি.মি. হিন্দুতীর্থ রয়েছে কুরুক্ষেত্রে। অতীতকালে ব্রহ্মা ছাড়াও বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর বাস ছিল কুরুক্ষেত্রে। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা এখানে বসেই বিশ্বের রূপ দেন। মনুও মনুস্মৃতি লেখেন কুরুক্ষেত্রে। বুদ্ধও এসেছেন কুরুক্ষেত্রে। জল আজ শুকিয়ে গেলেও পুণ্যতীর্থ সরস্বতী নদীও বয়ে যেত কুরুক্ষেত্রের উত্তর দিয়ে সেকালে। ১৫ কি.মি. দীর্ঘ কুরুর খনিত সমুদ্র-সদৃশ ব্রহ্মাসর সরোবরটিও কুরুক্ষেত্রের অন্যতম পুণ্যস্থান। Samantapanchaka বা Ramaradha-ও বলে থাকে একে। স্নানে পুণ্যি মেলে। শিব অর্থাৎ সর্বেশ্বর মহাদেবের মন্দির হয়েছে সরোবরের মাঝে–সেতুতে পারাপার। বিড়লা গীতা মন্দিরও হয়েছে সরোবরের তীরে। সরোবরের আরেক আকর্ষণ শীতে দূর-দূরান্ত থেকে পরিযায়ী পাখিরা উড়ে এসে নীড় বাঁধে। কুরুক্ষেত্রের আর এক দর্শন কুরুক্ষেত্র ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের শ্রীকৃষ্ণ মিউজিয়াম। পট্টচিত্র, কাংড়া, মধুবনী, পিছাবনী শৈলীর ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ আখ্যান প্রদর্শিত হয়েছে। তেমনই পল্লব, চোল ও নায়ক রাজাদের কালের ব্রোঞ্জ মূর্তিতেও শ্রীকৃষ্ণ আখ্যান, হাতির দাঁতের বেণুগোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ অনবদ্য।

গীতার উৎপত্তি

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মোক্ষদা একাদশীর দিনে শুরু হয়েছিল। মোক্ষদা শব্দটির অর্থ হচ্ছে "মুক্তি প্রদাতা"। ঐদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ্গীতার জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্ত করেছিলেন। এখন প্রতি বছরই ঐদিনটি 'ভগবদ্গীতা'র জন্মদিন রূপে বিবেচিত হয় এবং কুরুক্ষেত্রসহ ভারতের অন্যান্য স্থানে 'গীতা'র সম্মানে উৎসব হয়ে থাকে। সবচেয়ে বড় উৎসবটি হয় কুরুক্ষেত্রের 'জ্যোতিসর'-এ, ঠিক যে স্থানটিতে 'গীতা' কথিত হয়েছিল। এই উৎসবটি রাজ্য সরকারের তরফে আয়োজিত হয় এবং এখানে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল যোগদান করেন। ঘটনাচক্রে এই একই সময়ে ইস্কনে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণের ম্যারাথন অনুষ্ঠানটি হয় এবং ভক্তগণ ভারতসহ সারা বিশ্বে শ্রীল প্রভুপাদের 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ' গ্রন্থটি শতসহস্র সংখ্যায় বিতরণ করেন।

সরস্বতী নদী

সরস্বতী নদী ছাড়া আর অন্যসব নদীর গতিপথ কুরুক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। একমাত্র বর্ষা ঋতুর সময় এখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়। অন্য সময় তা শুকিয়ে যায় এবং তার গতিপথটুকু শুধু দৃশ্যমান হয়।

ব্রহ্মকুণ্ড/ব্রহ্মসরোবর

বলা হয়ে থাকে যে, ব্রহ্মা এখানেই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন। সূর্যগ্রহণের সময় প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে শতসহস্র তীর্থযাত্রী এই ব্রহ্ম সরোবরে পবিত্র স্নানের জন্য আগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের অন্যান্য সরোবরগুলোর মধ্যে এই ব্রহ্ম সরোবরই সবচেয়ে সুন্দর বৃহৎ এবং এটি কুরুক্ষেত্র ডেভেলপমেন্ট বোর্ড দ্বারা ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তীর্থযাত্রীদের কুরুক্ষেত্র আগমনের এটিই হচ্ছে প্রধান আকর্ষণ।

জ্যোতিসর (যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দান করেছেন)

এই জ্যোতিসরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা বর্ণনা করেছিলেন। সেই স্থানটি একটি বড় বৃক্ষের নিচে শ্বেত পাথরের একটি রথ দ্বারা চিহ্নিত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, গাছটি নাকি পাঁচ হাজার বৎসরের বেশি প্রাচীন এবং অর্জুনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অমর কথোপকথনের প্রাচীনতম সাক্ষী। জ্যোতিসর স্থানটি কুরুক্ষেত্র শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত।

বাণ গঙ্গা

বাণ গঙ্গা বা ভীষ্ম কুণ্ড নামে পরিচিত এই পবিত্র স্থানটি কুরুক্ষেত্র থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় পাণ্ডবগণের পিতামহের ভ্রাতা ভীষ্ম এখানে শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। যখন তিনি অর্জুনকে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভীষ্ম সাধারণ জলের জন্য পিপাসার্ত বোধ করছেন না। তাই অর্জুন তার বাণ দ্বারা মেদিনী ভেদ করে গঙ্গাকে আনয়ন করলেন এবং গঙ্গা যেখানে প্রবল বেগে ফোয়ারার মতো বাহির হলো এবং ভীষ্ম সেই পবিত্র জল পান করলেন। অর্জুনের এই মহান কর্মের জন্য ভীষ্ম তার প্রতি ধন্যবাদ

জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের পথ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করলেন। বাণ গঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের একটি বিগ্রহ এবং হনুমানজীর ২৬ ফুট উঁচু একটি বিগ্রহ রয়েছে। তীর্থযাত্রীরা ইচ্ছে করলে সেখানে পূজা দিতে পারেন।

বাণ গঙ্গা (দয়ালপুর)

এখানেও অর্জুন ভূমিতে বাণ চালনা করে গঙ্গাকে আনয়ন করেছিলেন। তবে এবারে তিনি জয়দ্রথের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় তাঁর রথের ঘোড়াদের জল খাওয়ানোর জন্য গঙ্গাকে আনয়ন করেছিলেন।

চক্রব্যূহ

যেখানে দুর্যোধন এক চক্রাকার ব্যূহের আকারে তার সেনাবাহিনীকে সাজিয়েছিলেন এবং এই সেই স্থান যেখানে অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুকে হত্যা করা হয়েছিল।

দধিচি তীর্থ

অনেককাল আগে সরস্বতী নদীর তীরে দধিচি মুনির আশ্রম ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র তৈরি করার জন্য ইন্দ্র দধিচি মুনির অস্থি প্রার্থনা করেছিলেন। দধিচি মুনি ইন্দ্রের ইচ্ছা পূরণে সম্মত হয়ে তাঁর জীবন পরিত্যাগ করেছিলেন।

ভদ্রকালী মন্দির (একান্ন পীঠের এক পীঠ)

৩ কি.মি. দূরে অতীতের স্থানতীর্থ। আজ হয়েছে থানেশ্বর। থানেশ্বরও আরেক হিন্দুতীর্থ। এখানে হর্ষবর্ধনের তৈরি থানেশ্বর মহাদেব মন্দির, সিংহবাহিনী অম্বিকা, সন্তোষীমাতা ছাড়াও নানান মন্দির রয়েছে। অল্প যেতে ভদ্রকালী মন্দির। জনশ্রুতি আছে যে, একান্ন সতী পীঠের অন্যতমও এই ত্রিশুলধারী কষ্টিপাথরের এলোকেশী দেবী ভদ্রকালী। তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে মেলে সতীর ডান গুলফ পড়ে এখানে। শেখ চিলির মসজিদ ও সমাধি রয়েছে থানেশ্বরে। জন্ম তথা রাজধানীও ছিল দানবীর রাজা হর্ষবর্ধনের (৫৯০-৬৪৭ খ্রি.) থানেশ্বরে। ১৪ বছরের বালক হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন। কালে কালে প্রথিতযশা হর্ষের রাজ্যও বিস্তার পায় বাংলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত। গজনির সুলতান মাহমুদ ধ্বংস করে থানেশ্বরের অতীত।

সমন্ত পঞ্চক

কুরুক্ষেত্র সমন্ত পঞ্চক (পঞ্চ সরোবর) রূপেও পরিচিত। কেননা, এখানে শ্রীকৃষ্ণের এক অবতার শ্রীপরশুরাম তাঁর বধ করা ক্ষত্রিয়দের রক্ত দিয়ে পাঁচটি সরোবর তৈরি করেছিলেন। ভগবান পরশুরাম একুশবার অসৎ রাজা ও যোদ্ধাদের নিধন করে পৃথিবীকে বিশোধিত করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, এই রক্ত পরবর্তীকালে জলে পরিণত হয়েছিল। এই পাঁচটি সরোবরের একটিকে 'সন্নিহিত' বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে 'সমবেত

হওয়ার স্থান'। বলা হয় যে, অমাবস্যার দিন মূর্তিমান সকল পবিত্র স্থানগণ এই সরোবরে সমবেত হন। সূর্যগ্রহণের সময় তাই সকল তীর্থযাত্রীগণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক আলয়রূপে পরিচিত এই 'সন্নিহিত সরোবরে' প্রথমে আগমন করেন।

পেহোয়া

পূর্বে এই স্থানটি 'পৃথুডাক' নামে পরিচিত ছিল যার অর্থ 'পৃথুর ডোবা'। শ্রীকৃষ্ণের শাসন শক্তির এক অবতার পৃথু, এখানে তাঁর পিতার শ্রাদ্ধকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। এখনও প্রতিদিন পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করার জন্য শত-শত তীর্থযাত্রী এখানে আগমন করেন।

পরাশর/দ্বৈপায়ন

শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনির আশ্রম। মহাভারতের যুদ্ধ শেষে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে দুর্যোধন এখানকার সরোবরে লুকিয়ে ছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন তাকে লড়াই করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানালো তখন তিনি জল থেকে উঠে এসেছিলেন।

কর্ণবধ

কর্ণবধ হচ্ছে এক দীর্ঘ পরিখা যেখানে অর্জুন কর্ণকে বধ করার আগে কর্ণের রথের চাকা আটকে গিয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে।

এখানকার কুরুক্ষেত্র, ভীষ্মকুণ্ড অর্থাৎ কুণ্ডের পাড়ে ভীষ্মের শরশয্যার স্থান, অভিমন্যু ক্ষেত্র অর্থাৎ মহাভারতীয় অদিতি বন আজকের আমিন গ্রাম, কর্ণটিলা অর্থাৎ মির্জাপুর, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গীতা ভবন, সীতামাঈ, দুর্গামন্দির, জ্যোতিসর কুণ্ড, পাড়ে মহাভারতের কালের দুই বটবৃক্ষ। বিপরীতে শঙ্করাচার্য মঠ। পাশে গীতা ভবন, কর্ণ মন্দির–তীর্থযাত্রী ও পর্যটক দুয়ের কাছেই সমান আকর্ষণীয়।

উড়িষ্যা প্রদেশ

উড়িষ্যার পূর্বকথা

পৌরাণিক যুগে দানবরাজ বলির তৃতীয় পুত্র কলিঙ্গই প্রথম এই রাজ্য গড়েন। এমনকি মহাভারতে মেলে, দুর্যোধন, কলিঙ্গরাজ অঙ্গদের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। পট বদল হয়েছে বারবার উৎকর্ষের পীঠস্থান অর্থাৎ উৎকল ভূমির। চেদীরাজাও রাজত্ব করে গেছেন উড়িষ্যায়। তাদের বলেই জৈনধর্ম প্রসার পায়। এসেছেন মগধের সমুদ্রগুপ্ত, বাংলার রাজা শশাঙ্ক, এসেছেন কনৌজের হর্ষবর্ধন, জয় করেছেন তারাও উড়িষ্যাকে। কলিঙ্গের রাজকুমার বিজয় প্রথম রাজ্য গড়েন সিংহলে। এমনকি জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, বালিতেও ভারতীয় সংস্কৃতিতেও পৌছে দেয় এই কলিঙ্গ রাজবংশ। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতে আসেন হর্ষের কালে। তার ভ্রমণান্তে পাওয়া যায়, সে যুগের বৌদ্ধরা ছয় ঘোড়ায় টানা রথে বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘের প্রতিকৃতি নিয়ে বিহারে বের হতো। আজকের পুরীর রথের জগন্নাথ, শুভদ্রা আর বলরামের কথা ভাবিয়ে তোলে। প্রবাদ আছে, রথের রশি টানায় বা চলন্ত পথে দেব দর্শনে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হয়।

১৪ শতকে ফিরোজ সুলতান, পরে বিহারও বাংলার মুসলমান দখলে গেলেও উড়িষ্যা হিন্দুধর্ম তথা মন্দির অটুট থাকে। তবে ১৫৬৮ শতকে কালা পাহাড়ের কাছে (ইসলামে ধর্মান্তরিত গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান কালাচাঁদ রায়) সেই হিন্দু রাজা মুকুন্দ দেবের পরাজয়ে বিভীষিকা নামে উড়িষ্যায়। কোণারকের সূর্য মন্দির এই কালা পাহাড়ের ধ্বংসলীলার শিকার হয়। আর বাংলা থেকে আসা আফগান হটিয়ে মোগল আসে ১৫৯২ শতকে উড়িষ্যায়। ধ্বংসও পায় মন্দিরের পর মন্দির কেশরী ও গঙ্গা রাজদের কালে মোগলদের হাতে। মোগলদের উৎখাত করে ১৭৫১ শতকে পশ্চিম ভারত থেকে আসে মারাঠারা।

১৭৫৭ শতকের পলাশীর যুদ্ধে জিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে অংশ গেলেও ১৮০৩ শতকের ১লা এপ্রিল ব্রিটিশ আসে উৎকলে। ১৯১২ শতকে বাংলা থেকে বিহারে, আর ১৯৩৬ শতকে বিহার থেকে পৃথক হয়ে জন্ম নেয় উড়িষ্যা প্রদেশ। ১৯৪৭ শতকে স্বাধীনতার পর ২৬টি স্বাধীন অঙ্গরাজ্য ভারতরাষ্ট্রে যোগ দেয় উড়িষ্যার অংশ হয়ে। রূপ পায় নতুন আঙ্গিকে আজকের উড়িষ্যা। ভুবনেশ্বরকে রাজধানী করে ১৯৪৯ শতকে ১৯শে আগস্টে। সেই থেকে গড়ে উঠেছে নতুন করে পরিকল্পিত রাজধানী নগরী ভুবনেশ্বর। জার্মান সহযোগিতায় গড়া রাউরকেলা, স্টিল প্ল্যান্ট, রাজ্যের প্রাণদায়িনী হিরাকুদ প্রজেক্ট, বন্দরনগরী পারাদীপ আজ বিশ্বনন্দিত। তবুও আওয়াজ উঠেছে, পশ্চিম উড়িষ্যা পিছিয়ে পড়া পাঁচ জেলা–বোলাঙ্গির, সম্বলপুর, বরগড়, সুন্দরগড় ও দেবগড়কে নিয়ে পৃথক রাজ্য কোশল গড়ার। আবার উড়িষ্যাকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দানও দাবি তাদের।

পুরী

নীলাচলনিবাসায়-নিত্যায় পরমাত্মনে
বলভদ্রসুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ॥

আর্যদেরও আগে শবরদের বাস ছিল পুরীর বনাঞ্চলে। নামও ছিল সেকালে দন্তপুরা অর্থাৎ দাঁতের পুরী। কথিত আছে, বুদ্ধের ছেদক দন্ত ছিল মন্দিরে। বুদ্ধের দন্তোৎসব হতো রথের দিন মিছিল বের করে। কিংবদন্তি আছে যে, আজকের জগন্নাথ মন্দির স্থলে বৌদ্ধ স্তুপ ছিল সেকালে। আর নবম শতকের গোড়ায় শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রি.)-র গোবর্ধন পীঠ তথা মঠ গড়ার সাথে হিন্দু-ধর্মীয় মানচিত্রে উল্লেখিত হয় পুরীর নাম। ৯ম শতকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র অর্থাৎ দেবতারও উল্লেখ মেলে। আর ১১শ শতকে কবি জয়দেব গীত গোবিন্দম কাব্যগ্রন্থে জগন্নাথকে নিবেদন করেছেন কৃষ্ণ-মাধব রূপে। ১১৩৫ শতকে অনন্ত বর্মণ ছোদাগঙ্গা দেব মন্দির গড়েন দেবতা পুরুষোত্তমের। গজপতি রাজাদের কালে ১৫ শতকে দেবতার নামান্তর ঘটে পুরুষোত্তম থেকে লর্ড অব দি ইউনিভার্স অর্থাৎ জগন্নাথ হন। দুই-ই বিষ্ণুর নামান্তর। মোগল, মারাঠাদের পর ব্রিটিশ আসে ১৮০৩ সনে পুরীতে। নবরূপে আজকের রথযাত্রার শুরু ও ব্রিটিশ প্রত্যাগমনে পুরীর গজপতি রাজাদের কর্তৃত্বে (১৯৫৭ পর্যন্ত) মন্দির গেলেও ব্রিটিশের প্রিয় রিসর্ট তথা বাংলো-বাড়িগুলোর মালিকানায় পালাবদল ঘটে–ইজারা নেয় বাঙ্গালি। অতীতের বাঙ্গালি প্রভাব আজ ক্ষীয়মাণ হলেও বাঙ্গালিয়ানা রয়েছে পুরীর। বাতাসও বাঙ্গালির ভ্রমণের অঙ্গ হিসেবে সঙ্গ নিয়েছে পুরী। আধিক্যও তাই দেখা যায় বাঙ্গালি ট্যুরিস্টের– পুরীতে। বাংলা ভাষাও সর্বজনগ্রাহ্য পুরীতে।

দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রী দুয়ের কাছেই মর্ত্যের বৈকুণ্ঠ পুরীর আকর্ষণ অদ্বিতীয়। ভারতের চার ধামের অন্যতমও বঙ্গোপসাগরের পাড়ে পুরী (বাকি তিন- বদ্রীনাথ, দ্বারকা ও রামেশ্বরম)। পুরাণে মেলে, প্রভু জগন্নাথ বদ্রীতে স্নান করে দ্বারকায় বেশভূষা পরে পুরীতে অন্নভোগ সেরে রামেশ্বরমে শয়ন করতেন। তীর্থযাত্রীদের জন্য রয়েছে বিষ্ণু তথা

শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপী জগন্নাথদেবের বিশ্বখ্যাত মন্দির। তেমনই রয়েছে ভ্রমণার্থীদের জন্য ৭ কি.মি. দীর্ঘ মনোরম সমুদ্র সৈকত। তুলনা হয় না ভারতের ব্রাইটন পুরীর সমুদ্রের। স্বর্গদ্বার তথা সী বীচ রোড বাঙ্গালির কাছে অধিক প্রিয়। নব সাজে গড়ে ওঠা চক্রতীর্থ এলাকাও আজ জমজমাট পাঁচ মিশেলির ভিড়ে। তবে, ধর্মই যাদের কর্ম তাদের উপস্থিতি মন্দির লাগোয়া গ্র্যান্ড রোডে। প্রবাদ আছে যে, তিন দিন তিন রাত পুরী অবস্থান করলে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হয়।

পুরীর সমুদ্রে স্বর্গদ্বারেই প্রথম স্নান করার প্রথা। পুণ্যতীর্থও এই স্বর্গদ্বার অর্থাৎ গেটওয়ে অব হেভেন। শ্রীচৈতন্যদেবও প্রথম স্নান করেন স্বর্গদ্বারে। লীনও হন ব্রহ্মে এই নীলাচলেই মহাপ্রভু। আর মহাদধি অর্থাৎ স্বর্গদ্বার সংলগ্ন সমুদ্রের অংশে। তীর্থযাত্রীদের অতীত পাপ নাশের সাথে স্বর্গলাভ মেলে স্বর্গদ্বারের সমুদ্রস্নানে। পুরীধামে মৃত্যুতে মোক্ষলাভও মেলে। স্বর্গদ্বার লাগোয়া মহাশ্মশান। কথিত আছে, সন্ত কবীরের পুরী অবস্থানকালে একদা তট ভাসিয়ে সমুদ্রের ধ্বংসলীলায় ক্ষিপ্ত কবীর স্বর্গদ্বারের কাছে ছাতা মেলে বসে সমুদ্রকে শাসন করে। সেই থেকে সমুদ্রও আর তট ভাসিয়ে ধ্বংস করেনি পুরীর জনপথ।

পুরী মন্দিরের কাহিনী সংক্ষেপে

কিংবদন্তি আছে, আজকের জগন্নাথ মন্দির স্থলে বৌদ্ধ স্তুপ ছিল সেকালে। আর নবম শতকের গোড়ায় শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রি.)-এর গোবর্ধন পীঠ তথা মঠ গড়ার সাথে হিন্দুধর্মীয় মানচিত্রে উল্লেখিত হয় পুরীর নাম। সন্ন্যাসীদের কাছে বার্তা পেয়ে সত্যযুগে অবন্তীরাজ সূর্যবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতিকে পাঠান বিষ্ণুর সন্ধানে ওড়িষ্যা রাজ্যে। বিদ্যাপতির দর্শনও মেলে শবর গৃহে নীলমাধব রূপে বিষ্ণুর। ইন্দ্রদ্যুম্নও ওড়িষ্যা এলেন বিষ্ণুর দর্শন লাভে। বিফল ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন। নারদ সান্ত্বনা দেন শিলায় নয়, দারুতে দর্শন মিলবে বিষ্ণুর। নীলমাধবের স্বপ্নাদেশ মতো দারুও মেলে চক্রতীর্থে।

কিংবদন্তি আছে, কৃষ্ণের নাভি অর্থাৎ পরমব্রহ্ম দ্বারকা থেকে ভেসে আসে পুরীর সমুদ্রে ব্রহ্মদারু রূপে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই দারুই প্রতিষ্ঠা করেন দেবরূপে মহাবেদীতে। আবার দৈববাণী পান রাজা। সেই মতে ১০০০ কিউবিক উঁচু মন্দিরও গড়েন ইন্দ্রদ্যুম্ন। শিল্প-শাস্ত্রের আদি প্রবর্তক বিশ্বকর্মা তথা জগন্নাথদেব সূত্রধরের বেশে বিগ্রহ গড়তে আসেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে ২১ দিনে সম্পূর্ণ হবার কথা বিগ্রহ। এই ২১ দিনে সূত্রধর দরজা না খুললে কেউ আসবেন না শর্তাধীনে রাজা রাজি হয়ে সূত্রধর বিগ্রহ গড়া শুরু করেন। অধৈর্য রানির তর সয় না। শর্ত ভেঙ্গে দ্বাদশ দিনে দরজা খোলেন রানি। ঘরে ঢুকে দেখেন সূত্রধর উধাও, দেববিগ্রহ অসম্পূর্ণ। হাত, পা তখনও বাকি। প্রতিষ্ঠা করেন রাজা সেই অসম্পূর্ণ বিগ্রহ। পৌরাণিক যুগের সেই মন্দির ধ্বংস পেতে রাজা যযাতি কেশরী মন্দির গড়েন নতুন করে। আর ব্রাহ্মণ নিধনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ শতকে গড়েন আজকের এই পুরী মন্দির। পাঁচ লক্ষ তোলা সোনা খরচ হয় মন্দির গড়তে। তারপর গজপতি রাজাদের অর্থানুকূল্যে এর শ্রীবৃদ্ধি হয়।

পঞ্চতীর্থ

চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর–এই পাঁচটি তীর্থ শ্রীপুরুষোত্তমের পঞ্চতীর্থ নামে খ্যাত। পুরীতে গেলে এই পঞ্চতীর্থ অবশ্যই দর্শন করতে হবে।

১. চক্রতীর্থ

শ্রীমন্দির হতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বলগণ্ডিনলার বাংকিমুহানার তীরে চক্রতীর্থ অবস্থিত। এই স্থানেই শ্রীদারুব্রহ্ম ভেসে এসেছিল। এই স্থানে একটি প্রস্তরময় সুদর্শনচক্র একটি বেষ্টনীর মধ্যে পূজিত হয়ে থাকেন। এই চক্রের অদূরেই একটি কুণ্ড। এই স্থানে সকল সময়ে জল থাকে এবং ফলকামী কর্মীগণ এই স্থানে শ্রাদ্ধাদি করে থাকেন।

২. স্বর্গদ্বার

ব্রহ্মা শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় দেবগণের সাথে এই স্থানে অবতীর্ণ হয়েছেন। অবতরণ স্থানের নিদর্শনরূপে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত আছে। উহাকে স্বর্গদ্বারসাক্ষী বলে। কেহ কেহ ইহাকে স্বর্গের সিঁড়ি বলে থাকেন। এই স্থানে সমুদ্রের ঘাটে অধিকাংশ সকাম তীর্থযাত্রী সমুদ্র স্নান করেন। স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতটে শ্মশানক্ষেত্র আছে।

৩. শ্বেতগঙ্গা

পূরাণে এই পুকুরকে অকৃষ্ণ অর্থাৎ কালো নয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্বেত শব্দের অর্থ সাদা। এই পুকুরের জল বছরে একবার স্বল্পক্ষণের জন্য দুধের ন্যায় সাদা হয়ে থাকে। তাই ক্রমে ক্রমে এই পুকুর শ্বেতগঙ্গায় পরিণত হয়।

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে, ত্রেতা যুগে এক রাজা শাসনকার্য করতেন, তার নাম ছিল শ্বেত। তার নাম অনুসারেও শ্বেতগঙ্গা নাম হতে পারে। এই পুষ্করিণী গঙ্গা থেকে অভিন্ন এবং এটি কখনও শুকিয়ে যায় না।

কথিত আছে যে, তালাচু মহাপাত্র জগন্নাথের একজন সেবক ছিলেন। তিনি বারাণসীর গঙ্গায় স্নান করার খুব বাসনা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু অসুস্থ থাকায় অতদূরে স্নান করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি এই পুকুরে স্নান করার জন্য আসেন। পুকুরে নেমে ডুব দিয়ে উঠে দেখেন তিনি বারাণসীর গঙ্গার মণিকর্ণিকা ঘাটে। চারপাশে দেখেন হাজার হাজার মানুষ স্নান করছেন। আনন্দে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করে আবার ডুব দিলেন। এবার উঠে দেখেন তিনি এই পুকুরেই আছেন।

মহীরথ শর্মা নামে এক ব্যক্তি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে নৈবেদ্য অর্পণ করেন। তখন তিনি দেখলেন গঙ্গাদেবী দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করলেন। গঙ্গাদেবী আদেশ করলেন, গঙ্গামাতা গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ নেওয়ার জন্য। মহীরথ শর্মা দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং সিদ্ধি লাভ করলেন।

৪. মার্কণ্ডেয় সরোবর

শ্রীমন্দিরের পশ্চিম ভাগে এই সরোবরটি অবস্থিত। প্রলয়কালে শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়পয়োধি জলে ভাসতে ভাসতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন। তৎসমীপস্থ একটি বালক মার্কণ্ডেয়কে 'মৎসমীপে আগমন কর' এই রূপ বলতে লাগলেন। মার্কণ্ডেয় এই বাণী কোথা হতে আসতেছে এইরূপ চিন্তা করতে করতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে দেখতে পেলেন। মার্কণ্ডেয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের স্তব করলেন। তখন শ্রীনারায়ণ মার্কণ্ডেয়কে বললেন, বটবৃক্ষের উর্ধ্বপ্রদেশে পত্রপুটে যে বালক শয়ন করে আছেন, তাঁহাকে দর্শন কর। তাঁহার বিস্তৃত বদনে তুমি অবস্থান করতে সমর্থ হবে। শ্রীমার্কণ্ডেয় শ্রীনারায়ণের আজ্ঞানুসারে উক্ত বালকের মুখগহ্বরে প্রবেশ করে দেখলেন, তাঁহার মুখগহ্বরে ব্রহ্মসৃষ্ট যাবতীয় বস্তু ও চতুর্দশ ভুবন অবস্থিত রয়েছে। অনন্তর মার্কণ্ডেয় তথা হতে নির্গত হয়ে শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে দর্শন করলেন। ভগবান বললেন, এই ক্ষেত্র নিত্য, ইহাতে প্রলয় নাই। মার্কণ্ডেয় মুনি বটবৃক্ষের বায়ুকোণে মার্কণ্ডেয় ঘাট নির্মাণ করে শ্রীপুরুষোত্তমের আদেশে তৎপ্রিয়ম শ্রীশিবের আরাধনা করলেন। এখন এই স্থানে শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন। হ্রদের তীরে পূর্বে মার্কণ্ডেয় বট বিরাজিত ছিল। চৈত্রী অশোকাষ্টমীতে ঐস্থানে কালীয় দমন যাত্রা হয়।

৫. ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর

জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরটি আর এক তীর্থ। প্রবাদ আছে, রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের দান করা সহস্র গাভীর পায়ের খুরে তৈরি হয় সরোবর। স্নান ও তর্পণে পুণ্য মেলে। জলে কচ্ছপ আছে। আর চক্রতীর্থে আছে সোনার গৌরাঙ্গ। তবে, দেবতা বংশীধারী কৃষ্ণের পাশে গোপাল মূর্তি। জনশ্রুতি আছে, গোপালবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ সাধক রামানন্দকে দর্শন দেন, স্মারক রূপে মন্দির। বিপরীতে জগন্নাথদেবের শ্বশুরবাড়ি তথা দেবী লক্ষ্মীর পিত্রালয়, বালুতটে বড়ঠাকুর অর্থাৎ শনি ও চক্রতীর্থ।

চন্দন সরোবর/নরেন্দ্র সরোবর

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উত্তর পূর্বাংশে প্রায় এক মাইল দূরে শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের নামান্তর শ্রীচন্দনপুকুর অবস্থিত। এই বিশাল দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বই বাঁধানো এবং সোপানসমূহ প্রস্তর-নির্মিত। শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের সাথে শ্রীভুবনেশ্বরে বিনোদ সরোবরের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিংবদন্তি এই যে, খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নরেন্দ্র মহাপাত্র নামে কোনো রাজকর্মচারী এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন্দ্র মহাপাত্র কবি নরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। মহা রাষ্ট্রীয়দিগের গুরু বাবা ব্রহ্মচারী দ্বারা সরোবরের চতুর্দিকে প্রস্তরময় বেষ্টন ও প্রস্তর রচিত সোপানাবলী নির্মিত হয়। কেউ আবার বলেন, নরেন্দ্র শিরোমণি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেবের চন্দন যাত্রার উদ্দেশ্যে এই দীর্ঘিকা খনন করেছিলেন, এই জন্য ইহার নাম নরেন্দ্র সরোবর হয়েছে। শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিজয় বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ মহাদেবের সহিত অক্ষয় তৃতীয়া হতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্যন্ত নৌকাবিলাস করেন। কথিত হয় যে, শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের তটে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত, শ্রীস্বরূপাদি গোস্বামীবৃন্দ ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র তা শ্রবণ করতেন।

আঠারোনালা

মহাপ্রভুর সময়ে পুরীতে প্রবেশ করা যেত এই সেতুর উপর দিয়ে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই প্রাচীন সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন। যখন তিনি প্রথম নির্মাণ কাজ শুরু করেন তখন বারবার তিনি বিফল হচ্ছিলেন। অবশেষে প্রভুর আদেশে তিনি তার আঠারেটি পুত্রের শিরচ্ছেদ করে তাদের মস্তকগুলো নদীর জলে সমর্পণ করেন। কেবল তখনই তিনি সেতুর নির্মাণকার্যে সফল হন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, রাজা মৎসকেশরী এই সেতু নির্মাণ করেন।

গম্ভীরা/শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠ/কাশী মিশ্রের গৃহ

উঠান, প্রাঙ্গণ, দরজা পার হয়ে গম্ভীরা ঘরে আসতে হয়। গম্ভীরা শব্দের অর্থও তাই অনেক গভীরে। এই গম্ভীরা ঘরটি কাশী মিশ্রের বাগানবাড়ির খুব ভিতরে। কাশী মিশ্র হচ্ছে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজগুরু। তিনি রাজগুরু থাকাকালে রাজা প্রতাপরুদ্র কাশী মিশ্রকে একটি গৃহ ও একটি বড় উদ্যান দিয়েছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত থেকে পুরী আসেন তখন তিনি এই কাশীমিশ্রের গৃহেই অবস্থান করেন। মহাপ্রভু প্রথম যখন পুরী আসেন তখন মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে ছিলেন। মহাপ্রভু শেষ ১৮ বছর এই গম্ভীরাতেই ছিলেন।

অদ্যাপীহঁ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

এই ভবনেই নিমাই ১৫১৫ থেকে ১৫৩৩ শতকের ২৯শে জুন (তিরোধান পর্যন্ত) ১৮ বছর অবস্থান করেন। আজও কাঁথা, কমণ্ডলু ও পাদুকা পূজিত হয় শ্রীনিমাই-এর। দ্বিতলে চৈতন্যলীলাও দেখে নেওয়া উচিত হবে।

ব্রহ্মপুরাণে উল্লেখিত শ্রীমন্দিরের উত্তরে শ্বেতগঙ্গায় স্নানে পুণ্য হয়। আর আছে শ্রীমন্দিরের কাছেই যশেশ্বর। জনশ্রুতি আছে, যশেশ্বর পূজায় কোটি লিঙ্গ পূজার ফল মেলে। তেমনই অক্ষয় তৃতীয়ায় নরেন্দ্র সরোবরে ২১ দিনের চন্দন যাত্রা, সেও এক বরণীয় উৎসব। প্রতিদিন শোভাযাত্রাসহ রেপিকারূপী দেবতারা (রাম-কৃষ্ণ-জগন্নাথের প্রতিদিন মদনমোহন-লক্ষ্মী-সরস্বতী-পঞ্চশিব) আসেন শীতল হতে নরেন্দ্র সরোবরে। দুটি সুসজ্জিত বোটে জল বিহার করেন দেবতারা। আজও মৃতের দেহাবশেষ (অস্থি) ভাসানো হয় সরোবরে। বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়ি দর্শন সেরে মার্কণ্ডেয়শ্বর মন্দির ও সরোবরটি দেখে নিন। সরোবরের দক্ষিণে মন্দির, সরোবরের জলও পবিত্র-স্নানে পুণ্য হয়। কথিত আছে, বিষ্ণু নিমগাছ রূপে বাসও করতেন সরোবরের তীরে। শ্রীমন্দির থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিমে লোকনাথ অর্থাৎ শিব মন্দির। লাগোয়ার সরোবর-দেবতা প্রায়ই জলে থাকেন। রায় রামানন্দের বাড়ি, চন্দন সরোবর দর্শন করে ১৩১৮ শতকে তৈরি বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে চলুন। বিপরীতে তদীয় শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি ১৩৪৫ শতকে নির্মিত শ্রীমন্দির। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে আঠারোনালা ও লক্ষ্মীজলা। তবে, মুটিয়া নদীর উপর আঠারো সেতুটি (৮৫×১১ মি.) তৈরি হয়েছে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে। আঠারোনালা ছিল শ্রীক্ষেত্রের প্রবেশ ফটক। শ্রীক্ষেত্রের শুরুও ছিল এই সেতু থেকে সেকালে। সেকালের শিল্প-নৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শনও ল্যাটেরাইট ও বেলেপাথরের এই সেতু। কথিত আছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজের ১৮টি ছেলেকে দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করেন এখানে। সেই হেতু ১৮টি ফোকরও হয়েছে পাথরের সেতুতে।

সিদ্ধ বকুলতলা

যবন হরিদাসের সাধনপীঠ তথা বকুল গাছটি। শ্রীসিদ্ধ বকুলের বিষয়ে এইরূপ এক কিংবদন্তি আছে যে, প্রাতে শ্রীজগন্নাথদেবের দন্তধাবন ও স্নানাদি কালে তিনটি দন্তকাষ্ঠ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর জন্য প্রদত্ত হয়। এই দন্তকাষ্ঠ পূর্বদিনেই সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই দন্তকাষ্ঠ "কুম্ভাটুয়া" নামক বৃক্ষ হতে সংগৃহীত হয়ে থাকে। একদিন কুম্ভাটুয়া দন্তকাষ্ঠের তিনটি কাঠির মধ্যে একটি কাঠি দৈবক্রমে হারিয়ে যায়। তখন অবকাশ কাল অর্থাৎ দন্তধাবনের কাল উপস্থিত হলে বকুল বৃক্ষের একটি দন্তকাষ্ঠ কোনোভাবে অন্য দুটি দন্তকাষ্ঠের সহিত সেবকগণ প্রদান করে। জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রাদেবীর দন্তমার্জন সেবার পর সেই কাষ্ঠ পাণ্ডাগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রসাদরূপে প্রদান করেন। সেইদিন পাণ্ডাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী বকুল দন্তকাষ্ঠটি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের প্রসাদী দন্তকাষ্ঠটি প্রাপ্ত হয়ে প্রেমাবিষ্ট হন এবং তিনি হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থানে এসে সেটি রোপণ করেন। কালক্রমে তা একটি ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। কথিত হয় যে, সেই বকুল বৃক্ষের নিম্নে বসে হরিদাস ঠাকুর ভজন করতেন।

হরিদাস ঠাকুরের নির্যানের পর তাঁর অনুগত সিদ্ধ জগন্নাথ দাস গোস্বামীপাদের সময় পুরীর রাজকর্মচারীগণ রথের চক্র নির্মাণের জন্য ঐ বকুল বৃক্ষটি ছেদন করতে আসেন। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস তাদের বলেন– এই বকুল বৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রোপিত ও হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থানের অন্তর্গত। অতএব এই বৃক্ষ পূজনীয় বলে রাজকর্মচারীদের নিকট তিনি ছেদন করতে আপত্তি জানান। কিন্তু নিষ্কিঞ্চনের কোনো কথা রাজকর্মচারীগণ শুনতে প্রস্তুত না হওয়ায় ইহা জগন্নাথেরই ইচ্ছা জেনে সিদ্ধ জগন্নাথ দাস নীরব থাকেন। যেদিন সেই বৃক্ষটি ছেদন করা হবে বলে রাজকর্মচারীগণ নির্দিষ্ট করে গেলেন, তার পূর্বরাত্রে গাছটি অকস্মাৎ অন্তঃসার শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। রাজকর্মচারীগণ পরদিন তথায় এসে বৃক্ষের এইরূপ অবস্থা দর্শনে আশ্চার্যান্বিত হয়ে রাজাকে জ্ঞাপন করেন। সেই সময় হতেই লোকে এই বৃক্ষকে "সিদ্ধ বকুল" আখ্যা প্রদান করেন। কথিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈত্র সংক্রান্তিতে উক্ত দন্তকাষ্ঠটি রোপণ করেছিলেন, এই জন্য অদ্যাপি তথায় ঐ দিবসে "দন্তকাষ্ঠ রোপণ" মহোৎসব হয়ে থাকে। সেদিন ১০৮ কলসী জল দ্বারা ঐ সিদ্ধ বকুলের অভিষেক করা হয়। এইস্থানই সিদ্ধ বকুল নামে পরিচিত।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ি

জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণে শ্বেত গঙ্গার তীরে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ি অবস্থিত। এটিই তার নিবাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমবার যখন পুরীতে পৌছান তখন সার্বভৌম তাকে তার গৃহে নিয়ে আসেন। মহাপ্রভু তাঁর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাবার পূর্বে এখানে দুমাস অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে একজন মায়াবাদী থেকে মহান বৈষ্ণবে পরিণত করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ রূপ দর্শনের মহাসৌভাগ্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য লাভ করেন।

শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বর্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটি হতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বিদ্যানগর পল্লীতে স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীমহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ইনি ষড়দর্শনে, বিশেষতঃ শাঙ্কর-বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করে শেষ বয়সে ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক শ্রীক্ষেত্রে সপরিবারে বাস করতেন। এ সময় তিনি বেদান্তে অধ্যাপনায় রত ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীসার্বভৌম ও তদনুজ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি এবং তাঁদের অনুজা এক কন্যা; ইহারই স্বামী শ্রীগোপীনাথ আচার্য, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীসার্বভৌমের পুত্র শ্রীচন্দনেশ্বর ও কন্যা শ্রীমতি ষষ্ঠী যার ডাকনাম 'ষষ্ঠী'। এবং ষঠীর স্বামী অমোঘ পণ্ডিত নীলাচলেই বাস করতেন।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি

সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি শ্রীহস্তে শ্রীনামাচার্যের সমাধি প্রদানপূর্বক যে সমাধিপীঠ নির্মাণ করেছিলেন, নীলাম্বুধির কূলে সেই সমাধিপীঠ অদ্যাপি বর্তমান আছে। কথিত হয় যে, স্বর্গলোক নামক বেলাভূমির বিস্তৃত স্থানটি পূর্বে শ্মশানভূমিরূপে পরিণত ছিল। এজন্য তৎস্থানে এখনও শ্মশান মহাবীর শ্রীমূর্তি প্রকটিত দৃষ্ট হয়। আবার কোনো কোনো প্রাচীন বিবরণে জানা যায়, শ্মশানভূমির নিকটে শ্রীচৈতন্যমণ্ডলী নামক পরমভাগবতগণের

আবাস ছিল—এইরূপ উক্তিও পাওয়া যায়। এই বিস্তৃত শ্মশানভূমি লোকাবাস নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে পূর্বাভিমুখে সরে পড়েছে। শ্রী হরিদাস ঠাকুরের সমাধিপীঠের সন্নিকটে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভু তার শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী ও বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সমাধিপীঠ এখনও বিরাজমান রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এই শ্মশানভূমিতেই শ্রীচৈতন্যমণ্ডলীর মহাভাগবতগণ ভজন করতেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের নিকট হতে শুনতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত শ্রীনামাচার্যের সমাধিপীঠের সংস্পর্শ লাভের জন্যই গৌড়ীয়গণ তথায় ভজন করেছেন। তাঁরা তান্ত্রিকগণের ন্যায় শ্মশানকে ভজনানুকূল স্থান বলে বরণ করেননি। যে সকল গৌরপার্ষদ ভজন করেছেন বা প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মাহাত্ম্য শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাসের স্মৃতিতে বিভাবিত হবার জন্যই তৎসমাধিপীঠের নিকটে স্ব-স্ব ভজনস্থান নির্ধারণ করেছিলেন। বর্তমানে শ্রীনামাচার্যের সমাধিপীঠ একটি অনতি উচ্চ মন্দিরে বিরাজমান রয়েছেন। এই মন্দিরটি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়। সমাধি মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিম ভাগে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধ্যানমূর্তিদ্বয় বর্তমান আছেন। অধিকাংশ স্থানেই মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের শ্রীমূর্তি নৃত্যপরায়ণ অবস্থায় প্রকাশিত দেখতে পাওয়া যায়। এস্থানে তদ্রুপ নয়, একমাত্র শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় প্রকারের অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্ব ভাগে পশ্চিম অভিমুখী শ্রীপ্রতাপরুদ্র প্রকাশিত বলে কথিত এইরূপ এক শ্রীমূর্তি দৃষ্ট হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন যে, এই শ্রীমূর্তিত্রয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের কিছু পরে এই স্থানে প্রকাশিত হয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যস্থলে একটি পৃথক সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তার দক্ষিণে আরেকটি পৃথক প্রকোষ্ঠে পৃথক সিংহাসনে নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাম ভাগে আরেকটি পৃথক প্রকোষ্ঠের অন্য সিংহাসনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আসীন আছেন। এই মন্দিরের মধ্যদ্বারে দুইটি বহিঃস্তম্ভে শ্রীজয় বিজয় বা শ্রীজগাই মাধাই-এর মূর্তি আছেন। কথিত হয় যে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিপীঠের স্থানটি ভজনকুটি নামে খ্যাত। কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সমুদ্রস্নান করে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি স্থানে আসতেন এবং তথায় কিছুকাল শ্রীনাম ভজনলীলা প্রকট করে ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করতেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে প্রবেশ করলে এই ভজনকুটিতে শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীনাম ভজন নিরত শ্রীমূর্তিত্রয়ের প্রাকট্য কোনো মহানুভব বৈষ্ণবের দ্বারা সম্পাদিত হন।

টোটাগোপীনাথ মন্দির

টোটা অর্থ বাগান। এই গোপীনাথ বিগ্রহ একটি বাগানের ভিতরে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাগানের ভিতরে মৃত্তিকা খনন করতে গিয়ে এই বিগ্রহ পান। তাই মহাপ্রভু এই বিগ্রহের নাম দেন টোটাগোপীনাথ। মহাপ্রভু তাঁর প্রিয় ভক্ত গদাধর পণ্ডিতের ওপর বিগ্রহ সেবাপূজার দায়িত্ব অর্পণ করেন। গদাধর পণ্ডিত দীর্ঘদিন সেবাপূজা করায় যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যান তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, বিগ্রহ সেবাপূজা করার জন্য একজন পূজারী প্রয়োজন। এই ভাবনাচিন্তা করা মাত্রই সেই রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, ভগবান

বললেন আমি তোমার সেবা ছাড়া আর কারো সেবা গ্রহণ করবো না। গদাধর পণ্ডিত বললেন, আমিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, উঠতে পারছি না, কি করে তোমার সেবাপূজা করবো। তখন ভগবান বললেন, ঠিক আছে তুমি যাতে আমার গলায় মালা পরাতে পারো সেই ব্যবস্থা আমি করে রাখবো। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে সকালে গিয়ে দেখে ভগবানের বিগ্রহ তার হাতে মালা পরার জন্য নিচু হয়ে গেছে।

নীলাচল

নীলমহোদধির উত্তর তীরে শ্রীনীলাচল অবস্থিত। এই নীল সমুদ্রকে পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ বে অব বেঙ্গল নামে অভিহিত করেন। শ্রীদারুব্রহ্ম এই নীলসমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে 'বাংকিমূহাণে' উপনীত হয়েছেন। কলিযুগের পাবন অবতারী স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপাদি পার্ষদবৃন্দ প্রত্যহ শ্রীসমুদ্র স্নান করতেন। বিশেষত শ্রীচৈতন্যদেব নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণের পর তাহাকে সমুদ্রজলে স্নান করায় এই সমুদ্র মহাতীর্থ রূপে অবহিত করেছেন।

"হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইলা
প্রভু কহে, সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা"

গুণ্ডিচা মন্দির

মাসির বাড়ি অর্থাৎ গুণ্ডিচাবাড়ি বা বাগানবাড়ি, জগন্নাথদেবের জন্মস্থান। এই বাড়িতেই সূত্রধর ব্রহ্মদারু থেকে বিগ্রহ গড়েন। গুণ্ডিচাদেবী হলেন অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। এই রাজাই তৈরি করেন জগন্নাথ মন্দির। বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া মাসির বাড়ি প্রাচীরে ঘেরা। গোকুল থেকে ব্রজে এলেন শ্রীকৃষ্ণ-স্মারকরূপে আষাঢ়-শ্রাবণ (জুলাই) মাসে জগন্নাথদেব বোন সুভদ্রা আর দাদা বলরামকে সঙ্গী করে অবকাশ যাপনে মাসির বাড়ি।

নয়দিন অবকাশে কাটিয়ে ফিরে যান আবার শ্রীমন্দিরে। দেবতা আসেন ১৩.৫ মিটার উঁচু, ১০ মিটার বর্গাকার, ২.১ মিটারের ১৬ চাকার ৩ রথে জাঁকজমকপূর্ণ মিছিল করে শ্রীমন্দির থেকে আড়াই কি.মি. দীর্ঘ বড় দণ্ড অর্থাৎ গ্রান্ড রোড পেরিয়ে। নাম তার পহণ্ডি অর্থাৎ রথযাত্রা। আগে চলেন বলরাম, মাঝে সুভদ্রা, সবশেষে জগন্নাথ। একাদশীতে ফেরেনও দেবতা একইভাবে মিছিল করে–তার নাম বহুড়া অর্থাৎ উল্টোরথ। সিংহ দরজায় দেবতা ফিরে স্বর্ণবেশে সে রাতের মতো অবস্থান, পরদিন রত্নবেদিতে অধিষ্ঠান। দেবতা ফিরতে রথের কাঠ ভক্তদের মাঝে বিক্রি হয় স্যুভেনির রূপে। দেশ-দেশান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসেন, আসেন পর্যটক রথযাত্রায় সামিল হতে। এমনকি চৈতন্যদেবও একদা রশি টেনেছিলেন রথের। বংশপরম্পরায় পুরীর রাজার সোনার ঝাড়ুতে ছেড়াপানাহারা অর্থাৎ ঝাড় দেওয়া পথে হাজার হাজার লোকের টানে রথ চলে গড়গড়িয়ে–চলতে থাকলে থামা তার মুশকিল। সেই চলন্ত জগন্নাথদেবের রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে আত্মাহুতি দিতেন ভক্তের দল। রথ তৈরিও হয় প্রতি বছর নতুন নতুন। অক্ষয় তৃতীয়ায় শুরু হয়ে ১০৭২টি গাছের গুঁড়ি থেকে ২১৮৮টি কাঠের টুকরোয় তৈরি হয় নন্দীঘোষ বা গরুড়ধ্বজা (১৩.৫ মি.) অর্থাৎ জগন্নাথের রথ, দর্পদোলনা বা পদ্মধ্বজা

১১.৫ মি. অর্থাৎ সুভদ্রার রথ, তালধ্বজা ১২ মি. অর্থাৎ বলরাম বা বলভদ্রের রথ। প্রতি রথেই মূল দেবতা ছাড়াও ৯ জন পার্শ্ব দেবদেবী, ২ জন দ্বারপাল, ১ জন সারথি, ১ জন ধ্বজা-দেবতা বা শীর্ষদেবতা অধিষ্ঠিত হন। সবাই দারুর তৈরি। ১৬০০ মি. উজ্জ্বল রঙা কাপড়ে সুসজ্জিত করা হয় রথযাত্রীকে। এছাড়াও ৬২ ধর্মী উৎসব ঘটে চলেছে বছরের পর বছর জগন্নাথ মন্দিরে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জন্মস্থান

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীপুরী ধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে নারায়ণ ছাতার সংলগ্ন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্তন মুখরিত বাসভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে অবতীর্ণ হন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে এই শিশুর নাম রাখেন শ্রীবিমলাপ্রসাদ।

শিশুর আবির্ভাবের ছয় মাস পরে রথযাত্রা মহোৎসব উপস্থিত হয়। সেই বৎসর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাসগৃহের দ্বারের সম্মুখে তিনদিন রথারূঢ় জগন্নাথদেব স্বেচ্ছায় অবস্থান করেন। ঐ সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিন দিবসকাল শ্রীহরিকীর্তনোৎসব হতে থাকে। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়ে শায়িত ছয়মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হস্ত প্রসারণপূর্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ এবং শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হতে একটি প্রসাদী মালা গ্রহণ করলেন। শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করে শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করেন। শিশু জননীর সহিত দশমাসকাল শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করে পাল্কিযোগে স্থলপথে বঙ্গদেশে আগমন করেছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকাকালে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ পুরী হতে তুলসীর মালিকা এনে বালককে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করেন। বালক শ্রীগৌর প্রণয়ী মহাভাগবতের গ্রহে আবির্ভূত হয়ে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরভক্তিতে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীভাগবত, ভক্ত ও ভগবানের লীলাস্থলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়েছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ যখন কলকাতায় তাহার ভক্তিভবন নির্মাণ করেন, তখন গৃহের ভিত্তি খননকালে শ্রীকূর্মদেবের শ্রীমূর্তির আবির্ভাব হয়। বালককে ভক্তিবিনোদ শ্রীবিষ্ণুপূজা ও তিলকাদি ধারণ ও বৈষ্ণব সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ কলকাতায় একটি ভক্তিগ্রন্থ প্রচার বিভাগ ও তজ্জন্য মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে বালক সেই সকল সেবায় মহাভাগবত শ্রীপিতৃচরণের সেবাকুল্য করেন। তিনি বাল্যকালেই শ্রীগৌর প্রণয়ী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত শ্রীগৌরমণ্ডলস্থ শ্রীগৌর পার্ষদবৃন্দের শ্রীপাটসমূহ ভ্রমণ করে মহতের সেবা ও ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। শ্রীরামপুরের পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ও আলোয়ার নিবাসী পণ্ডিত সুন্দর লাল নামক অধ্যাপকদ্বয়ের নিকট গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, পৃথীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্তকৌমুদী ও বেদ এবং সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি অধ্যয়ন করেন। তাহার মহাভাগবত গুরুবর্গ তাহাকে বাল্যকাল হতে শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা প্রকাশ করে পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমদভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নামে বিদিত হন। তিনি বিশেষ স্থলে শ্রীবার্ষভানবী দয়িত দাস নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করেছিলেন।

স্বর্গদ্বার লাগোয়া কানপাতা হনুমান/বিদুরপুরী/মহোদধি/সুদামাপুরী-

শোনা যায়, বীর হনুমান আজও কান পেতে রয়েছে প্রলয়ঙ্কর সমুদ্রে গতিবিধি নজরে রাখতে। বিদুরের স্মৃতিবিজড়িত গলিপথের বিদুরপুরীতে আজও শাক ও খুদের প্রসাদ মেলে। তেমনই আছে নানান নারায়ণ শিলা বিদুরপুরীতে। সুদামাপুরীতে পাতালগঙ্গা, গুপ্ত তীর্থের অবস্থান পাশাপাশি। আর হয়েছে নতুন করে আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত (৭৮৮-৮২০ খ্রি.) গোবর্ধন মঠ (মঠের লাইব্রেরির সংগ্রহ উল্লেখ্য), নানক মঠ, কবীর মঠ, শঙ্করাচার্য মঠ, কারার আশ্রম, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, শ্রী অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম, গৌড়ীয় মঠ, নীলাচল আশ্রম, যতিরাজ মঠ, টোটাগোপীনাথ ছাড়াও দেড়শ মঠ হাঁটা দূরত্বে পুরীতে। পুরীর নামান্তরও ঘটেছে বারবার- নীলাচল, নীলগিরি, নীলাদ্রি পুরুষোত্তমক্ষেত্র, শঙ্খক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, জগন্নাথক্ষেত্র (ধাম), সর্বশেষ পুরী।

পুরীর অন্যতম আকর্ষণ জগন্নাথ মন্দির বা শ্রীক্ষেত্র। সন্ন্যাসীর কাছে বার্তা পেয়ে সত্য যুগে অবন্তীরাজ সূর্যবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতিকে পাঠান বিষ্ণুর সন্ধানে ওড্র (ওড়িশা) রাজ্যে। বিদ্যাপতির দর্শনও মেলে শবর গৃহে নীলমাধবরূপে বিষ্ণুর। ইন্দ্রদ্যুম্নও ওড্রে এলেন বিষ্ণুর দর্শন লাভে। বিফল ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন, নারদ সান্ত্বনা দেন শিলায় নয়, দারুতে দর্শন মিলবে বিষ্ণুর। নীলমাধবের স্বপ্নাদেশ মতো দারুও মেলে চক্রতীর্থে। কিংবদন্তি, কৃষ্ণের নাভী অর্থাৎ পরমব্রহ্ম দ্বারকা থেকে ভেসে আসে পুরীর সমুদ্রে ব্রহ্মদারু রূপে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই দারুই প্রতিষ্ঠা করেন দৈবরূপে মহাবেদীতে। আবার দৈববাণী পান রাজা। সেই মতে ১০০০ মি. উঁচু মন্দিরও গড়েন ইন্দ্রদ্যুম্ন। শিল্পশাস্ত্রের আদি প্রবর্তক বিশ্বকর্মা তথা জগন্নাথদেব সূত্রধরের বেশে বিগ্রহ গড়তে আসেন। রুদ্রদ্বার কক্ষে ২১ দিনে সূত্রধর দরজা না খুললে কেউ আসবেন না শর্তাধীনে রাজা রাজি হতে সূত্রধর বিগ্রহ গড়া শুরু করেন। অধৈর্য রানির তর সয় না। শর্ত ভেঙ্গে দ্বাদশ দিনে দরজা খোলেন রানি। ঘরে ঢুকে দেখেন সূত্রধর উধাও, দেববিগ্রহ অসম্পূর্ণ–হাত, পা তখনও বাকি। প্রতিষ্ঠা করেন রাজা সেই অসম্পূর্ণ বিগ্রহ (বলভদ্র, সুভদ্রা, জগন্নাথ, সুদর্শন)।

পৌরাণিক যুগের সেই মন্দির ধ্বংস পেতে রাজা যযাতি কেশরী মন্দির গড়েন নতুন করে। আর ব্রাহ্মণ নিধনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ শতকে গড়েন আজকের এই মন্দির। ৫ লক্ষ তোলা সোনা খরচ হয় মন্দির গড়তে। তারও পরে গজপতি রাজাদের অর্থানুকূল্যে এর শ্রীবৃদ্ধি। ওড়িশার প্রতিটি দেবমন্দির বিমান, নাটমণ্ডপ, ভোগমণ্ডপ, জগমোহন চার ভাগে গড়া। ৬৭০ দ্ধ ৬৪০ ফুট ব্যাপ্ত জগন্নাথ মন্দির মেঘনাদ প্রাচীরে (২০-২৪ ফুট) ঘেরা। মন্দিরের চারপাশে ৪ প্রবেশদ্বার–সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার,

অশ্বদ্বার, খাঞ্জাদ্বার। পূর্বেও মূল প্রবেশপথ, সিংহদ্বারের সামনে ১৮ শতকে খুরদার রাজাদের কোণারক থেকে আনা ৩৪ ফুট উঁচু ক্লোরাইট পাথরের সূর্যের সারথি অরুণ স্তম্ভ, শিরে তার গরুড়। প্রস্তরের দুই সিংহমশাই গেট পাহারায় রত। তেমনই দক্ষিণ, পশ্চিম আর উত্তরের দ্বারে ঘোড়া, বাঘ ও হাতির অবস্থান। ২২ ধাপ উঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দিরের প্রাঙ্গণও ২২ ফুট উঁচু। সুরক্ষার খাতিরে আবার ৪২৪×৩১৫ ফুটের কুরু মেঘনাদ প্রাচীর। এরও তোরণ চারটি। পুবে ৫৮×৫৬ ফুটের ভোগ মণ্ডপ। তোরণে নবগ্রহের মূর্তি। ১৬ স্তম্ভে ভর করা নাটমন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮০ ফুট। পশ্চিমে জগমোহন ৮০×১২০ ফুটের। তার পিছনে বিমান বা বড় দেউল। এটিরও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই ৮০ ফুট, উচ্চতা ১৯২ ফুট। দ্বিতীয় প্রাচীর পেরুতেই হিন্দু দেবদেবীর অভিনব সমাবেশ ঘটেছে। কাশীর বিশ্বনাথ, রামচন্দ্র, জয়-বিজয়, বদ্রী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, বটকৃষ্ণ, মঙ্গলদেবী, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বটেশ্বর লিঙ্গ, ইন্দ্রাণী, সূর্যদেব, ক্ষেত্রপাল, নরসিংহদেব, গণেশ, ভূষণ্ডীকাক, বলরাম-পত্নী তান্ত্রিক দেবী বিমলা, জগন্নাথ পত্নী লক্ষ্মী, সর্বমঙ্গলা, কালী, সূর্যনারায়ণ, পাতালেশ্বর, শীতলামাধব, বুদ্ধদেব, গৌরাঙ্গদেব—অর্থাৎ সর্বতীর্থের সমন্বয় ঘটেছে শ্রীক্ষেত্রে। আর রয়েছে নাটমন্দিরের শেষে স্তম্ভাংশ যাতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হাত রেখে বিভোর হতেন জগন্নাথদেবে। ভক্তজনেরা আজও স্তম্ভে শ্রীচৈতন্য হাতের পরশ নেন। জনশ্রুতি আছে যে, লীনও হন দেবসনে শ্রীচৈতন্য। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নর-নারীর শৃঙ্গার মূর্তিও রূপ পেয়েছে মন্দির গাত্রে। দেব-দেবীর সমাবেশে মন্দিরের অলঙ্করণ তথা কারুকার্যও আকর্ষণ করে পর্যটকদের। মন্দিরের অন্দরের দেওয়ালে পৌরাণিক আখ্যানে সমৃদ্ধ পটচিত্র ও স্তম্ভের ব্যাস রিলিফের খোদাই কাজেও বৈচিত্র্যের সাথে অভিনবত্ব মেলে। বিষয়-বৈচিত্র্য ও রঙের জৌলুস উল্লেখ্য। তেমনই গর্ভগৃহের বিপরীতে দেওয়ালের আধা জুড়ে দশাবতারের ছবিতেও বৈচিত্র্য মেলে—বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে নবম অবতাররূপে স্বয়ং জগন্নাথদেব উপস্থিত।

মূল মন্দিরের রত্নবেদিতে রয়েছেন সাত মূর্তি অর্থাৎ সাত রত্ন। সফেদ রঙা মুখাবয়বের বলরাম, সঙ্গী তার কালোবরণ মুখের ভাই জগন্নাথ-ভালে হীরক, মাঝে তাদের পীতমুখী বোন সুভদ্রা। এদের পাশে সুদর্শন চক্র। বামদিকে সোনার লক্ষ্মী, ডানে রুপোর সরস্বতী, পিছনে নীলমাধব। মূল দেবতা ব্রহ্মদারুতে তৈরি। যে বছর দুটি সৌর আষাঢ় মাস অর্থাৎ আষাঢ় মাসে দুটি অমাবস্যা পড়ে, সে বছরই দেবতার বিগ্রহ নতুন করে হয়ে থাকে। নাম তার নবকলেবর। গত ১৯৯৬ শতকে জাঁকজমকের সাথে নবকলেবর উৎসব যাপিত হয়েছে। মন্দিরের উত্তরে প্রাচীরের বাইরে বৈকুণ্ঠ (বাগান) ধাম-দেবতার নবকলেবর হলে পুরাতন বিগ্রহ সমাধিস্থ হয় বৈকুণ্ঠধামে।

আজ আর ব্রহ্মদারু ভেসে না এলেও স্বপ্নাদেশে দারুর সন্ধান মেলে। তিথির রকমভেদে ২১টি বেশে সজ্জিত হন জগন্নাথদেব। দিনের নানান সময়ে (সাতবার) বেশেরও বদল হয়। পূজার পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আছে। আটকিয়া বলে তাকে। ২২.৫০ থেকে ১,৩২,০০০ টাকায় পুজোর কথা। কমেও পূজা দেওয়া যায়, তবে, অন্নদান আটকিয়া নয়। ৬০০০ পুরোহিত আর ২০০০ কর্মী জীবিকা নির্বাহ করেন মন্দিরের ক্রিয়াকর্মে।

৯৬ ধর্মী শ্রেণি (বংশগত) বিন্যাস এদের মাঝে। ছত্তিশা নিয়োগা প্রথায় দেব-সেবা থেকে শুরু করে সবেরই কর্ম-বিভাজন। বিশ্বে বৃহত্তম রান্নাঘরটিও হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে। চারশতের অধিক রাঁধুনী ২০০ উনুনে কাঠের আগুনে ১০০ ধরনের মহাপ্রসাদ অর্থাৎ দেবতার ভোগ রান্না করেন। কমপক্ষে ৫৬ ভোগ পরিবেশনের প্রথা। আর হচ্ছে প্রতিদিন ১০০০০ ভক্তের জন্য ৭০ কুইন্টাল চালের অন্ন। তবে, উৎসব অনুষ্ঠানে আড়াই লক্ষ যাত্রীর মহাপ্রসাদ মেলে। মন্দিরের আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ কিনতেও পাওয়া যায়। বিবিধ দামে বিভিন্নধর্মী মহাপ্রসাদ। ৫টায় মন্দির খোলা। তারই মাঝে স্নান-আহার-পূজার্চনা-বিশ্রাম সবই হচ্ছে দেবতার। সকাল বিকালে ২০ টাকার টিকিটে গর্ভগৃহে দেবদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তবে, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা থেকে আষাঢ়ী অমাবস্যায় দেবতার অনসর অর্থাৎ জ্বর হয়, দেবদর্শনও তাই মানা। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার স্নানযাত্রায় জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা স্নানবেদীতে ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করেন। স্নানান্তে গজবেশ ধারণ করেন দেবতা। কার্যত, জলে বিগ্রহের (দারুর) রঙ ধুয়ে যেতে নতুন করে অঙ্গরাগ অর্থাৎ রঙের বিন্যাসহেতু রথযাত্রার প্রাক্কালে বিগ্রহ লোকচক্ষুর অগোচরে থাকেন। অনসর হেতু প্রতিভূ হিসেবে তিন পটচিত্রে নারায়ণরূপে জগন্নাথ, বলদেবরূপে বলরাম, ভুবনেশ্বরীরূপে সুভদ্রার অবস্থান। দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দুদের। ৮ মিটার উঁচু টাওয়ার শিরে অষ্টধাতুর বিষ্ণুচক্র ও পতাকা- দূর থেকে দৃশ্যমান। ভক্তরা পতাকা বাঁধতে পারেন মন্দির অফিসে নির্ধারিত টাকা জমা দিয়ে। তেমনই সন্তান কামনায় নারীরা আজও মন্দিরের কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ বটবৃক্ষে মানত করেন। এরই পিছনে রোহিণী কুণ্ড। কুণ্ডের জলে স্নানে পাপ ক্ষয় হয়। সম্প্রতি সংস্কারও হয়েছে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্রীমন্দির।

আনন্দবাজার

শ্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্বদিকে মহাপ্রসাদ বিপণি বা আনন্দবাজার অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার ভোগের অন্নমহাপ্রসাদ, ছাপ্পান্ন ভোগের মিষ্টপ্রসাদাদি বিক্রয় হয়। বাজারের বেষ্টনীর মধ্যে রাজভোগের প্রসাদ বিক্রয়ের জন্য রাজার একটি দোকান আছে, প্রত্যেক প্রসাদের মূল্য নির্ধারিত আছে। আনন্দবাজারের শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের কোনো প্রকার স্পর্শ দোষ বা উচ্ছিষ্টাদির বিচার নাই। সমগ্র সাত্ত্বতশাস্ত্র উর্ধ্ববাহু হয়ে শ্রীশ্রী মহাপ্রসাদের মহিমা কীর্তন করছেন।

সমুদ্র

পুরীর সমুদ্রে স্বর্গদ্বারেই প্রথমে স্নান করার প্রথা। পুণ্যতীর্থও এই স্বর্গদ্বার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম স্নান করেন এই স্বর্গদ্বারে। ব্রহ্মে লীনও হন এই নীলাচলেই মহাপ্রভু। আর মহাদধি অর্থাৎ স্বর্গদ্বার সংলগ্ন সমুদ্রের অংশে। তীর্থযাত্রীদের অতীত পাপনাশের সাথে স্বর্গলাভ মেলে স্বর্গদ্বারের সমুদ্র স্নানে। পুরীধামে মৃত্যু হলে মোক্ষ লাভও হয়। কথিত আছে, সন্ত কবীরের পুরী অবস্থানকালে একদা তট ভাসিয়ে সমুদ্রের ধ্বংসলীলায় ক্ষিপ্ত কবীর স্বর্গদ্বারের কাছে মেলে বসে সমুদ্রকে শাসন করেন। সেই থেকে সমুদ্রও আর তট ভাসিয়ে ধ্বংস করেনি পুরীর জনপদ।-

ভুবনেশ্বর

লিঙ্গকোটি সমাযুক্তং বারাণসী সমপ্রভম

Abode of the Lord of Three World অর্থাৎ ত্রিভুবনেশ্বর থেকে ভুবনেশ্বর। ১৯৪৮ শতকে কটক থেকে সরে ৩৭ কি.মি. দক্ষিণে নতুন রাজধানী হয় ৪৫ মি. উঁচু ভুবনেশ্বর। অতীতে নাম ছিল এর একাম্রক্ষেত্র। বারাণসীতে শিবের বাস আর হেলথ রিসর্ট ভুবনেশ্বর। মাহাত্ম্যেও বারাণসীর পরেই ভুবনেশ্বর। দিল্লির মতো ভুবনেশ্বরও দুটো ভাগে গড়ে উঠেছে। একদিকে খ্রি.পূ. ৩ থেকে ১৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে গড়া ওড়িশার বিশ্বখ্যাত মন্দিররাজি, অপরদিকে অফিস-কাচারি-বসতবাড়ি নিয়ে গড়ে ওঠা নতুন রাজধানী নগরী। রেললাইন বিচ্ছেদ টেনেছে নতুন আর পুরাতন শহরে।

এই ভুবনেশ্বরই ছিল অতীতে কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। মৌর্য সম্রাট অশোকের (খ্রি.পূ. ২৭২-২৩৬)। ঐতিহাসিক কলিঙ্গ যুদ্ধও ঘটে আজকের ভুবনেশ্বরে। রক্তে রাঙা দয়া নদীর জলে বিচলিত সম্রাট শপথ নেন–জয় আর অসি দিয়ে নয়, প্রেম আর ভালোবাসাই হবে জয়ের মন্ত্র। তেমনই, ধৌলীর বিপরীতে খননে সন্ধান মিলেছে ২০০০ বছরের অতীত শিশুপাল গড়ের। আবার ভুবনেশ্বর থেকে যাওয়া যায় বিশ্ববিখ্যাত কোণাকের সূর্যমন্দির ও সৈকতনগরী তথা শ্রীক্ষেত্র পুরী।

ওড়িশার মন্দির সাধারণত একই আঙ্গিকে–বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ এই চার স্তরে গড়ে উঠেছে।

ভোগমণ্ডপ অর্থাৎ দেবতাকে অর্ঘ্য দেওয়ার ঘর, নাটমন্দিরে দেবদেবীদের নৃত্য, জগমোহন হচ্ছে মূল মন্দিরে প্রবেশের গাড়িবারান্দা, আর সবশেষে বিমান অর্থাৎ গর্ভমন্দির বা শ্রীমন্দিরে দেবতার অবস্থান। বিমানের মাথায় চুড়ো। সিংহ বিক্রম দেখাচ্ছে হাতিকে পিষ্ট করে অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বৌদ্ধধর্মকে খর্ব করে। এছাড়াও আরো অনেক মন্দির রয়েছে- লিঙ্গরাজের জগমোহন মন্দির, নিশাপার্বতী মন্দির, বিন্দুসরোবর, অনন্ত বাসুদেব মন্দির (১২৭৮ সন), মুক্তেশ্বর মন্দির, সিদ্ধেশ্বর মন্দির, পরশুরামের মন্দির, কেদার গৌরী মন্দির, রাজা-রানির মন্দির, রবীন্দ্রমণ্ডপ, বিড়লা সংস্থার রাম মন্দির, নয়া পল্লীতে ইস্‌কনের মন্দির, ইন্দিরা পার্ক (১৯৮৪, ৩০শে অক্টোবর জীবনের শেষ ভাষণ দেন ইন্দিরা)। মন্দিরের শেষ নেই ভুবনেশ্বরে। সব দেখা সম্ভব নয় তীর্থযাত্রীদের।

লিঙ্গরাজ মন্দির

অনেক উত্থান-পতনের মাঝ দিয়ে যযাতি কেশরী রাজা হলেন ওড়িশার। তিনি অযোধ্যা থেকে ১০০০০ (দশ হাজার) ব্রাহ্মণ আনেন নিজ রাজ্যে। গড়ে তোলেন মন্দিরের পর মন্দির বেলেপাথরে। ৭-১২ শতকে মন্দিরের সংখ্যা ৭০০০ ছাড়িয়ে যায়। তবে আজ আর সব মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। শ'খানেক স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আজকের পর্যটকদের অতীত আখ্যান শোনায়।

দেবতা এখানে স্বয়ম্ভু-আধা শিব, আধা বিষ্ণু অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের অধীশ্বর ত্রিভুবনেশ্বর। গর্ভগৃহে বিশাল শক্তিপীঠের উপর গ্রানাইট পাথরের ছত্রাকার ২.৫ মি. ব্যাসের লিঙ্গমূর্তি। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গরাজ।

রাজা যযাতি কেশরীর মৃত্যুর পর তাঁর পরিকল্পিত লিঙ্গরাজ মন্দির গড়েন ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে গঙ্গারাজা ললাট কেশরী। সূক্ষ্ম কারুকার্যময় বেলেপাথরে তৈরি নাগার শৈলীর মন্দিরে লোহা ব্যবহৃত হলেও কাঠের ব্যবহার নেই। লিঙ্গরাজের চারপাশ ১২৭ ফুট উঁচু, সাড়ে ৭ ফুট চওড়া প্রাচীরে ঘেরা। মন্দিরের প্রাঙ্গণ ৫২০ x ৪৬৫ ফুটের। ১০৮টি মন্দিরের উপনিবেশ এই লিঙ্গরাজ। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ১০০ বছরের আগের তৈরি, আকারে জগন্নাথ থেকে ছোট লিঙ্গরাজ। মন্দিরের প্রবেশপথ তিনটি—পূর্বে মূল প্রবেশদ্বার সিংহদরজা, জোড়া সিংহদ্বার প্রহরায় রত।

অনন্ত বাসুদেব মন্দির

সুন্দর কারুকার্যময় ৬০ ফুট উঁচু প্রাচীন এই মন্দিরে দেবতা বিষ্ণু। এমনকি মন্দিরের এক শিলালিপিতে ভবদেব ভট্টের নাম মেলে—সমস্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সরোবরটি তারই খনন করা। তবে, তাত্ত্বিকদের মতে, ভবদেব ভট্টের হাতে সংস্কার হয় মন্দির তথা বিষ্ণু সরোবর। আর মন্দিরটি ১২৭৮ শতকে অনন্ত ভীমদেবের কন্যা চন্দ্রাদেবীর তৈরি।

বিন্দু সরোবর

পূরাণ বলে, অতীতে এই জায়গার নাম ছিল একাম্রকানন। এই জায়গাটি পার্বতীর খুব প্রিয় ছিল। একদা বিহারে বেরিয়ে পথে কৃত্তি ও বাস নামে দুই দৈত্যের সামনে পড়েন পার্বতী। বিয়ে করতে চায় ওরা পার্বতীকে। পার্বতীও রাজি। তবে এক শর্ত। সেই মতো দুই দৈত্য কাঁধে তুলল পার্বতীকে। দেবীর ভারে পিষে গেল ওরা। পার্বতী ক্লান্ত,

পিপাসার্ত। হাজির হলেন শিব। পার্বতীর পিপাসা মেটাতে তৈরি হলো সরোবর। শিবের আহ্বানে সমস্ত নদ-নদীর সরোবর বিন্দু বিন্দু করে জল দিল। সেই থেকে নাম বিন্দু সরোবর। ১৪শ x ১৫শ ফুটের বিন্দু সরোবরের গভীরতা ১৫ ফুট। জনশ্রুতি আছে, খুবই পবিত্র এই বিন্দু সরোবরের জল, স্নানে সর্বপাপ নাশ হয়। লিঙ্গরাজ থেকেও দেবতা আসেন জন্ম উৎসবে (অশোকাষ্টমীতে) বিন্দু সরোবরে স্নান করতে।

কোণারক সূর্য মন্দির

কোণারকের সূর্য মন্দির নির্মাতা–নরসিংহ দেব। পুরাণ বলে, ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের শাপে পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মৈত্রেয়ারণ্য অর্থাৎ আজকের কোণারকে এসে পুকুর পাড়ে সূর্যের আরাধনা করেন। ১২ বছরের আরাধনায় তুষ্ট সূর্যদেব বর দেন শাম্বকে। রোগমুক্ত হন শাম্ব। আরোগ্যলাভের পর শাম্ব মন্দির গড়ে সূর্যদেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। স্মারকরূপে মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে (জানু-ফেব্রুয়ারি) উৎসব হয়, মেলা বসে আজও ৩ কি.মি. দূরের চন্দ্রভাগা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে। স্নানে পুণ্য হয় চন্দ্রভাগায়। ঢেউয়ের প্রবণতা বেশি, সাবধানতা পদে পদে-খোলা বালি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। ৫ কি.মি. দক্ষিণে রামচণ্ডী নদীর মোহনার কাছে রামচণ্ডীর মন্দির। জনশ্রুতি আছে যে, মন্দিরটি শ্রীরামের গড়া।

ভাস্কর্যমণ্ডিত ভোগমণ্ডপ রেখে পূর্বদুয়ারি সূর্য মন্দিরের মূল প্রবেশপথে মর্মরের দুই সিংহমশাই হস্তীদলনে ব্যস্ত। মন্দিরের ১২০ ফুট উঁচু বিমানটি ১৮৬৯ শতকে ধসে পড়ে। তবে ৬০ ফুট উঁচু জগমোহনটি ব্রিটিশের হাতে সংস্কার হয়ে আজও বর্তমান। সিঁড়িও আছে জগমোহনে উঠবার। চূড়োর আগেই তিন ধাপ অলিন্দে সারি দিয়ে ক্লোরাইট পাথরের তিনটি সূর্যমূর্তি। আজও প্রত্যূষ, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তে কিরণ এসে পড়ে দেবতার মুখে। পিরামিডধর্মী ছাদ যেখানে সমতল তার নিচুতে লোহার কড়ি, লম্বায় এগুলো ২০

ফুট, চওড়ায় ৮ থেকে ১১ ইঞ্চি, আর ওজন ৭১ মণ প্রতিটির। ২০০০ টন পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল মন্দির তৈরিতে। মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ২০ টনের ২০ x ৪ ফুটের নবগ্রহ পাথরে সূর্য, চন্দ্র, শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও কেতু মূর্তি ছিল। ১৮৬৯ সনে ধসে পড়ে। তবে, অক্ষত এই নবগ্রহ পাথর মিউজিয়াম চত্বরে উত্তর-পূর্বে আজও দৃশ্যমান। ১৯৭৮ শতকে এর ক্ষতকেও সারিয়ে তোলা হয়েছে। ব্যাপক সংস্কারও হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের হাতে মন্দির। মন্দিরটি আজ UNESCO-World Heritage Site শিরোপায় ভূষিত।

পুরো মন্দিরটি ঘোড়ায় টানা রথের আকারে গড়ে উঠেছে। ঘোড়ার সংখ্যা সাত অর্থাৎ সপ্তাহের সাত দিন। দুপাশে বারো বারো–চব্বিশটি চাকা অর্থাৎ তার বারো মাসের চব্বিশটি পক্ষ। চাকায় আটটি করে স্পোক, তার অর্থ দিনের অষ্ট প্রহর। মন্দিরের সঙ্গে ৯ ফুট ব্যাসের চাকাগুলোও আজ ধ্বংসের মুখে। একটি চাকাই অক্ষত রয়েছে আজ। যেমন অনবদ্য কারুকার্য, তেমনই বলিষ্ঠ এর চিন্তাধারা, ভাবতেও বিস্ময় জাগে। তেমনই মন্দিরের ভাস্কর্যে শক্তির প্রতীক সিংহ, ধনের প্রতীক হাতি, ন্যায়ের প্রতীকরূপে মানুষ গৃহীত। সূর্যালোকের প্রতিফলনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ মনে হবে চাকাগুলো চলমান। মন্দিরের উপানা অর্থাৎ চতুষ্কোণ পীঠিকা (প্লিনথ)-য় ১৭০০ শতকে অধিক হাতি শোভিত। পাঁচ ভাগে বিভক্ত সমতল প্ল্যাটফর্মটির অলঙ্করণের অভিনবত্ব আছে। দেওয়ালেও কারুকার্যময় নানা দেব-দেবী, চার মাথা ছয় হাতের শিব, পৌরাণিক মূর্তি, নাচ-গান ও মৃদঙ্গ, করতাল বীণা, বাদ্যরতা মোহিনীদের অপরূপ মূর্তি, মিথুন মূর্তিও মূর্ত হয়েছে মন্দির গাত্রে। আধিক্যও ঘটেছে মিথুন মূর্তিতে। তেমনই আছে মন্দিরময় ব্যাস-রিলিফে–যুদ্ধে চলেছেন রাজা, রাজার মৃগয়া, রাজদরবারের নানা আখ্যান, খেদা প্রথায় হাতি ধরা। এমনকি জিরাফও মূর্ত হয়েছে ১৩ শতকে আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসার প্রতীকরূপে। নিচু থেকে সিঁড়ি পথে উপরে উঠে প্রথম চাতালের কন্যা-মূর্তিগুলোও সুন্দর। চার কোণে আটটি নৃত্যশীল ভৈরব মূর্তিও দেখবার মতো। প্রাঙ্গণ থেকে দৃশ্যমান দেউলের সূর্য দেবতার (তিন) মূর্তিতেও অভিনবত্ব আছে। তেমনই প্রাঙ্গণের প্রায় শেষে সুসজ্জিত যুগল হস্তী রণসাজে ঘোড়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অভিনবত্বের সাথে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে অনন্য কোণারকের এই শিল্পকর্ম। অবশ্যই সূর্য-পত্নী ছায়াদেবীর ছাদহীন মন্দিরটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। মন্দিরটি ভাঙ্গা হলেও বেশকিছু ভাস্কর্য আজও রয়েছে।

জগমোহনের পিছনের ২২৭ ফুট উঁচু রেখ দেউলটি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। সূর্যদেবের সবুজ ক্লোরাইট পাথরের মূল মূর্তিটিও অপসারিত। মন্দিরের উপরে কুম্ভপাথর নামে বিরাট একখণ্ড চুম্বক ছিল অতীতে। চুম্বকের আকর্ষণীয় শক্তিও ছিল ব্যাপক। সমুদ্রপথে জলযানের আকর্ষণীয় শক্তিতে গতিপথ হারাত। সময়ে সময়ে যন্ত্রও বিকল হয়ে পড়ত। তেমনই একটি বিপদগ্রস্ত জাহাজের নাবিকেরা এসে চুম্বকটি নাকি ভেঙ্গে দেয়। যবনেরা মন্দির ধ্বংস না করলেও মন্দির শীর্ষে সুবিশাল আমলকের উপর বসানো ধাতব কলস ও ধ্বজদণ্ড তুলে নিয়ে যায়। আর, যবন হানার আশংকায় ১৭ শতকে রাজা মুকুন্দদেব

দেববিগ্রহ পুরীর মন্দিরে স্থানান্তর ঘটান। তবে, বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয় এ আখ্যান। আর দেবতাও দিল্লির মিউজিয়ামে অধিষ্ঠিত। যে কোনো ধর্মের যে কোনো বর্ণের পর্যটকদের কাছে সূর্যমন্দিরের দ্বার আজ উন্মুক্ত।

হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা সঠিক খুঁজে পাওয়া ভার। তবে সিবাই সাঁতরার কর্তৃত্বে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে ১২০০০ (বারো হাজার) শ্রমিকের শ্রমে ১২ শত স্থপতির নিখুঁত স্থাপত্য অমর করে রেখেছে কোণারককে। হয়ত বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের গরিমাকেও ম্লান করত সূর্যমন্দির। হিউয়েন সাং বলেছেন, এখানে একটি বন্দর ছিল, নাম তার চেরিতালা। খুবই বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বন্দরকে ঘিরে। আবার আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজলের অভিমত, কেশরী বংশের রাজা ৯ শতকের শেষ ভাগে একটি সূর্য মন্দির গড়েন। ১২ বছরের রাজস্ব খরচ হয়েছিল সেই মন্দির গড়তে। সেই মন্দিরটিই আজকের এই সূর্য মন্দির। তবে ইতিহাস বলে, গঙ্গাবংশের অমিতবিক্রম রাজা নরসিংহদেব ১ম বাংলা জয়ের স্মারকরূপে ১২৪৩-৫৫ খ্রি. সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আঙ্গিকে ভারতীয় মন্দির থেকে স্বতন্ত্রতা পেয়ে প্যাগোডাধর্মী, রং-ও তার কালো, তাই জলপথের নাবিকদের কাছে ব্ল্যাক প্যাগোডা নামেও খ্যাত ছিল সেকালে। কোণারক ছিল সেযুগে প্রাচ্যের সম্পূর্ণ বন্দরনগরী। সূর্য মন্দিরের সামনে ছিল বঙ্গোপসাগর, অদূরে চন্দ্রভাগা নদী। সেকালে উদিত সূর্যের প্রথম কিরণ পড়ত মন্দিরে সূর্যদেবের মুখে কোণাকুণি হয়ে। তাই নামটিও হয়েছে কোণ+অর্ক (সূর্য)=কোণার্ক। বিজলী আলোয় ১৮-২২-০০ টায় দেউড়ি থেকেও দেখে নেওয়া যায় কোণারকের ভাস্কর্য।

রেমুণা

এই স্থান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এবং শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর লীলাভূমি। রেমুণা বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর নীলাচলে যাওয়ার পথে এখানে এসেছিলেন। পূর্বে নীলাচলে যাওয়ার রাস্তা রেমুণার মধ্যদিয়ে ছিল। যেহেতু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই রাস্তায় গমন করেছিলেন, তাই এই পথের নাম গৌরদণ্ড। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রেমুণায় এসে ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীকে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং অপলক নেত্রে গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। তিনি যখন গোপীনাথজীকে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন তখন গোপীনাথজীর পুষ্পচূড়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মস্তকে পতিত হয়েছিল। গোপীনাথের পুষ্পচূড়া পেয়ে মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং ভক্তদের নিয়ে তিনি বহু নৃত্যগীত করেছিলেন।

গুপ্ত বৃন্দাবন রেমুণা

পবিত্র এই দেবভূমি উৎকল। এই দেশের মহোদধি তীরে পরম পুণ্য ধাম শ্রীক্ষেত্র। এইখানে শ্রী নীল কন্দরে দারু বিগ্রহে চতুর্দ্ধা মূর্তিরূপে জগতের নাথ শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। পতিতদিগের পাবন করার জন্য দুটি বাহু তুলে বিরাজমান করিতেছেন। এই পুণ্যভূমি উৎকলের উত্তর সীমানা বালেশ্বর জেলা অবস্থিত। বালেশ্বর

সদর মহকুমা থেকে পশ্চিম দিকে আপাতত আট কিলোমিটার বা ছয় কিলোমিটার দূরে পরম রমণীয় ধাম রেমুণা অবস্থিত। রমণ শব্দ থেকে রেমুণা নিষ্পন্ন হয়েছে। তার ব্যতিরেকে এই স্থান অত্যন্ত রমণীয়। অতএব, রমণীয় বলে এই স্থানের নাম রেমুণা হয়েছে। পরম রমণীয় বৈষ্ণব ক্ষেত্র এই রেমুণা গুপ্ত বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সর্ব অবতারের যিনি স্বয়ং অবতারী সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের দ্বাপর যুগের লীলা এইখানে গুপ্তভাবে সূত্রপাত হয়েছে।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

পুরাণ প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ তখন বালেশ্বর জেলার রেমুণা ধামে বিরাজমান করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান দ্বারা ত্রেতাযুগে লিখা হয়ে মাতা জানকীর কর স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন। ইনি দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ লীলার একটা প্রতীক হন। উৎকল নরপতি লাঙ্গুলা নরসিংহ দেব ঐ মূর্তিকে উদ্ধার করে রেমুণায় প্রতিষ্ঠা করেন। তখন রাজমহিষী নাম রাখলেন শ্রীগোপীনাথ। তারপর ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীকে ক্ষীর লুকাইয়া দিলেন, তাই নাম হলো ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। মন্দিরের সিংহাসনের মাঝখানে শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীগোবিন্দ আর দক্ষিণে শ্রীমদনমোহন বিরাজ করছেন। অপরদিকে ছোট-ছোট মূর্তি পুজো হচ্ছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রেমানন্দে আবিষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য শ্রীগোপীনাথদেবের ক্ষীর চুরির অমৃতময় পুণ্য কাহিনী ভক্তগণকে বলতে লাগলে ভক্তগণ মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করতে লাগলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবন থেকে শান্তিপুর

হয়ে যখন মলয়জ চন্দন সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ দেশে যেতে ছিলেন তখন তিনি রেমুণায় এসেছিলেন। রেমুণায় শ্রীগোপীনাথদেবের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বসে প্রেম বিহ্বলভাবে পরম সুন্দর অপূর্ব শ্রীমূর্তি দর্শন করে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করলেন। শ্রীবিগ্রহ সেবার পবিত্রতা, সৌষ্ঠব ও পরিপাটি দেখে পুরী গোস্বামীপাদের মনে বড় আনন্দ হলো। তিনি মনে অনুমান করলেন যে, উত্তম জিনিসই গোপীনাথের ভোগে দেওয়া হয়, কী কী দ্রব্য দেওয়া হয়, কিরূপে তা প্রস্তুত হয়, তা জানতে পারলে তিনিও গোবর্ধনে গিয়ে ঠিক সেইভাবে সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত করে শ্রীগোপালের ভোগে দিতে পারবেন। পূজারী সেবাইত ব্রাহ্মণকে তিনি ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করলে পূজারী বলতে লাগলেন–
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম।

দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥
গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর॥ চৈঃ চঃ

তখন ভোগের সময় উপস্থিত হইয়া এই কথা বলেই পূজারী ঠাকুর শ্রীগোপীনাথদেবের অপূর্ব ক্ষীর ভোগ দিতে চলে গেলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী তখন মনে মনে ভাবলেন–

অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ যদি অল্প পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, অযাচক বৃত্তি ছিল অর্থাৎ ভোজনের জন্য কারো কাছে কিছুই চাইতেন না। শ্রীগোপীনাথের ক্ষীর প্রসাদ পাবার বাসনা তাঁর মনে উদিত হলে তিনি মনে করলেন যে, তাঁর অযাচক বৃত্তির হানি হলো, তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করলেন। তিনি বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হয়ে অপরাধ হতে মুক্ত হবার জন্য শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করলেন। এক্ষণে শ্রীগোপীনাথের ক্ষীর ভোগের আরতির ঘণ্টা বাজল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী আরতি দর্শন করে শ্রীগোপীনাথদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে শ্রীমন্দির হতে বের হলেন। পুরী গোস্বামীপাদ ক্ষীরে লোভ হলে আপনাকে মহাঅপরাধী মনে করে দুঃখিত হৃদয়ে গ্রামের নির্জন এক প্রান্তদেশে একটি শূন্য হাটে মৃদু মৃদু মধুর হরিনাম করতে লাগলেন। প্রেমাশ্রু ধারায় তার বক্ষস্থল ভেসে ভূমিতল সিক্ত হলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার কোনোরূপ কষ্ট হয় না, কেননা প্রেমরূপ অমৃতে সর্বদাই তিনি পরিতৃপ্ত থাকেন।

এদিকে পূজারী ঠাকুর শ্রীবিগ্রহকে ক্ষীরভোগ দিয়ে যথাবিধি স্তুতি বন্দনা করে রাত্রিতে তাঁকে শয়ন দিলেন। প্রসাদী ক্ষীরভাণ্ড সকল ভোগের স্থান হতে স্থানান্তরিত করে নিজ কৃত্য সমাপনপূর্বক পূজারীও শয়ন করলেন। দ্বাদশ ক্ষীরভাণ্ডের মধ্য হতে একটি প্রসাদী ক্ষীরভাণ্ড শ্রীগোপীনাথদেব চুরি করে তাঁর পীত ধরা দ্বারা আবৃত করে লুকিয়ে রাখলেন, পূজারী ঠাকুর তা আর বুঝতে পারলেন না। কারণ, তিনি ক্ষীরভাণ্ড সকল এক এক করে গণনা করে নিয়ে যান নাই। পূজারী রাত্রিতে শয়ন করে নিদ্রিত হয়েছেন। নিদ্রিত অবস্থায় পূজারী ঠাকুর স্বপ্নে দেখলেন যে, শ্রীগোপীনাথদেব তাঁর শিরোভাগে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে

সম্বোধন করে বলছেন–

নিজ কৃত করি পূজারী করিলা শয়ন। স্বপনে ঠাকুর আসি বোলেন বচন ॥
উঠহ পূজারী! দ্বার করহ মোচন। ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী-কারণ ॥
ধরার আঁচলে ঢাকা ক্ষীর হয়। তোমরা না জানিলে তা আমার মায়ায় ॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া। তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥ চৈঃ চঃ

পূজারী ঠাকুর স্বপন দেখে শয্যব্যস্ত হয়ে শয্যা ত্যাগ করে স্নানপূর্বক শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করালেন। শ্রীগোপীনাথদেবের পীতধরার নিম্নে একখণ্ড প্রসাদী ক্ষীর রয়েছে দেখে তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হলেন। তাঁর নয়নাশ্রুধারা বিগলিত হলো। তিনি প্রসাদী ক্ষীরভাণ্ড নিয়ে সে স্থানটি লেপন করে শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ করে পথে বের হলেন। সেই রাত্রিতে পূজারী একাকী গ্রামের হাটে ভ্রমণ করে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। রাত্রিপ্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শ্রীগোপীনাথদেবের পূজারী কাউকে দেখতে না পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন –

ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥
ক্ষীর লঞা পুরী তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী হাটের এক প্রান্তে নির্জনে বসে নামানন্দে বিভোর আছেন। পূজারীর কণ্ঠধ্বনি তাঁর কর্ণে প্রবেশমাত্র তিনি সাড়া দিয়ে আত্মপরিচয় দিলেন। পূজারী ঠাকুর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর দর্শন লাভ করে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রসাদী ক্ষীর তাঁর হাতে দিলেন। তারপর ক্ষীরভাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর প্রতি শ্রীগোপীনাথদেবের কৃপার কথা অনুপূর্বিক বললেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ পূজারীর মুখে কৃপানুজ্ঞার কথা শুনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভূমিতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমভাব দেখে পূজারী ঠাকুর বিস্মিত হয়ে মনে মনে ভাবলেন–"বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণ এই গোস্বামীপাদের বশীভূত। এই বলে পূজারী ঠাকুর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে প্রণাম করে শ্রীমন্দিরে ফিরে আসলেন। এদিকে প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়ে পুরী গোস্বামীপাদ প্রসাদী ক্ষীর ভক্ষণ করে প্রেমোন্মত্তভাবে নৃত্য করতে লাগলেন। শূন্য ক্ষীরভাণ্ডটি ভগ্ন করে বহির্বাসে বন্ধন করে রাখলেন। প্রতিদিন মৃৎভাণ্ডের একটু ভক্ষণ করে প্রেমোন্মত্ত হতেন।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী মনে মনে ভাবলেন শ্রীগোপীনাথদেব আমার জন্য ক্ষীর চুরি করেছেন একথা লোকে শুনলে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হবে, বহু লোক এসে সম্মান করবে। এই ভয়ে তিনি সেই রাত্রি শেষে শ্রীগোপীনাথের উদ্দেশ্যে শত শত দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে শ্রীনীলাচল ধামে যাত্রা করলেন।

এদিকে রজনী প্রভাতে শ্রীগোপীনাথদেবের ক্ষীর চুরির বৃত্তান্ত সর্বত্র প্রচারিত হলো। তখন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে বহু অনুসন্ধান করেও কেহ তাঁকে আর রেমুণায় দেখতে পেলেন না।

প্রতিষ্ঠার ভয়ে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী রেমুণা হতে রাত্রে কাউকে না বলে পলায়ন করে শ্রীক্ষেত্র ধামে আগমন করেন, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে আসা মাত্রই চারিদিকে তার প্রতিষ্ঠার কথা প্রচারিত হলো। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের স্বভাব এই যে, ভক্ত প্রতিষ্ঠা না চাইলেও আপনাআপনি তাঁর সঙ্গে চলে আপনা হতেই তার সুখ্যাতি হয়। বিধাতাই তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্বত্র ঘোষণা করেন।

মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সমাধি

ভক্ত শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী যাঁর জন্য প্রভু গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করে দিয়ে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হয়েছেন, তাঁর অন্তিম জীবন এখানেই অতিবাহিত হয়েছিল। অন্তিম সময়ে এই স্থানে অবস্থান করবার সময় তাহার প্রিয় শিষ্য স্বহস্তে অনেক সেবা করেছিলেন। পুরীপাদের অপ্রকট হওয়ার পর তাহার শরীরকে সমাধি দিয়েছেন। যদীয় কাষ্ঠ পাদুকা বিদ্যমান এবং অদ্যাবধি তাঁর পূজা হচ্ছে। শ্রীপাদের প্রতিমূর্তি ঐ সিদ্ধাশ্রমে আছে। আশ্রমের দায়িত্বে থাকা সন্ন্যাসী মহন্তকে মহারাজ বলা হয়। প্রত্যেক দিন মঠে শ্রীমদ্ভগবত গীতা আর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তথা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। পুরীপাদের প্রয়াণ তিথিতে এখানে মহোৎসব হয়।

সাক্ষীগোপাল

সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত সাক্ষীগোপাল বা সত্যবাদীর মন্দির। ভক্তের সাধনায় তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে শর্তাধীনে কলিঙ্গে এলেন সাক্ষ্য দিতে। শর্ত লঙ্ঘনে লীন হয়ে রূপ নিলেন মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ। কালে কালে মন্দির। পুরী থেকে ১৭ কি.মি. উত্তরে পুরী-ভুবনেশ্বর বাসে দেখে নেওয়া যায় সাক্ষীগোপাল। জনশ্রুতি আছে, সাক্ষীগোপাল দর্শন ছাড়া পুরী ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সে বহুদিন আগের কথা। দক্ষিণ ভারতের বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রাকালে গয়া, বারাণসী ও প্রয়াগ ভ্রমণ করে অবশেষে মথুরায় এসে উপস্থিত হন। তারপর দ্বাদশ বন ও গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা শেষ করে তাঁরা বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দিরে এসে উপস্থিত হন। এই স্থানে পূর্বে একটি বিশাল মন্দির ছিল এবং সেখানে গোপালের সেবাপূজা হত। বিপ্রদ্বায় কেশীঘাট ও কালীয় হ্রদে স্নান সেরে মন্দিরে গোপালকে দর্শন করে সেখানে অবস্থান করলেন। গোপালের উভয়ের মন হরণ করেছিল তাই তারা সেখানে কয়েক দিন থাকার সিদ্ধান্ত নেন। বৃদ্ধ বিপ্রের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়, সেইজন্য ছোট বিপ্র সর্বক্ষণ তার সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। একদিন বড় বিপ্র ছোট বিপ্রকে বলতে লাগলেন, "তোমার সেবায় আমি অতীব তুষ্ট হয়েছি। আমার নিজের ছেলে হলেও এমনভাবে সেবা সে করত না। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার নিজের কন্যাকে তোমায় অর্পণ করতে চাই।" তখন ছোট বিপ্র বললেন, "আপনি অসম্ভব কথা বলছেন। এটি কি করে সম্ভব। আপনি কুলে ও ধনে অনেক উন্নত আর আমি হচ্ছি অকুলীন ও ধন বিদ্যাহীন। আমি আপনার কন্যার যোগ্য নই। আমি যে আপনার সেবা করেছি তা শুধু শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য।" বড় বিপ্র তবুও ছোট বিপ্রকে নিজের কন্যাদানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, ছোট বিপ্র যুক্তি দেখালেন যে, আত্মীয় স্বজনের অনুমতি ছাড়া

কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান কি করে সম্ভব? তখন ছোট বিপ্র ভীষ্মকের উপমা প্রদান করলেন। বির্ধরাজ ভীষ্মকের ইচ্ছা ছিল তাঁর কন্যা রুক্মিণীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করবেন। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মীর তাতে আপত্তি ছিল। সে চেয়েছিল শিশুপালের সাথে রুক্মিণীর বিয়ে হোক। তখন রাজা ভীষ্মক তার পুত্রের মতের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত রুক্মিণীদেবীর ভক্তি ও প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের সাথেই তার বিবাহ হয়েছিল। ছোট বিপ্রের সুযুক্তিপূর্ণ কথা শুনে বিপ্র আবার বললেন, "কন্যা হচ্ছে আমার নিজের ধন। আত্মীয়স্বজন যদি আপত্তি করেও তবু আমি তোমাকে কন্যাদান করব। এতে তুমি নিঃসন্দেহ থাকতে পার।" ছোট বিপ্র বললেন, আপনি যদি সত্যিই আমাকে আপনার কন্যাদান করতে চান তাহলে গোপালের সম্মুখে সেই কথা অঙ্গীকার করুন। তখন বড় বিপ্র গোপালকে বলল "তুমি সাক্ষী থাকলে তোমার সামনেই কন্যাকে ছোট বিপ্রের হাতে তুলে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম।"

বড় বিপ্র গোপালের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে, ছোট বিপ্র তখন গোপালকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "গোপাল! তুমি সাক্ষী থাকলে, যদি অন্যথা হয় তা হলে আমি তোমাকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াব যাতে ব্রাহ্মণের সত্য রক্ষা হয়।" অবশেষে ব্রাহ্মণ দুজন তাদের দেশে নিজ নিজ গৃহে ফিরে এলেন। কিছুদিন বাদে একদিন বড় বিপ্র তার প্রতিশ্রুতির কথা চিন্তা করতে লাগলেন এবং তা পালন করবার জন্য নিজের লোকজনকে ডেকে তাঁর প্রতিশ্রুতির যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁদের জানালেন। সেই কথা শুনে তারা হায় হায় করে উঠলেন এবং নীচকুলে মেয়ের বিবাহ দিতে তাঁরা একযোগে আপত্তি জানালেন। বড় বিপ্র বললেন, "আমি তীর্থে গোপাল বিগ্রহের সামনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই ব্রাহ্মণের ধর্ম রক্ষ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।" তখন আত্মীয় স্বজনেরা তাকে পরিত্যাগ করার ভয় দেখান এবং স্ত্রী, পুত্র বললেন, যে, তারা বিষপান করে মরবেন। বড় বিপ্র স্ত্রী, পুত্রকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যদি তিনি ছোট বিপ্রকে কন্যাদান না করেন। তা হলে ছোট বিপ্র গোপালকে দিয়ে সাক্ষীদান করিয়ে অবশ্যই কন্যার পানিগ্রহণ করবেন। তাঁর ফলে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হবেন। সেই কথা.শুনে পুত্রটি বললেন যে, এতে চিন্তার কোনো কারণ

নেই। কেননা প্রস্তরের বিগ্রহ এসে সাক্ষী দেবে তা অসম্ভব। তখন পিতার উদ্দেশ্যে পুত্রটি বললেন যে, তিনি যেন বলেন, "আমার কিছু স্মরণ নেই। তখন যা কিছু করার আমিই করব।" এই কথা শুনে বড় বিপ্র চিন্তিত মনে গোপালের চরণ চিন্তা করে মনে মনে প্রার্থনা করলেন, যাতে তিনি স্বজন রক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পালন উভয় দিক রক্ষা করেন।

পরের দিন ছোট বিপ্র হঠাৎ এসে বড় বিপ্রকে প্রণাম করে অভিযোগ সুরে বললেন যে, কেন তিনি এখনও পর্যন্ত কন্যাদান করছেন না। তখন অগত্যা বড় বিপ্র মৌন হয়ে থাকলে তার পুত্রটি একটি লাঠি নিয়ে ছোট বিপ্রকে মারতে এলেন এবং বললেন যে, তিনি বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইছেন। তখন ছোট বিপ্র প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গ্রামের কিছু লোকজনকে নিয়ে বড় বিপ্রের কাছে হাজির হলেন এবং অভিযোগ করে বললেন তাকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েও তিনি কন্যাদান করছেন না কেন? গ্রামের লোকেরা তখন ছোট বিপ্রের হয়ে বলতে লাগলেন, তিনি তো ঠিকই বলেছেন, কেন তাকে কন্যাদান করছেন না? বড় বিপ্র তাদের কাছে বলতে বাধ্য হলেন যে, তার এখন কিছুই মনে নেই। এই সুযোগে তার পুত্রটি বলতে শুরু করলেন যে, ছোট বিপ্র তার পিতাকে ধুতুরা খাইয়ে পাগল করে দেন এবং তার সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করেন এবং এখন আবার এসেছে কন্যাটিকেও বিবাহ করতে। এই কথা শুনে লোকজনকে সন্দেহ হলো, কেননা লোভবশত মানুষ ধর্মকে পর্যন্ত ভয় করে না। ছোট বিপ্র প্রতিবাদ করে সকলের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন যে, এঁরা এখন যুক্তি করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তীর্থযাত্রার সময় কন্যাকে আমার হস্তে অর্পণ করবেন তা তিনি বৃন্দাবনে গোপাল বিগ্রহকে সাক্ষী রেখে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনারা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে বৃন্দাবন থেকে গোপাল বিগ্রহকে এখানে নিয়ে এসে আমি তাকে সাক্ষী দেওয়াতে পারি।" ছোট বিপ্রের কথা শুনে বড় বিপ্র রাজি হয়ে বললেন, "এটি উত্তম কথা যদি বিগ্রহ স্বয়ং এসে সাক্ষী দেয়, তবে অবশ্যই আমি কন্যা দান করব।" এই প্রস্তাবে তার ছেলেটিও রাজি হয়ে গেল, কারণ তার দৃঢ়বিশ্বাস যে বিগ্রহ কিছুতেই এখানে এসে সাক্ষীদান করবেন না। তখন সকলের সামনে একটি চুক্তিপত্র লেখা হলো। তখন ছোট বিপ্র সকলের সামনে বলতে লাগলেন, "এই বড় বিপ্র অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। ইনি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাননা। একমাত্র স্বজনদের মৃত্যু ভয়ে অসত্য কথা বলছেন। আমি এই ব্রাহ্মণের পুণ্যের দ্বারা কৃষ্ণকে এখানে এনে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব।"

ছোট বিপ্র আর দেরি না করে সোজা বৃন্দাবনে গোপালের কাছে উপস্থিত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে বলতে লাগলেন, "হে ব্রাহ্মণের ধর্মরক্ষক, তুমি অত্যন্ত দয়াময়। তুমি দয়া করে আমাদের দুই ব্রাহ্মণের ধর্ম রক্ষা কর।" ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হতে চলেছে। তাই তুমি এসে সাক্ষী দিয়ে ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর।" তখন কৃষ্ণ বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকজনকে ডেকে একটি সভার আয়োজন কর এবং আমাকে স্মরণ করবে। তখন আমি নিজে আবির্ভূত হয়ে সাক্ষীদান করে তোমাদের উভয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব।" সেই কথা শুনে ছোট বিপ্র বললেন, "তুমি যদি সেখানে গিয়ে চতুর্ভুজ

মূর্তিও ধারণ কর, তাতেও লোকের বিশ্বাস হবে না। তুমি যদি স্বয়ং এই মূর্তিতে গিয়ে শ্রীমুখ দিয়ে সাক্ষী দাও, তবেই সমস্ত লোকেরা বিশ্বাস করবে।" তখন গোপাল বললেন, "প্রতিমা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যায়, এমন কথা কোথাও শোনা যায়নি।" তখন ব্রাহ্মণ বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু প্রতিমা হয়ে তুমি কথা বলছ কেন? সুতরাং, প্রতিমা যদি কথা বলতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই চলতেও পারবে। তাছাড়া তুমি প্রতিমা নও, তুমি হচ্ছ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। এখন দয়া করে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধর্ম রক্ষার জন্য এমন কিছু কর, যা পূর্বে কখনও করনি।" তখন গোপাল হেসে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার পিছনে হেঁটে চলব। তোমার প্রতীকির জন্য তুমি শুধু আমার নূপুরের শব্দ শুনতে পাবে। কিন্তু তুমি পিছে ফিরে আমাকে দেখতে যেও না, যদি তা কর, আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে যাব আর এগোব না। আর মনে রেখো, আমাকে প্রতিদিন এক সের করে অন্ন রান্না করে অর্পণ করবে, তা খেয়ে আমি তোমার সঙ্গে চলতে থাকব।"

পরের দিন গোপালের আজ্ঞা নিয়ে ছোট বিপ্র স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন আর তৎক্ষণাৎ গোপাল স্বয়ং তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। গোপালের নূপুরের ধ্বনি শুনে ছোট বিপ্রের আনন্দ আর ধরে না। প্রতিদিন এক সের করে অন্ন রান্না করে মহা আনন্দে গোপালকে নিবেদন করতেন। এভাবেই চলতে চলতে নিজের গ্রামের নিকট এসে হাজির হলে ব্রাহ্মণ বিগ্রহের দিকে ফিরে তাকাতেই গোপাল হেসে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। গোপাল তখন ছোট বিপ্রকে বললেন, "তুমি এখন গ্রামের লোকজনদের এখানে ডেকে নিয়ে এস, আমি আর কোথাও যাব না।"

ছোট বিপ্র আনন্দে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি গ্রামের লোকজনকে গোপালের আগমনের কথা জানালেন। সকলেই তার কথা মতো এসে সত্যি গোপাল এসেছেন দেখে বিস্মিত হলেন এবং গোপালের সৌন্দর্য দেখে মোহিত হলেন। এদিকে বড় বিপ্র আনন্দিত হয়ে গোপালের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণতি করে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তখন গোপাল সকলের সামনে সাক্ষী প্রদান করলেন। বড় বিপ্র দুই বিপ্রের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, "তোমরা দুজন হচ্ছ আমার জন্ম-জন্মান্তরের দাস। তোমাদের সেবায় আমি খুবই সন্তুষ্ট। এখন তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।" তখন বিপ্রদ্বয় বললেন, "যদি সত্যই তুমি আমাদের বর দিতে চাও, তা হলে তুমি এই গ্রামে অবস্থান করে আপামর সকলকে কৃপাবারি বর্ষণ কর।" তাদের কথামতো গোপাল সেই বিদ্যানগরেই অবস্থান করলেন।

বিপ্রদ্বয় মহা আনন্দে প্রতিদিন গোপালের সেবা করতে লাগলেন। বিদ্যানগরের রাজা গোপালের আগমন বার্তা শুনে শ্রীবিগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন এবং মন্দির নির্মাণ করে গোপালের সেবাপূজার ব্যবস্থা করলেন। সেই হতে সাক্ষী গোপাল নামে পরিচিত হলেন। এরপর উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগরের রাজাকে পরাজিত করে বহু মূল্যবান মানিক্য-সিংহাসনসহ সেই দেশ জয় করলেন। পুরুষোত্তমদেব ছিলেন একজন মহান ভগবৎ ভক্ত। তিনি গোপালের চরণে পতিত হয়ে মিনতি সহকারে প্রার্থনা করতে লাগলেন, তাকে উড়িষ্যায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাজার ভক্তিতে বশ হয়ে গোপাল আজ্ঞা দিলে তিনি সেই বিগ্রহ নিয়ে কটকে স্থাপন করলেন, আর মানিক্য-সিংহাসনটি

শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রদান করলেন। রাজার মহিষী গোপাল দর্শনে আনন্দিত হলেন এবং বহু মান্য করে অনেক অলঙ্কার আদি দান করলেন। রানিকে বললেন যে, ছোটকালে তার মা তার নাক ছিদ্র করে যত্ন করে মুক্তা পরিয়েছিলেন। সেই ছিদ্র এখনও আছে, অতএব, রানির ইচ্ছা করলে তাকে এখনও মুক্তা পরাতে পারেন। পরের দিন রানি রাজাকে সঙ্গে করে মন্দিরে গিয়ে সেই মুক্তা গোপালের নাকে পরিয়ে দিলেন এবং আনন্দিত হয়ে এক মহোৎসব করলেন। সেই হতে গোপাল কটকে অবস্থান করছেন এবং সাক্ষীগোপাল নামে বিখ্যাত হলেন।

চিল্কাহ্রদ

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপুরী হতে সমুদ্রের তীরে তীরে আলালনাথ পথে দক্ষিণ দেশে গমন করেছিলেন। আলালনাথ হতে প্রায় সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরে গেলে চিল্কাহ্রদ পাওয়া যায়। আলালনাথ হতে ঐ পথেই প্রায় ষোল মাইল দূরে গোরাপুর গ্রাম। কিংবদন্তি আছে, শ্রীগৌর পদাঙ্কপুত বলে গ্রামের উক্ত নাম হয়েছে। গোরাপুরে শ্রীজগন্নাথদেব ও তৎপার্শ্ববর্তী পিরিজিপুর গ্রামে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের সেবা আছে। ঐ সকল গ্রামে কয়েক ঘর গৃহস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব বংশানুক্রমে বাস করে মন্ত্রদাতা গুরুর কার্য করে আসতেছেন।

কথিত হয়, কলিযুগ পাবনাবতারী প্রেমোন্মাদী শ্রীগৌরসুন্দর আলালনাথ হতে গোরাপুরে এসে তথা হতে তিন মাইল দূরে বলভদ্রপুরে নৌকারোহণপূর্বক চিল্কাহ্রদের পারিকুদ দ্বীপে গিয়ে পুনরায় নৌকায় পার হয়ে দক্ষিণ দেশে বিজয় করিয়াছেন।

এই চিল্কাহ্রদ বঙ্গোপসাগরের অংশ ১১০০ বর্গ কি.মি. ব্যাপ্ত মনমোহিনী চিল্কাহ্রদ। বর্ষাকালে চিল্কাই এশিয়ার মিষ্টিজলের বৃহত্তম হ্রদ। নভেম্বর-মার্চ মাসে চিল্কা থাকে বঙ্গোপসাগরের নোনা জলে। হ্রদের মাঝে হনিমুন, বেকন, কালীযাই, কলিযুগেশ্বর, সাতপড়া, নলবন, গড়কৃষ্ণপ্রসাদ, পারাবার আরও কত দ্বীপ আছে। কলিযুগেশ্বরে শিব মন্দির আছে। খুবই চিত্তমনোহর চিল্কার এই জলবিহার। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তও মনোরম চিল্কা হ্রদে।

মহেন্দ্রগিরি হিলস

মহাকবি কালিদাস মুগ্ধ হয়ে মেঘদূতমে প্রশস্তি গেয়েছেন মহেন্দ্রগিরির। রামায়ণ মহাভারতেও পাওয়া যায় মহেন্দ্রগিরির কথা। ১০০ মিটার খাড়া উঠে মহেন্দ্রগিরি পাহাড়ের চুড়ো। পাহাড়ভূমে গ্রানাইট পাথরের টকুরো সাজিয়ে নিরাভরণ মন্দির হয়েছে যুধিষ্ঠির, ভীম ও কুন্তীর। আর আছে পাহাড় শিরে উড়িষ্যার প্রাচীনতম পাঁচ ধাপের পাথুরে মন্দির গোকর্ণেশ্বর শিবের। জনশ্রুতি আছে, অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবদের তৈরি এই শিবমন্দির। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে মহেন্দ্র তনয়া নদী। তবে, আজ জনযুদ্ধের গোপন ঘাঁটি হয়েছে পাণ্ডবদের মহেন্দ্রগিরি।

উড়িষ্যার রাজধানী কটক

কটক জেলার সদর কটক কিছুকাল (১৯৫৬) আগেও ছিল উড়িষ্যার রাজধানী। ৯২০-৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে নৃপতি কেশরীর হাতে শহরের পতন। আর ৯৮৯-এ কটক অর্থাৎ

মিলিটারি ক্যাম্প গড়তে শহরেরও নাম হয় কটক। ৮ বছরের শাসক মুকুন্দরাম থেকে দখল যায় কটকের মোঘল ও বাংলা থেকে আসা আফগানদের হাতে। কালে কালে মারাঠা ঘুরে ব্রিটিশ (১৮০৩)। ২৬টি রাজ্য নিয়ে উড়িষ্যা রাজ্য গড়ে ব্রিটিশ। রাজধানী হয় কটক। শহরেরও পতন হয় ব্রিটিশের হাতে। ১১ শতকে গ্রানাইট পাথরে গড়া বাঁধটি কেশরী রাজাদের অবিনশ্বর কীর্তি। বন্যার হাত থেকে শহরের পরিত্রাতা পাথরের এই বাঁধ। ১৪ শতকে গঙ্গা রাজা অনঙ্গভীম নীল গ্রানাইট পাথরে মহানদীর উত্তর পাড়ে বারবাটি ফোর্ট অর্থাৎ দুর্গ তৈরি করেন। চারপাশ গভীর পরিখায় ঘেরা, দুপাশ ঘিরে পাথরের দুই প্রাচীর– প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেকালে। এই দুর্গই ছিল শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দ হরিচন্দনের ৯ তলার প্রাসাদ। বিধ্বস্ত হলেও সিংহদ্বার, পরিখা, জগন্নাথ মন্দির, সাক্ষ্যরূপে অতীত রোমন্থন করায়। পরিবেশ মনোরম। পথেই আছে দেবী কটকচণ্ডীর মন্দির। শহরের ৫ কি.মি. দূরে কটক চৌদ্দার গ্রামে কপালেশ্বর দুর্গ। উৎকলরাজ চোরগঙ্গার নামে চোরগঙ্গা পুকুরও হয়েছে দুর্গে। কথিত আছে, সর্পযজ্ঞ করায় সময় জনমেজয় নগরটি গড়েন। শহরান্তে পরমহংস শিব মন্দির। কিংবদন্তিতে ঘেরা অনন্ত গর্ভ কূপ–পবিত্র জলে দেবতাও প্লাবিত হন উৎসব অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ দিনে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ি এই কটকেই।

কপিলাস পাহাড়

কপিলাস পাহাড়ে ওড়িশি শৈলীতে তৈরি ভাস্কর্যময় শিব মন্দির। কথিত আছে, পাণ্ডবরা বনবাসকালে কপিলাসে আসেন। পূজাও করেন নাগবেষ্টিত শিলারূপী মহেশ্বরের। পাহাড়ের উপরে দেবসভা অর্থাৎ দেবতাদের সভাস্থল। মন্দিরের সর্বোচ্চ প্রাচীনকালের পৌরাণিক গুহা। কপিলাসের নৈসর্গিক শোভাও সুন্দর দৃশ্যমান পাহাড় থেকে।

সপ্তশয্যা

ঢেনকানল থেকে ১২ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অরণ্যময় দুর্গম পাহাড়ে সপ্তঋষির তপস্যাস্থল সপ্ত শয্যা অর্থাৎ সাত পাহাড় সাত গুহা ও সাত ঝরণা। মূর্তিও হয়েছে ধ্যানমগ্ন সাত ঋষির (মরীচ, বশিষ্ট, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু)। আর আছে পাহাড়তলিতে ১৯৫৬ শতকে তৈরি রঘুনাথ মন্দির। শ্রীরামও বনবাসকালে সাত দিন অবস্থান করেন এখানে। স্মারকরূপে রঘুনাথ মন্দির হয়েছে- দেবতা মর্মরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। অগ্রিম যোগাযোগে অন্নপ্রসাদ পাওয়া যায়।

যাজপুর বিরজাক্ষেত্র

সতীর একান্ন পীঠের এক পীঠ যাজপুর। বিষ্ণু চক্রে টুকরো হওয়া সতী নাভি পড়ে এই যাজপুরে। এমনকি গয়াসুরের নাভিও পড়ে এই যাজপুরে। রাজা যযাতি কেশরীর নামে নাম হয় যযাতিপুর। কালে কালে যাজপুর। রাজধানীও ছিল সেকালে। তবে, পৌরাণিক কালে নাভিগয়া তীর্থ নামেও খ্যাত ছিল যাজপুর তথা বিরজাক্ষেত্র। মন্দিরকে নিয়ে যাজপুর টাউন। মূল মন্দিরটি বিরজা দেবীর। গর্ভমন্দিরের রত্নবেদিতে ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবী বিরজা বা দুর্গা। সিংহবাণীর দ্বিভুজা দেবীর এক হাতে শূল, অপর হাতে মহিষাসুরের

লাঙ্গুল। দুর্গা ও কালী পূজাতে উৎসব হয়। রথযাত্রাও হয় দুর্গাপূজার সময়। আর রয়েছে নাভিকুণ্ড। জনশ্রুতি আছে, বৈতরণীতে অবগাহন করে নাভিকুণ্ডে পিণ্ডদানে সাত পুরুষের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বিরজা মন্দিরের পাশেই ব্রহ্মাকুণ্ড। কথিত আছে, ব্রহ্মার দশাশ্বমেধ যজ্ঞকালের কুণ্ড এটি। শিবলিঙ্গও রয়েছে। অগ্নিশ্বর শিবের রঙের বদল ঘটে প্রতি প্রহরে। পুণ্যতীর্থ বৈতরণীতে ঘেরা দ্বীপাকার যাজপুর তীর্থে পাণ্ডবরাও আসেন পূর্বপুরুষদের তর্পণ করতে। সেই থেকে তর্পণ প্রথার প্রচলন যাজপুরে। ১৫১১ শতকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও এসেছিলেন এই যাজপুরে। সে স্মৃতিও জড়িয়ে আছে চৈতন্য পাদপীঠ মন্দিরে। এছাড়াও বরাহ অবতাররূপী বিষ্ণুর মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, বিমলাদেবীর মন্দির, ৯ কোণা সূর্যনারায়ণ মন্দির, নবগ্রহ মন্দির, কিংবদন্তি খ্যাত অখণ্ড পাথরের মিনার–শুভস্তম্ভ, বরুণেশ্বর মন্দির, সিদ্ধেশ্বর মন্দির। তেমনই তিল তিল করে বাড়ছে আজও তিলেভাণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ ত্রিলোচনেশ্বর শিব লিঙ্গ। ত্রিলোচনেশ্বর শিব মন্দিরে শিব-পার্বতীর মূর্তি দর্শনীয়।

কেওনঝড়

কেওনঝড়ের মাইল দশেক দূরে গন্ধমাদন। রামায়ণের পবনপুত্র বিশল্যকরণীর সন্ধানে বেরিয়ে এই গন্ধমাদন পর্বত মাথায় নিয়ে লঙ্কায় যায়। যাজপুরের পথে ২৩ কি.মি. গিয়ে কাতারবেদা থেকে আর ৭ কি.মি. ডানে সীতাবিঞ্জি। পাহাড়ের গায়ে ৪র্থ শতকের ফ্রেস্কো, রূপ তার আধখোলা ছাতার মতো। জনশ্রুতি আছে যে, রাবণছায়া এটি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান পাহাড়। কারও নাম লব, কারও নাম কুশ আবার কেউ সীতার ভাড়ার, কেউবা রাবণছায়া বলে থাকেন। আর আছে বাল্মিকী আশ্রম। লবকুশের জন্ম তথা সীতাদেবীর সূতিকাগৃহ এই পাহাড়ে অবস্থিত। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী সীতা। কেওনঝড়ের প্রকৃতিও খুব সুন্দর। পাহাড়ের আধ কি.মি. দূরে কুণ্ডরূপী পাথরে ঘেরা দুরন্ত ঘূর্ণি অর্থাৎ ভীমকুণ্ড। বনবাসকালে জলাভাব দূর করতে ভীমের হাতের গদার ঘায়ে কুণ্ডের সৃষ্টি। হালকা সবুজ জলের কুণ্ডের গভীরতা ২৬০ ফুট। বৈতরণী এখানে অন্তঃসলিলা। জনশ্রুতি আছে যে, ভীমকুণ্ডের তলা দিয়ে পাতালগামী হয়েছে বৈতরণী। তবে, পাহাড়ের ফাটলে অদৃশ্য হয়ে ৩ কি.মি. দূরে দৃশ্যমান হয়েছে বৈতরণী।

নৃসিংহনাথ

রামায়ণের পবনপুত্র হনু-বাহিত হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্বতের উত্তর ঢালে সম্বলপুর ও বোলাঙ্গির জেলা সীমান্তে নৃসিংহনাথ। অসুরদের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ। তাই বিষ্ণু এলেন অসুর বিনাশ করতে ধরাধামে। অসুরকুল মুষিক হয়ে আত্মগোপন করলেন এই পাহাড়ে। বিষ্ণু আধা মাজার আধা সিংহের রূপ নিয়ে মুষিক নিধনে পাহাড়ে এলেন। স্মারকরূপে ১৪১৩ শতকে ভৈজাল দেও–এর তৈরি ৪৫ ফুট উঁচু মন্দিরে কিংবদন্তিতে ঘেরা দেবতা নৃসিংহনাথ। নৃসিংহনাথ অর্থাৎ বিষ্ণু এখানে মাজারকেশরী বা বিড়াল সিংহ– দেহ সিংহের, মাথাটি মার্জারের। কষ্টিপাথরের দেবতা। তবে, ফুলের বেড়াজালে অবয়ব সাধারণের অগোচরে। মন্দিরের ভাস্কর্য অনেক সুন্দর। পাথরের দরজায় গজলক্ষ্মীর মূর্তি, জয় ও বিজয়, বামন, নৃসিংহ, বরাহ মূর্তিগুলোও অনবদ্য। আর আছেন মন্দিরের কাছেই

দুর্গা, গণেশ ও দ্বারপাল। পঞ্চপাণ্ডব ঘাটের কাছে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মূর্তির ভাস্কর্যও সুন্দর। প্রসাদ পাওয়া যায় দুপুর ও রাতে।

পাহাড়: পাহাড়–ভীমাধার, গদাধার, গুপ্তধার, পিক্রধার, কপিলাধার, চালধার ছাড়াও নানান ঝরনা নামছে পাহাড় থেকে। বয়ে চলেছে নিচু দিয়ে নালা হয়ে। নাম তার পাপহরণ। স্নানে পাপমোচন হয়। আর আছে সীতাকুণ্ড, গোকুণ্ড। কুণ্ডের জলে স্নান করলে পুণ্যি হয়।

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের পূর্বকথা

মধ্যপ্রদেশের ইতিহাস আজকের নয়। বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে অবন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মঙ্গল গ্রহের জন্মও হয়েছিল অবন্তী নগরে সেকালে। এমনকি সম্রাট বিন্দুসার পুত্র অশোককে উজ্জয়িন-এর শাসনকর্তা রূপে অভিষিক্ত করেন। ৪ শতকে গুপ্তদের আগমন। আর ইতিহাসখ্যাত সুবর্ণ যুগের সূচনা মধ্য প্রদেশেই ঘটে গুপ্ত রাজাদের কালে। হুনদের কাছে পরাজয়ের পর গুপ্ত রাজাদের রাজত্ব যায়। তারও আগে মৌর্যদের হটিয়ে শুঙ্গরা দখল নেয় মধ্য ভারত। এমনকি সম্রাট হর্ষবর্ধনও ভারতের এই মধ্যাঞ্চলে শাসন করে গেছেন ৭ শতকের প্রথম ভাগে। ৯ শতকে চাদেন্দলা রাজদের গৌরবগাথাও মহীয়ান করে তুলেছে মধ্যপ্রদেশকে। তাদেরই কালে গড়ে ওঠে খাজুরাহোর মন্দিররাজি। বিশ্বনন্দিত অমরপ্রেমের কবিতা বেলেপাথরে খাজুরাহোর ভাস্কর্য। পালাবদল ঘটেছে ইতিহাসের। হানাদার এসেছে বারবার মধ্য ভারতে। যুদ্ধ চলেছে হিন্দু রাজাদের সাথে মুসলিম শাসকদের। ১১ শতকে গোয়ালিয়র দখল করে মুসলিমরা, ১৩ শতকে খিলজিরা দখল করে মালোয়া। আর ১৬ শতকের মধ্যভাগে আকবরের দখলে যায় মধ্য ভারত। গেরিলা যুদ্ধে সুচতুর মারাঠিদের নব জাগরণে শিবাজীর নেতৃত্বে চম্বল থেকে নর্মদায় ছড়িয়ে পড়ে মারাঠা সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ শক্তিও পরাভূত হয় মারাঠাদের হাতে। কিন্তু গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া মাধোজীর মৃত্যুর পর ভেঙ্গে পড়ে মারাঠা সাম্রাজ্য। টুকরো হয়ে গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য। ১৮১৭-১৮ শতকে Saugor Nerbudda রাজ্য পেয়ে ব্রিটিশের আগমন। ১৮৬০ শতকে এলাকা বাড়ে ব্রিটিশের। আর এই মধ্যাঞ্চল নিয়ে ব্রিটিশের গড়া সেন্ট্রাল প্রভিন্স (প্রশাসনিক দপ্তর নাগপুরে, গ্রীষ্মকালীন দপ্তর পাঁচমারী) আজ লোপ পেলেও নামটি জড়িয়ে রয়েছে সি পি টিকের সঙ্গে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ব্রিটিশের সেন্ট্রাল প্রভিন্স-এর সঙ্গে বেরার জুড়ে রূপ নেয় সেন্ট্রাল প্রভিন্স। অতীতের স্বাধীন রাজ্যও শামিল হয় সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সঙ্গে। আর ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর আটটি মারাঠি জেলা বম্বের সঙ্গে জুড়ে গড়া সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া এজেন্সিও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অঙ্গীভূত হয়ে নামান্তর ঘটে হয় মধ্যপ্রদেশ।

উজ্জয়িনী

উজ্জয়িনী ঐতিহ্যগতভাবে ভারতের সাতটি অন্যতম পবিত্র স্থানের একটি বলে বিবেচিত হয় এবং অমৃতভাণ্ড নিয়ে দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধের মাঝে পৃথিবীর যে চারটি স্থানে অমৃত পতিত হয়েছিল, উজ্জয়িনী তার মধ্যে একটি। এই পৌরাণিক ঘটনা উজ্জয়িনীকে এক পারমার্থিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, যার ফলে প্রত্যেক বারো বছরে একবার এখানে কুম্ভমেলা হয়। সেই সময় সারা ভারত থেকে আগত কয়েক লক্ষ তীর্থযাত্রীর ভিড়ে এই প্রাচীন নগরী উজ্জয়িনী পূর্ণ হয়ে উঠে। উজ্জয়িনীর আরেকটি তাৎপর্য হলো পবিত্র শিপ্রা নদীর তীরে এই সুপ্রাচীন শহরটি অবস্থিত। এখানে এই শিপ্রা নদীর তীরেই রয়েছে পবিত্র রাম ঘাট, যেখানে ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অবগাহন বা স্নান করতেন। ভারতে সাতটি পবিত্র স্থানের মধ্যে অন্যতম এই উজ্জয়িনী। অন্য ছয়টি পবিত্র স্থান হলো অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, বেনারস, কাঞ্চীপুরম ও দ্বারকা। এই সাতটি পবিত্র স্থানকে মুক্তি স্থলও বলা হয়।

উজ্জয়িনীর পূর্বকথা

মহাকবি কালিদাস, সম্রাট অশোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য অবন্তিকা কালে কালে উজ্জয়িন হলেও আজ হয়েছে উজ্জয়িনী। চম্বলের শাখা শিপ্রা নদীর তীরে মালব মালভূমিতে ৪৯২ মি. উঁচু উপত্যকায় উজ্জয়িন নগরী। কিংবদন্তি, নর্মদা-তটে দানবরাজ ত্রিপুরাকে হারিয়ে অবন্তীর রাজা শিব নামের বদল ঘটান-অবন্তিপুরা হয় উজ্জৈন (জয়ের গৌরব) বা উজ্জয়িনী। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম হিন্দু তীর্থ উজ্জয়িন। সপ্তপুরীও এক উজ্জয়িন। অন্যতম সতীপীঠও উজ্জয়িন-সতীর কনুই পড়ে উজ্জয়িনে। তবুও বারবার ধ্বংস হয়েছে পুরাকালের মন্দিররাজি উজ্জয়িনে। মন্দিরও হয়েছে অতীতকে অক্ষুণ্ন রেখে উত্তরকালে নতুন করে। সম্রাট অশোকের পিতা বিন্দুসারের রাজ্যপাটও ছিল সেকালের অবন্তিকায়। কিছুকালের (২৭৫ খ্রি.পূ.) জন্য অবন্তিকার গভর্নরও ছিলেন অশোক। এমনকি চন্দ্রগুপ্ত ২য় (৩৮০-৪১৪ খ্রি.) পাটলিপুত্র থেকে এসে রাজধানী গড়েন অবন্তিকাতে। আর, পৌরাণিক আখ্যানে পাওয়া যায় সমুদ্র মন্থনে সৃষ্ট নদী শিপ্রা। জয়ন্ত-বাহিত অমৃতকুম্ভ থেকে অমৃতও পড়ে উজ্জয়িনের শিপ্রা নদীতটে (আর পড়ে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক-এ)। মর্ত্যধামের চারের এক কুম্ভযোগও ঘটে উজ্জয়িন-এর পুণ্যতোয়া শিপ্রা নদীর ঘাটে। মর্ত্যভূমিতে স্বর্গ নেমেছে উজ্জয়িনে। অধ্যাত্ম শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতিতে মহীয়ান উজ্জয়িনের আকর্ষণ বহুবিধ। বৌদ্ধ পুথিতে পাওয়া যায় খ্রি.পূ. ৬ শতকে অবন্তীর রমরমার কথা। এমনকি অবন্তী, বৎস্য, কোশল ও মগধ এই চার শক্তিধর রাষ্ট্র ছিল সেকালে। সুদূর মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্টের সঙ্গে বাণিজ্যও ছিল উজ্জয়িনের। আজ লুপ্ত হলেও অতীতে চার শতাধিক বৌদ্ধবিহার ছিল উজ্জয়িনে। নবম রত্নের অন্যতম মহাকবি কালিদাস এই উজ্জয়িনরাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। নগরীরও বর্ণনা মেলে তাঁর অমরকাব্য মেঘদূতম-এ। আরও পরে পারমার রাজা শিলাদিত্যকে হারিয়ে মাণ্ডুরাজের দখলে যায় উজ্জয়িন। ১২৩৫ শতকে ইলতুৎমিসের হানায় ধ্বংসলীলার শিকার হয় উজ্জয়িন। ক্ষতে প্রলেপ লাগান বাজ বাহাদুর। বাজ বাহাদুর থেকে আকবরের

দখলে যেতে প্রাচীরে ঘেরেন উজ্জয়িনকে। লুপ্তপ্রায় প্রাচীরের অংশ আজও অবশিষ্ট। আর ইতিহাসকে চমৎকৃত করে আওরঙ্গজেব অর্থ জোগান দেন হিন্দু মন্দির গড়নে। মহারাজ জয় সিং (জয়পুর) মালোয়ার গভর্নর হয়ে নানা মন্দিরের সঙ্গে যন্তর-মন্তর গড়েন উজ্জয়িনে। জয় সিং-এর পর মারাঠারা আসে দখল নিতে উজ্জয়িনের। আর দৌলত রাও সিন্ধিয়া। ১৮১০ শতকে রাজধানীর স্থানান্তর ঘটান উজ্জয়িনের, রমরমাও লোপ পেতে থাকে সেই থেকে।

মহাকালেশ্বর মন্দির

শহরের দক্ষিণে শিপ্রা নদীর পাড়ে উজ্জয়িন-এর মূল আকর্ষণ মহাকালেশ্বর মন্দির। জাফরানি রঙের শিখর উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে। অতীতের মূল মন্দির ১২৩৫ শতকে ইলতুৎমিসের হাতে ধ্বংস হলে ১৮ শতকে নতুন করে পাঁচতলা মন্দির গড়েন সিন্ধিয়ারাজ। তবে, চব্বিশ খাম্বা দরোজাটি ১১ শতকের। মেঝে থেকে নিচে মূল মন্দিরে খ্রি.পূ. ২য় শতকের স্বয়ম্ভু দেবতা মহাকালেশ্বর শিব আর উপরে ওঙ্কারেশ্বর শিব।

মন্দিরের আরেক অভিনবত্ব তন্ত্রমতে একমাত্র দক্ষিণামূর্তি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের (৬ষ্ঠ) অন্যতম শক্তির উৎস এই মহাকালেশ্বর, আর আছে পার্বতী, গণেশ, কার্তিক-৪ পশ্চিম-পূর্বে। নদীও আছেন দক্ষিণে। সন্ধ্যা আরতির মাধুর্য আছে মহাকালেশ্বরে। কিংবদন্তি আছে, সমুদ্র মন্থনে বিষ পানে শিব যখন নীলকণ্ঠ, তখন ব্রহ্মাই সৃষ্টি ও স্থিতি রাখতে শিবের সাধনা করে জ্যোতির লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি শ্রীধাম সর্বতীর্থের জল এনে পিণ্ডদান করেন এই মহাকালেশ্বরে, সেই জলে হয়েছে কোটি গঙ্গা কুণ্ড; স্নানে পুণ্য হয়। পশ্চিম দ্বারে বড় গণপতি, ঋদ্ধি ও সিদ্ধি; পঞ্চমুখী হনুমান ছাড়াও দেবতা রয়েছেন। আরও রয়েছেন নানা মহাকালেশ্বর অঙ্গনে। প্রসাদও কিনতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি আজ ব্যাপক সংস্কার হয়ে নবরূপে সজ্জিত।

সন্দীপন আশ্রম

কথিত আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম ও সুদামাসহ নিয়মিত আসতেন কূলগুরু সন্দীপনী মুনির কাছে ধনুর্বাণ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা নিতে।

উজ্জয়িনীর ইস্কন মন্দির

সুপ্রাচীন পরিবেশে পরিমণ্ডিত হয়ে এখন এই মন্দির নগরী উজ্জয়িনীতে নবনির্মিত ইস্কন মন্দিরও এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অধিষ্ঠিত হয়েছেন শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন। তাজমহল যে মার্বেল পাথরে সজ্জিত, রাজস্থানের সেই মাক্রানার শ্বেত মার্বেল পাথরে নির্মিত ইস্কনের এই শুভ্র সুন্দর মন্দিরটিও এখন উজ্জয়িনীর অন্যতম আকর্ষণীয় এক মন্দির। শ্রীশ্রীরাধা-মোহনজীর সঙ্গে এখানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিগ্রহও। একদিন এই উজ্জয়িনীতেই তাঁরা তাঁদের গুরুগৃহে শিক্ষার কাল অতিবাহিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে ইস্কনের এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন গৌর-নিতাই রূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুও। কেননা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ প্রচার করাইতো ইস্কনের ব্রত। এখানে ২৮ কক্ষ বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক মানের অতিথিশালা নির্মিত হয়েছে, যার একতলায় রয়েছে সুসজ্জিত কৃষ্ণভাবনামৃত রেস্তোরাঁ–"গোবিন্দ"। অতিথিশালার সর্বোচ্চ তলে নির্মিত হয়েছে একটি সভাগৃহ, যেখানে কৃষ্ণভাবনাময় নাটক, ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য, গীত ও ভক্তিমূলক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রায় ২৮০০০ (আটাশ হাজার) ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উজ্জয়িনীর ইসকন কেন্দ্রের ভক্তগণ প্রতিদিন মধ্যাহ্নের খাবার বিতরণ করছেন। এখানে হাতে তৈরি একটি মেশিন রয়েছে যেখানে ঘণ্টায় দশ হাজার রুটি তৈরি হয়। এখানে প্রভুপাদের বিগ্রহও তৈরি হয়ে থাকে। এখান থেকে শ্রীল প্রভুপাদের মূর্তি নির্মাণ করে সারা বিশ্বে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা রয়েছে একটি বৈদিক গ্রন্থাগার নির্মাণের। এছাড়াও তৈরি হবে জৈব কৃষি শিক্ষা প্রকল্প, আয়ুর্বেদ কলেজ ও চিকিৎসা কেন্দ্র, বরাহমিহির আই.টি পার্ক এবং বিমান চালনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আসাম প্রদেশ

আসামের পূর্বকথা

ব্রিটিশের আসাম থেকে ছেঁটে নতুন করে হয়েছে অসম। পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, বন, জঙ্গল, অরণ্যের সমাহারে অসম। অসম আজকের নয়। অনেক পৌরাণিক গ্রন্থে অসম ভূখণ্ডের নামোল্লেখ মেলে। কালিকা পূরাণ ও যোগগিনীতন্ত্রে এর গোড়াপত্তনের ইতিহাসে দেখা যায়, তখন নাম ছিল এর প্রাগজ্যোতিষপুর। দানব রাজা নরকাসুরের হাতে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই নরকার পুত্র রাজা ভগদত্ত তার হস্তীবাহিনী সহ অংশ নেন কৌরব পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। তারও আগের কথা সতীর দেহত্যাগের পর শোকাতুর শিব নীলাচল (মদন কামদেব) পাহাড়ে গভীর ধ্যানে বসেন। ইন্দ্রের ইচ্ছায় কামদেব এলেন শিবের মনে কামের উদ্রেক ঘটিয়ে ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটাতে। ক্ষুব্ধ শিব ভস্ম করেন প্রেমের দেবতা কামদেবকে। কামদেবের স্ত্রী রতিদেবীর প্রতি তুষ্ট শিব নতুন করে রূপ দিলেন কামের। অর্থাৎ কাম পেলেন রূপ আর সেই থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বের এই ভূখণ্ডের নামও হয় কামরূপ। প্রাগজ্যোতিষপুর নামটি অসমের আজকের মানচিত্র থেকে মুছে গেলেও কামরূপ নামটি জেলারূপে রয়ে গেছে আজও।

কামাখ্যা মন্দির (একান্ন পীঠের এক পীঠ)

শহর থেকে ১০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিন শিখরের নীলাচল পাহাড়ে ৫২৫ ফুট উঁচু শিব পর্বতে কামাখ্যা মন্দির। বিদেহরাজ জনকপুত্র নরক কামরূপ জয় করে দেবীর সেবায় নিযুক্ত হন। আর দেবী হন রাজকুল বিগ্রহ। তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান কামাখ্যা পুণ্য শক্তিপীঠ। দৈত্যরাজ নরকাসুরের তৈরি মূল মন্দিরটি ১৫৫৩ শতকে বাংলার সুলতান সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড়ের কালো হাতে বিনষ্ট হলে নতুন করে মন্দির গড়েন ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ। ১৮৯৭ শতকের

ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতিও সংস্কার করেন কোচবিহার রাজ। ডিম্বাকার মৌচাকের আদলে শিখর–সাতটি চূড়া, প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর তিনটি স্বর্ণকলস, তার উপর সোনার ত্রিশুল।
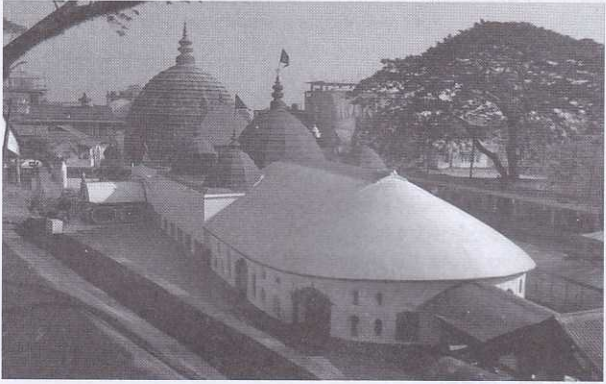
নানা ভাস্কর্য, হিন্দু পুরাণের দেবদেবীরাও মূর্ত হয়েছেন দেওয়ালময়। এমনকি হস্তিপীঠে মন্দির স্রষ্টা বিশ্বকর্মা, দাঁড়িগোফওয়ালা শিবও রয়েছেন মন্দিরে। প্রাচীন অহোম স্থাপত্যের নিদর্শন এই মন্দিরে দুর্গা, কালী, তারা, কমলা, উমা ও চামুণ্ডার প্রতিভূরূপে পূজিতা হচ্ছেন দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা পঞ্চরত্নের সিংহাসনে অষ্টধাতুর দেবী কামাখ্যা। খুবই জাগ্রত এই দেবী। দেবীর একান্ন ভাগের এক ভাগ এখানে। বিষ্ণু চক্রে খণ্ডিত সতীর যোনি পড়ে এখানে। ভারতে যোনি (ধরিত্রী) পূজার প্রথা একমাত্র কামাখ্যায়। বিদ্যুৎবিহীন আলো-আঁধারিতে সিঁড়ি নেমে দেবীর অবস্থান গুহামন্দিরে। সুন্দরভাবে বাঁধানো যোনি বেদীর ফাটল ফুড়ে ঝরনারূপী বেরিয়ে আসা জলে থৈ থৈ অন্তপুর অর্থাৎ দেবীকুণ্ড। অম্বুবাচীতে (আষাঢ়/জুন) দেবী ঋতুমতী হন। জলের রং হয় লাল। এই জল পানে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় ঘটে। যোগীনীতন্ত্রে পাওয়া যায় যে, মহামুদ্রা যোনীপীঠ দর্শনে, স্পর্শে, চরণামৃত পানে মোক্ষলাভ তথা দেবঋণ, পিতৃঋণ, মাতৃঋণ থেকে মুক্তি মেলে। দেবীর রক্তবস্ত্রের মাহাত্ম্যও অপরিসীম। অম্বুবাচীতে মহাসমারোহে উৎসব হয়। প্রদীপের আলোয় দেখে নিতে হয় লাল-সালুতে ঢাকা দেবী অর্থাৎ যোনিমূর্তি। সারা ভারত থেকে প্রচুর তীর্থযাত্রী আসেন এখানে। আসেন পর্যটকরাও। তবে তিন দিন বন্ধ থাকে মন্দির অম্বাবুচি সময়ে। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে ২য় বা ৩য় দিন পুষ্যা নক্ষত্রে পহান বিয়া অর্থাৎ বিয়ের আসর বসে দেবীর। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে বর (কামেশ্বর) আসেন দোলায় চেপে। পৌষ বিয়া, বসন্তে বাসন্তী উৎসব ছাড়াও উৎসব আছে নানা কামাখ্যায়। নানা সংস্কার, ভীতি, রোমাঞ্চ ও রহস্যে ঘেরা এই দেবী মন্দির। কিংবদন্তি আছে যে, পুরুষরা ভেড়া বনে কামাখ্যা পাহাড়ে। দেবী রুষ্ট হলে বংশলোপের আশঙ্কা। আবার বন্ধ্যা নারী সন্তানসম্ভবা হন দেবী আশীর্বাদে।

প্রাচীন যুগে কামরূপ রাজ্য

এই কামরূপের পূর্ব নাম ধর্মারণ্য। সেই সময়ের কোনোরূপ ইতিহাস পাওয়া যায় না। কামরূপ অতিপ্রাচীন রাজ্য। ইহা পুণ্যভূমি ভারতের ঈশানকোণে অবস্থিত। রামায়ণ, মহাভারত ও বহু তন্ত্র-পুরাণাদিতে এই কামরূপ রাজ্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশে রঘুরাজার দিগ্বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি গৌরবের সাথে কামরূপ রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমে করতোয়া অবধি দিক্করবাসিনী পর্যন্ত, উত্তরে কঞ্জগিরি, পূর্বে তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষানদীর সঙ্গম পর্যন্ত যে ভূমি উহাই কামরূপের সীমানা। প্রাচীনকালে ইহা যোগী, ঋষি এবং তপস্বীদিগের আবাসভূমি ছিল। প্রমাণস্বরূপ, মহামুনি বশিষ্ঠ, গোকর্ণ এবং ভগবানের অবতার মহামুনি কপিলের আশ্রম এই কামরূপেই অবস্থিত ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে কামরূপ রাজ্য

১. বিদর্ভ রাজ্য

পুরাকালে এই কামরূপের পূর্বখণ্ডে সদিয়ার সন্নিকটে বিখ্যাত ভীষ্মক রাজা কৌণ্ডিল্য নগরে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করেছিলেন। এই রাজ্য বিদর্ভ রাজ্য কামরূপ কাহিনি নামেও আখ্যাত ছিল। ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী দেবীকে শ্রীকৃষ্ণ হরণ করে বিবাহ করেন।

২. শোণিত রাজ্য

বর্তমান শোণিতপুর জেলার মধ্যে তেজপুরের সন্নিকটে শোণিতপুর নামক নগরে রাজধানী স্থাপন করে বলিরাজার বংশধর শিবভক্ত বাণাসুর রাজত্ব করেছিলেন। তেজপুরের সন্নিকটে অবস্থিত মহাভৈরব শিবমন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কথিত আছে। তিনি প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুরের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। এই বাণাসুরের ঊষা নামে এক অতি সুশ্রী কন্যা ছিলেন। ঊষার চিত্রলেখা নামে এক সাথী ছিলেন। এই চিত্রলেখার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ অগ্নিগড়ের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ঊষাকে হরণ করতে এসে বন্দি হন। পরে শ্রীকৃষ্ণ এবং বাণাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ, সংগ্রাম আরম্ভ হয়। স্বয়ং মহাদেব বাণাসুরের পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশ্য বাণরাজ পরাস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি করেন এবং কন্যা ঊষাদেবীকে অনিরুদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই যুদ্ধ হরিহর যুদ্ধ বলে প্রখ্যাত। তেজপুরের নিকটে অগ্নিগড় নামে প্রসিদ্ধ একটি পর্বত আছে।

৩. হিড়ম্বপুর রাজ্য

বর্তমান ডিমাপুরের প্রাচীন নাম হিড়ম্বপুর। মহাভারতের সময় হিড়ম্বপুর হেড়ম্ব রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের রাজার নাম হিড়িম্ব ছিল। পাণ্ডবেরা জতুগৃহ দাহ হতে পলায়ন করে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ সময় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম হিড়িম্ব-ভগ্নী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ তারই গর্ভজাত পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। পরে কর্ণের হস্তে নিহত হন।

৪. নাগরাজ্য

প্রাচীন নাগরাজ্য, বর্তমান নাগাপাহাড়। নাগরাজ্য সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ এই যে, অর্জুন তীর্থ পর্যটনোপলক্ষে এখানে এসে ঐরাবত কূলে জাত কৌরবনাম নাগরাজের কন্যা উলুপীকে বিবাহ করেন। উলুপীর গর্ভে ইরাবানের জন্ম হয়। বিবাহকালে অর্জুনকে উলুপী এই বর দেন, জলমধ্যে কেহই তাকে পরাভূত করতে পারবে না। মাতামহ সূত্রে ইরাবান নাগরাজ্যের অধিকারপ্রাপ্ত হন।

৫. মণিপুর

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন দ্বাদশ বৎসর একাকী বনবাস সময়ে তীর্থপর্যটনোপলক্ষে মণিপুরে এসে উপস্থিত হন। তিনি মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। অর্জুন দ্বিতীয়বার যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের যজ্ঞাশ্বসহ মণিপুরে আসাকালীন বভ্রুবাহন মণিপুরের রাজা ছিলেন। ইনি তাকে পিতা বলে পরম সমাদর করেন। তাতে ক্ষত্রিয় ধর্ম অপালিত হয়েছে বলে অর্জুন ভর্ৎসনা করায় ইনি শেষে বিমাতা উলুপীর প্ররোচনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অর্জুন সেই যুদ্ধে পরাজিত ও বিচেতন হয়ে পড়েন। অনন্তর উলুপী নাগলোক হতে সঞ্জিবনী মণি এনে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এই মণির নামানুসারে এই রাজ্যের নাম মণিপুর হয় বলে কিংবদন্তি আছে। মণিপুরী রাজবংশ বভ্রুবাহনের বংশধর বলে কথিত আছে।

৬. জয়ন্তীয়া

পুরাণ মতে, জয়ন্তীয়া নারীদেশ নামে অভিহিত। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ এখানে এসে উপস্থিত হলে এই প্রদেশের অধীশ্বর প্রমীলা তার অশ্ব বেঁধে রাখেন। অবশেষে তার সহিত অর্জুনের বিবাহ হওয়ায় প্রমীলা তার অশ্ব ছেড়ে দেন। এখানে অবস্থিত জয়ন্তেশ্বরী বিগ্রহের নামানুসারে এই রাজ্যের নাম জয়ন্তীয়া হয়েছে। প্রাচীনকালে এখানে নরবলি প্রচলিত ছিল।

৭. প্রাগজ্যোতিষপুর

প্রাগজ্যোতিষপুরে নরকাসুর ও তৎপুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করেছিলেন। মহাভারতে ভগদত্তের প্রতাপ কাহিনি বর্ণিত আছে। ভগদত্তের ভানুতী নামে এক কন্যা ছিলেন। মহামানী দুর্যোধন এই ভানুমতীকে বিবাহ করেছিলেন। এই সময় এই ভানুমতী বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিলেন। ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অনেক কিরাত সৈন্যসহ কৌরবাধিপতি দুর্যোধনের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে সাহায্য করেছিলেন। পরে ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন কর্তৃক তিনি নিহত হন। কালিকাপুরাণে প্রাগজ্যোতিষপুরের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালে পিতামহ ব্রহ্মা এই স্থানে বসে নক্ষত্রাদি জগতের সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করেছিলেন। এজন্য এ স্থান প্রাগজ্যোতিষপুর নামে বিখ্যাত।

বশিষ্ঠমুনির আশ্রম

কামাখ্যা পাহাড় হতে দশ মাইল এবং গৌহাটি হতে সাত মাইল দক্ষিণে শিলং রোড হতে চার মাইল দূরে বশিষ্ঠমুনির আশ্রম. অবস্থিত। এই স্থানটি চতুর্দিকে পর্বতমালায়

পরিবেষ্টিত ও পরিশোভিত এবং অতীব নির্জন। এইস্থানে উচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বশিষ্ঠ-গঙ্গা নামে জলপ্রবাহ বেগে পতিত হচ্ছে। পর্বতকানন ভেদ করে যেন সংসাররোগক্লিষ্ট ত্রিতাপদগ্ধ মানুষকে শান্তির ত্রিধারায় স্নান করিয়ে শীতল করবার জন্য কুলুকুলু ধ্বনিতে গঙ্গাদেবী অবতরণ করতেছেন এবং তপোবন বশিষ্ঠদেবের পুণ্যগাথা কীর্তন করতেছে। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠদেব নিমিরাজার শাপে দেহহীন হয়। রাজর্ষি নিমিও বশিষ্ঠশাপে দেহহীন হন। তখন বশিষ্ঠদেব নিরূপায় হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মার উপদেশ মতো তিনি এই নির্জন সন্ধ্যাচলে ভগবান বিষ্ণু তপস্যা করেন। বিষ্ণু প্রত্যক্ষ হয়ে তাকে বর প্রদান করেন। মহর্ষি তপস্যা প্রভাবে সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা–এই ত্রিধারায় প্রবাহিত গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন। এই ত্রিধারার সঙ্গমস্থান বশিষ্ঠ-গঙ্গা নামে অভিহিত। এই জলে স্নান ও পান করে বশিষ্ঠদেব পূর্বশরীর প্রাপ্ত হন। বশিষ্ঠদেব প্রতিদিন এই ত্রিধারাসঙ্গম গঙ্গাজলে ত্রিসন্ধ্যা করতেন। যাত্রীরা এই স্থানে স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণাদি করে পরম শান্তি লাভ করে থাকেন। কথিত আছে যে, মানব এই ত্রিধারা-সঙ্গম স্থানে এক দিবসের মধ্যে ত্রিসন্ধ্যা করলে সন্ধ্যাপতিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই স্থানে বশিষ্ঠদেবের মন্দির রয়েছে। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় এখানে অনেক লোকের সমাগম হয়ে থাকে।

কুম্ভমেলা ও চারধাম

পুরাণে আছে, দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন করে অমৃত কুম্ভ প্রাপ্ত হন। ঐ অমৃত অধিকার করবার জন্য দেবাসুরের মধ্যে বারো দিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উক্ত বারো দিন অমৃত কলসটি ভূলোকে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িন–এই চার স্থানে রাখা হয়েছিল। সেই সময় কলস হতে কিছু অমৃত ঐসব স্থানে পড়ে যায়। দেবতাদের বারো দিন, মানুষের বারো বছর। এই কারণে ঐ চার স্থানে প্রত্যেক বারো বছর পরে কুম্ভমেলা স্নান হয়ে আসছে। যে তিথি রাশি ও নক্ষত্রে অমৃত-কলস রাখা হয়েছিল ঠিক ঐ সময়েই কুম্ভযোগের মুহূর্ত হয়ে থাকে। ঐ শুভক্ষণে সাধু-সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থী–সকলেই স্নান করে অমরত্ব লাভ করছে। মহাবিষুবসংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে, মকর ক্রান্তি অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে (সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থান, এলাহাবাদ), চাতুর্মাস্যে নাসিকের কুশাবর্ত ঘাটে (গোদাবরী তট) এবং বৈশাখ পূর্ণিমাতে উজ্জয়িনীর (ধারা) শিপ্রা নদীতে স্নান হয়। এই উপলক্ষে দশনামী সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও উদাসী সম্প্রদায়ের মহাসম্মেলন হয়ে থাকে। প্রতি ছয় বছর পরেও স্নানের যোগ হয়; একে অর্ধকুম্ভ যোগ বলে। ইহা একমাত্র হরিদ্বার ও প্রয়াগেই হয়। ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (খ্রিষ্টীয় সপ্তক শতক) হতে এই কুম্ভমেলার প্রবর্তন হয়েছে। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রতি ছয় বছর অন্তর প্রয়াগে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সম্মেলন করে ধর্মালোচনা করাতেন। ইহা হতেই পরবর্তী সময়ে পুরাণোক্ত কুম্ভযোগে সন্ন্যাসীদের মহাসম্মেলন হয়ে থাকে।

১. হরিদ্বারে কুম্ভমেলা

দেবগ্রহ বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্যদেব মেষরাশিতে অবস্থান করলে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয়ে থাকে। সাহারানাপুর জেলার অন্তর্গত হরিদ্বার একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহ্যময় তীর্থস্থান। পুণ্যতোয়া গঙ্গার দক্ষিণ দিকে শিবালিক নামে একটি উচ্চ পাহাড়ের পাদমূলে এই হরিদ্বার অবস্থিত। হরিদ্বারের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তীর্থযাত্রীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

হরিদ্বারের বিভিন্ন নাম আছে, কেউ কেউ বলেন যে, এই স্থানে মহামুনি কপিলদেবের আশ্রম ছিল বলে আজও হরিদ্বারের এই স্থানকে কপিল স্থান নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে বলে থাকেন, এর নাম গঙ্গাদ্বার, শৈব সম্প্রদায়ের সাধুরা বলে থাকেন হরদোয়ার অর্থাৎ শিবলোকে পৌছাবার দ্বারস্বরূপ। বৈষ্ণবেরা এই পবিত্র স্থানটিকে বলেন হরিদ্বার অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে যাবার দ্বারস্বরূপ। তবে যে যাই বলুক না কেন, এই পবিত্র তীর্থ সাধু মহাত্মার সমাগমে এক দিব্য আনন্দের অতুলনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পারমার্থিক জীবনে হরিদ্বারের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ স্থানের ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণ পাশে হর-কি-পাউরি বা হরি কি চরণ নামে সুপ্রসিদ্ধ ঘাটটি হরিকুণ্ডের উপর অবস্থিত। হরিদ্বারের একদিকে পর্বতমালা, অন্যদিকে পুণ্যতোয়া হরিভক্তি প্রদায়িনী গঙ্গার উৎপত্তি স্থান। গঙ্গার মনোরম দৃশ্য সকলকেই আকর্ষণ করে। কুম্ভমেলা উপলক্ষে সাধু মহাত্মারা যখন হরিদ্বারে যান তখন তারা ব্রহ্মকুণ্ড, সর্বনাথের মন্দির, মায়াদেবীর মন্দির, নীল ধারার ঘাট, কুশাবর্ত ঘাট, দক্ষেশ্বর, সতীকুণ্ড, ভীমগদা, দশাবতার মন্দির, ঋষিকুল মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি পবিত্র স্থানগুলো দর্শন করে শুদ্ধভক্তি অর্জন করে থাকেন। যে সময় এই কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয় সেই মহাযোগে হরিদ্বারে স্নান করলে পুনর্জন্ম হয় না। অর্থাৎ, আমাদের সেই দুর্বিষহ গর্ভ-যন্ত্রণার অবসান হয়। এই স্থানের গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য ব্রহ্মারও চতুর্মুখে বর্ণনা করতে সমর্থ হননা। দেবগ্রহ বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্যদেব মেষরাশিতে অবস্থান করলে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয়ে থাকে।

২. প্রয়াগে কুম্ভমেলা

প্রয়াগ অর্থে যাগ (যজ্ঞ) স্থল। এই প্রয়াগ জেলায় শৃঙ্গবেরপুর শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র গুহক চণ্ডালের রাজধানী ছিল। ইহা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থান–তীর্থ বিশেষ। একে তীর্থরাজও বলা হয়। অনেকে অনুমান করেন মহাভারতের বারণাবত নগর এখানে ছিল। প্রয়াগের বর্তমান নাম এলাহাবাদ। এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভে প্রয়াগ শহরের প্রথম ঐহিহাসিক বিবরণ আছে। স্তম্ভটি খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০ অব্দে মহারাজ অশোক তৈরি করান। প্রয়াগ শহরটি কিছুকাল মোগলদের রাজধানী ছিল। এই তীর্থরাজ প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা পদব্রজে পরিভ্রমণ করেছিলেন। বৃহস্পতি মেষরাশিতে ও চন্দ্র-সূর্য মকর রাশিতে এবং তিথি অমাবস্যা হলে তীর্থরাজ প্রয়াগে অমৃত কুম্ভযোগ হয়ে থাকে।

৩. উজ্জ্বয়িনীতে কুম্ভমেলা

উজ্জ্বয়িনী বিশাল এবং অবন্তী নামেও প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী। গ্রিকরা একে ওজিনি বলত। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়েই এটি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সেই প্রাচীন উজ্জ্বয়িনী এখন ভূগর্ভে। তারই অর্ধক্রোশ দূরে উত্তরে বর্তমান শহরটি তৈরি হয়েছে। এখানে অনেক হিন্দু মন্দির দেখা যায়। শহরের দক্ষিণ দিকে জয়পুররাজ জয়সিংহের তৈরি মানমন্দির আছে। এই উজ্জয়িনীতেও কুম্ভমেলা হয়ে থাকে। বৃহস্পতি তুলা রাশিতে, সূর্য ও চন্দ্র সংযোগ ও তিথি অমাবস্যা হলে উজ্জয়িনীতে (ধারা) কুম্ভযোগ হয়ে থাকে।

৪. নাসিকে কুম্ভমেলা

নাসিক হলো মহারাষ্ট্রের একটি শহর। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত নাসিক জেলা অন্ধ্রভৃত্য, চালুক্য, যাবদ প্রভৃতি রাজপথের অধিকারে ছিল। পরে মোগল ও ইংরেজ অধিকারে যায়। নাসিক শহরটি অতি পবিত্র তীর্থ। গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। শহরের কাছে নদীর দুধারে অনেক মন্দির আছে। নদীগর্ভেও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে। গোদাবরী নদীর বাম তীরে রামায়ণ বর্ণিত পঞ্চবটী বন। এখানে লক্ষণ শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেছিলেন বলে এর নাম হয়েছে নাসিক। বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে সূর্য ও চন্দ্র অবস্থান করলে এবং অমাবস্যা যোগ হলে গোদাবরী তটে নাসিকে কুম্ভযোগ হয়ে থাকে।

কাশ্মীর যাত্রা

পূরাণ মতে, পুরাকালে ছয় মন্বন্তর পর্যন্ত হিমালয় জলমগ্ন ছিল। সরোবরে জলোদ্ভব নামে এক অসুর বাস করত। বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রজাপতি কশ্যপ দ্রুহিন, উপেন্দ্র ও রুদ্র এই তিনজনকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা অসুরকে বিনাশ করে ঐ সরোবরভূমিতে কশ্যপ মণ্ডল স্থাপন করেন। প্রজাপতি কশ্যপের নাম হতে এই ভূমিখণ্ডের নাম হয় কাশ্মীর। আবার কারও মতে, পৃথিবীর মধ্যে এই স্থানে সর্বোৎকৃষ্ট কুমকুম অর্থাৎ জাফরান জন্মায় বলেই ইহার নাম কাশ্মীর হয়েছে। কুমকুমকে কাশ্মীর বলা হয়। পূরাণে আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের সাহায্যে জলোদ্ভব অসুরকে ধ্বংস করে সরোবরে কাশ্মীর রাজ্য স্থাপন করেন। আবার জানা যায়, অতীতে এই কাশ্মীর ছিল জলমগ্ন নাম ছিল তার সতীসর। অর্থাৎ সতীর সরোবর। সতীর নাম থেকেই নাকি এই নামকরণ। সতীসর ছিল দৈত্যপুরী। দৈত্যের হাতে নিষ্পেষিত মানুষের দুর্দশা মোচনে এগিয়ে এলেন ভগবতীর বরে পুষ্ট মানসপুত্র মরীচি ও কলার পুত্র মহামুনি কশ্যপ। একে একে দৈত্য মেরে গড়ে তুললেন লোকালয়। আর কশ্যপ মার বা কশ্যপ মীর (পাহাড়) থেকেই নাকি কাশ্মীর নামকরণ। মহামুনি কশ্যপ নাগরাজ তক্ষকের হাতে কাশ্মীর সমর্পণ করে ফিরে যান অযোধ্যাপুরীতে। নাগরাজ নীল এখানে প্রথম রাজ্য পালন করেন। তখন হতে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দুরাজগণের রাজত্ব। ১৩৪৩ খ্রি. হতে ১৮১৮ খ্রি. পর্যন্ত কাশ্মীর মুসলমান বাদশাহগণের অধীনে থাকে। ঐ সময় রাজরোষ হতে রক্ষা পাবার জন্য অধিকাংশ হিন্দু মুসলমান হয়ে যায়। পরে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে

ব্রিটিশের নিকট হতে কাশ্মীর রাজ্য ক্রয় করেন। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীর আবার সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের অধীন হয়।

মহাভারতেও কাশ্মীরের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুন কাশ্মীর রাজ্য জয় করেছিলেন। কাশ্মীর সরস্বতী নিত্য বিরাজ করতেন। দেবভাষার বিশেষ চর্চা হতো। নানা দেশ হতে লোকজন ঐ ভাষা শিক্ষা করতে কাশ্মীর আসতেন। সেইজন্য কাশ্মীরের অপর নাম সরস্বতী বা শারদ দেশ।

পৃথিবীর মধ্যে কাশ্মীর যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়, তেমনিই স্বাস্থ্যকর। বৈশাখ হতে কার্তিক পর্যন্ত এখানে বসন্তকাল, অগ্রহায়ণ হতে চৈত্র পর্যন্ত শীতকাল। কাশ্মীরে ঋতু পরিবর্তন বড়ই সুন্দর। জলবায়ু, প্রাকৃতিক শোভা এবং পুষ্টি ও তৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্যাদির জন্য কাশ্মীর ভূস্বর্গ বলে খ্যাত। বসন্তের আরম্ভে শীতের বরফ গলে গেলে কাশ্মীরের শোভা বড়ই সুন্দর হয়। বৃক্ষলতা পত্রপুষ্পে সুশোভিত থাকে। কাশ্মীরে উলার, ডাল ও মানসবল এই তিনটি প্রধান হ্রদ। উলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল, প্রস্থে ১০ মাইল। ইহার পূর্ব নাম মহাপদ্ম। ডাল লেক দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ মাইল। মানসবলে পদ্মফুলের শোভা অতীব মনোহর। ভেরীনাগ, অনন্তনাগ, আচ্চাবল, কুক্কুনাগ বা কুকারনাগ নামে কয়েকটি প্রস্রবণ আছে। কাশ্মীরে অনেক নদী আছে, তন্মধ্যে ঝিলাম ও কৃষ্ণগঙ্গা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চারধাম

স্বর্গের নদী গঙ্গা মর্ত্যে আসবেন। শঙ্কা আছে যে, এ গঙ্গা নদীর প্রবাহের তোড়ে ধ্বংস হতে পারে পৃথিবী। তাই শিব ঠাকুর এলেন জটাজালে গতি রোধ করতে। তবুও শঙ্কা কাটে না। গঙ্গা তাই বারোটি ধারায় বিভক্ত হয়ে মর্ত্যে চললেন। ধারা বারোটি হলেও এদের মধ্যে চারটি প্রধান। যথা–অলকানন্দ, মন্দাকিনী, ভাগীরথী ও যমুনা। অলকানন্দের তীরে বদরীবিশালে দেবতা বিষ্ণু তথা নারায়ণ। আর মন্দাকিনী তীরে কেদারনাথে শিব ঠাকুরের বাস। তেমনই দুই দেবী রয়েছেন গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীতে। গঙ্গোত্রী অর্থাৎ গঙ্গা যেখানে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন সেই পুণ্যভূমে স্বর্গের দেবী গঙ্গার মন্দির। আর যমুনার উৎস মুখে সূর্য-তনয়া তথা যমরাজের যমজ বোন যমুনার অধিষ্ঠান। স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দু পুরাণে এই চার পুণ্যধাম চারধাম নামে খ্যাত। এদের প্রতিটির অবস্থান গাড়োয়াল পাহাড় তথা উত্তরাঞ্চলে ৩০০০ মিটার উর্ধ্বে। সমতলের সঙ্গে যোগসূত্র গড়েছে হরিদ্বার-হৃষিকেশ হয়ে। পৌরাণিক আখ্যান, নৈসর্গিক শোভা, প্রকৃতির রূপের ছটা, বাঁধনহারা পাগলপারা ঝরনাধারা, দুর্গমতাকে জয় করার নেশা, সবকিছু মিলেমিশে চারধাম আজ ভারত রাষ্ট্রের অনন্য তীর্থ।

তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

তীর্থ দর্শনে পুণ্য হয়। তবে অপরাধযুক্ত হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করলে পুণ্য ক্ষুণ্ণও হয়। ধাম দর্শন করতে গিয়ে ধাম অপরাধ করলে তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম অসার হয়। কোনো পুণ্য হয় না। বৈষ্ণবাচার্য গেয়েছেন-

ধামবাসী জনে করিয়া প্রণতি
মাগিব কৃপার লেশ।

ধামে গিয়ে ধামের মাহাত্ম্য বর্ণনকারী ব্যক্তিকে অসম্মান করা যাবে না। ধামকে অস্থায়ী বা জড়দেশ মনে করা যাবে না। বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ ধামকে পৃথক ভাবা যাবে না। বৃন্দাবন চিন্তামণি সমাদৃত। গৌড়মণ্ডলও তদ্রুপ।

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজ ধামে বাস ॥

এসব ধামের মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক মনে করা যাবে না। এরূপ দশ প্রকার ধাম অপরাধ শূন্য হয়ে তীর্থ দর্শন করলে পুণ্য শূন্য হবে না। যদি সম্ভব হয় অবশ্যই ধাম দর্শনে যাত্রা করুন। আর একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, ধাম দর্শনে যাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীতে স্নান করা আর সেই সকল স্থানের মন্দির বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করা নয়। সেখানে ভগবদ্ভক্তদের অন্বেষণ করতে হয়, যাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া আর কোনো বিষয়-বাসনা নেই। তাদের কাছ থেকে তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করতে হয়। ভক্তিভরে তীর্থ দর্শনে অবশ্যই পুণ্য সঞ্চয় হবে। হৃদয়ে যদি ভক্তিভাব না থাকে তাহলে বৃন্দাবনে গিয়েও শাখামৃগের উৎপাতই দর্শন হবে। তবে, এই মৃগগুলো কেবল মৃগ নয়, সুতরাং সাবধান। মহাপ্রভু স্বয়ং তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাই ভক্তের বাসনা-

"প্রভু আমায় যে সকল তীর্থ ভ্রমিলা মনের রঙ্গে।
সে সকল তীর্থ হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে"।

"মনে রাখবেন ধাম দর্শন করতে গিয়ে যেন ধাম অপরাধ না হয়"

১. শিষ্যের নিকট শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী গুরুদেবকে অপমান বা অসম্মান প্রদর্শন করা

২. শ্রীধামকে অস্থায়ী বলে মনে করা।

৩. শ্রীধামবাসী অথবা শ্রীধাম যাত্রীগণের কারও প্রতি উৎপীড়ন বা অনিষ্ট করা অথবা তাহাদিগকে সাধারণ জড়লোক বলে মনে করা।

৪. শ্রীধাম বাসকালে জড়কর্ম করা।

৫. বিগ্রহ অর্চন ও শ্রীনাম কীর্তনকালে অর্থ সংগ্রহ করা ও তৎদ্বারা ব্যবসা করা।

৬. শ্রীধামকে বাংলার মতো কোনো জড়দেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা, শ্রীধামকে কোনো দেবতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত স্থানের সমান বলে মনে করা, অথবা শ্রীধামের সীমা নিরূপণের চেষ্টা করা।

৭. শ্রীধাম বাসকালে পাপকর্ম করা।

৮. বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা।

৯. শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

১০. শ্রীধামের মাহাত্ম্যকে কল্পিত মনে করে অবিশ্বাস করা।

ভক্তদের প্রাথমিক করণীয় ও অকরণীয় কিছু নির্দেশ

১। বৈষ্ণবভক্তদের সবসময় গুরু, ভগবান, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রণাম করা উচিত।

২। সর্বদা কাচা, ধোয়া কাপড়-জামা পরা উচিত।

৩। কখনো রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৪। কখনোই নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়।

৫। অতিরিক্ত ঘুমানো বা জেগে থাকা উচিত নয়।

৬। তিলক ধারণ করার পর আচমন করা উচিত নয়।

৭। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা উচিত নয় এবং প্রস্রাব করার পর জল ব্যবহার করা উচিত।

৮। পায়খানা করার পর স্নান করা উচিত।

৯। প্রসাদ পাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত-পা ও মুখ ভালোভাবে ধোয়া উচিত।

১০। কখনো মিথ্যাকথা বলা, হিংসা করা, অপরের বদনাম করা, কারো সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়।

১১। কখনো কারো কিছু চুরি করা উচিত নয়।

১২। অট্টহাস্য করা বা ব্যঙ্গ করা উচিত নয়।

১৩। মুখ না ঢেকে হাঁচা, হাইতোলা উচিত নয়।

১৪। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়।

১৫। প্রসাদ পাওয়ার সময় থুথু করা বা প্রসাদ পাওয়া অবস্থায় কাউকেও পরিবেশন করা উচিত নয়।

১৬। মহিলাদের প্রতি হিংসা করা বা তাদের প্রতি অপমান করা উচিত নয়।

১৭। কখনো কারো ক্ষতি করা উচিত নয় বরং উপকার করার চেষ্টা করা উচিত।

১৮। বিবেকহীন অসৎ লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

১৯। অসৎ শাস্ত্র পাঠ বা অধ্যয়ন করা উচিত নয়।

২০। পতিত ব্যক্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

২১। রাত্রিতে অসতী মহিলার সঙ্গে ঘোরা উচিত নয় ।

২২। অসৎ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।

২৩। অজ্ঞ, বোকা, পীড়িত, কুৎসিত, খোঁড়া ও পতিত লোককে আঘাত করা উচিত নয়।

২৪। ক্ষৌরকর্ম করলে, শ্মশানে গেলে এবং যৌনসঙ্গ করলে স্নান করা উচিত।

২৫। কারো মাথায় আঘাত করা বা চুল ধরে টানা উচিত নয়।

২৬। বস্ত্রহীন স্ত্রী বা পুরুষের দিকে তাকানো উচিত নয়।

২৭। একমাত্র পুত্র বা শিষ্য ছাড়া শিক্ষা দানের সময় কাউকেই প্রহার করা বা তিরস্কার করা উচিত নয়।

২৮। প্রসাদ পাওয়ার পর ঐস্থান সত্বর পরিষ্কার করা উচিত।

২৯। রাত্রিতে ছোলার ছাতু এবং দই খাওয়া উচিত নয়।

৩০। কোলের উপর রেখে কোনো কিছু খাওয়া উচিত নয়।

৩১। সন্ন্যাসীদের তিনবার এবং ব্রহ্মচারীদের দুইবার স্নান করা উচিত।

৩২। গর্ভ মন্দিরে ঘুমানো উচিত নয় ।

৩৩। কখনো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়।

৩৪। খাওয়ার জলে থুথু ফেলা উচিত নয়।

৩৫। কেউ যদি অপমান করে তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং বোঝানো উচিত, যদি না বোঝে তবে সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত।

৩৬। ভোর ৪টার আগে শয্যা ত্যাগ করা উচিত।

৩৭। প্রতিদিন মঙ্গল আরতিতে যোগ দেওয়া উচিত।

৩৮। খাওয়ার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা উচিত।

৩৯। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান করা উচিত।

৪০। ব্রহ্মাচারীদের কখনো একা একা ঘোরা উচিত নয়।

৪১। ঘরের মধ্যে চুল, দাড়ি, নখকাটা বা দাঁত মাজা উচিত নয়।

৪২। প্রতিদিন ভালোভাবে ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ধোয়া উচিত।

৪৩। গুরুদেবের আদেশ বা নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেই আদেশ পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

৪৪। কারো নিকট যাতে কোনোরূপ অপরাধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৪৫। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে হাত-পা ভালো করে ধোয়া উচিত।

৪৬। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ, কৃষ্ণলীলার চিন্তা বা কৃষ্ণনাম করা উচিত।

৪৭। সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবি দর্শন করা এবং প্রণাম করা উচিত।

৪৮। জপমালা কখনো মাটিতে রাখা উচিত নয়; জপমালা নিয়ে বাথরুমে যাওয়া উচিত নয়; জপমালাকে সর্বদা পবিত্র বলে মনে করা উচিত। ১৬ মালার বেশি জপ করতে অভ্যাস করা উচিত; কমপক্ষে ৮ মালা সম্পূর্ণ করে রাখা উচিত। কারো চরণ স্পর্শ করে সেই হাতে জপমালা স্পর্শ করা উচিত নয়।

কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পূর্ণরূপে ত্রিগুণাতীত। পার্থিব বস্তু জগতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব দেহত্যাগের পর সরাসরি আধ্যাত্মিক জগতে চলে যান। কিন্তু মুক্ত ও নবীন নির্বিশেষে সকল বৈষ্ণবকেই এই পার্থিব জগতে বসবাস করতে হয়। যদিও ভক্তির প্রশ্নে বৈষ্ণব কখনও আপোশ করে না, তবুও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের স্বার্থে সাধারণ আচরণের ব্যাপারে তাঁর উদাসীন থাকা উচিত নয়। বিশেষত অধিকাংশ ভক্ত গার্হস্থ্য আশ্রমে অবস্থান করেন। তাদের অনেক পারমার্থিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। বৈষ্ণব হতে হলে অবশ্য-সন্ন্যাসী হতে হবে–এ ধারণা ভুল। গৃহস্থ থেকেও যে কোনো ব্যক্তি কৃষ্ণসেবা করতে পারেন। যেমন–ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন- "গৃহে থাক বনে থাক সদা হরি বলে ডাক"।

অবশ্যই একথা ভাবা ঠিক নয় যে, কেবল সন্ন্যাসীদেরকেই কঠোর নীতি পালন করতে হবে। গৃহস্থদেরকে অবশ্যই নিষ্পাপ জীবন যাপন করতে হবে। অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ, আমিষ আহার বর্জন, ইন্দ্রিয় দমন ইত্যাদি। সমাজে স্বাভাবিক কারণেই শ্রম বিভাগ রয়েছে। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সৈনিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সকলের প্রয়োজন সমাজে আছে। যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, যে কেউ কৃষ্ণসেবা করতে পারে।

"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী।
কৃষ্ণ ভজনে হয় সবাই অধিকারী" ॥

একজন বৈষ্ণব সৎপথে থেকে তাঁর জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করে, এবং কারও উপর বোঝা হয়ে থাকেন না। সে একজন আদর্শ নাগরিক, খাঁটি সাদাসিদা এবং ধর্মপ্রাণও বটে। পেশার ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব সর্বদা পাপাচার থেকে দূরে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, সে কোনো অবস্থাতেই কসাইয়ের কাজ করবেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুষ্কর্মের জন্য সৃষ্ট দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে কোনো কোনো লোক অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং তারা পাপাচার করতে বাধ্য হয়। উহাহরণস্বরূপ আমরা দেখি যে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকজন প্রায়ই হরিনাম কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তারা প্রায় সকলেই অত্যন্ত গরীব এবং মাছ ধরার মতো হীন কাজ করে দিনান্তে কোনোমতে বেঁচে থাকে। তারা খাঁটি বৈষ্ণব হবার ব্যাপারে প্রকৃতই আগ্রহী হলে আমরা বলব যদি সম্ভব হয় তবে তাদের এ পেশা ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি তা একেবারেই সম্ভব না হয় তাহলেও তাদের নিরাশ হয়ে হরিনাম কীর্তনের প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিৎ হবে না। বরং নিজেদেরকে অত্যন্ত পতিত ও অভাগা ভেবে তারা অন্তরের গভীর থেকে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ অবশ্যই তাদের প্রতি কৃপা করবেন।

অনেক বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এর সব নিয়মকানুন মেনে চলা তারা কঠিন মনে করে। তবে এরা ধীরে ধীরে এসব নিয়মকানুন মেনে চলার অভ্যাস করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ–কোনো ব্যক্তি সপ্তাহে ৭ দিন আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। তার উচিৎ হবে সপ্তাহে প্রথম ৬ দিন, পরে ৫ দিন, এভাবে আমিষ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে আনা, যে পর্যন্ত তা পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে যায়। অবশ্য মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে একেবারে চিরদিনের জন্য আমিষ খাদ্য বর্জন করা সবচেয়ে ভাল। কারণ, মাসে একবার আমিষ খাদ্য গ্রহণ করলেও তা কৃষ্ণভাবনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

আমাদের সকলের প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যারা আমাকে নিবেদন না করে খাদ্য গ্রহণ করে তারা পাপ ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করে না। আর যারা ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করে তারা সকল পাপমূলক প্রতিক্রিয়া হতে মুক্ত থাকে। শরীর রক্ষার জন্য আমাদের সকলকে আহার গ্রহণ করতে হয়। তাই যিনি আমাদের সবকিছু দিয়েছেন তাঁকে প্রথমে খাদ্য নিবেদন করা উচিত। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্য অর্থাৎ প্রসাদের বিশেষ ধরনের স্বাদ হয় যা অত্যন্ত বিলাসবহুল রেস্তোরাঁর খাবারেও পাওয়া যায় না। প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে মানুষের গোটা অস্তিত্ব পবিত্র হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদসূচক এই অভিজ্ঞতা ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। শুধুমাত্র মহাঋষিদের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণ করে এক চাকরানির পুত্র পরজন্মে নারদমুনি হয়েছিলেন। প্রসাদের গুণ এত ব্যাপক। বেদে বলা হয়েছে,"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধঃ"। যদি কারও আহার শুদ্ধ হয়, তাহলে তার সমগ্র চেতনা শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ঐতিহ্যগতভাবে যাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের আহারের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কারণ আহার্য যিনি রন্ধন বা প্রস্তুত করেন, তার চেতনা খাদ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই ভক্তরা যদি এমন সব ব্যক্তির রান্না করা খাবার আহার করেন যাদের

চিত্ত ও ব্যবহার দূষিত, তাহলে তাদের চেতনাও কলুষিত হয়ে পড়বে– অজান্তে রাঁধুনির মানসিকতা আহারকারীদের চেতনায় সঞ্চারিত হবে। এই সঙ্গে রন্ধনকারির পাপকর্মফলও ভোগ করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন-বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হৈলে না হয় কৃষ্ণের স্মরণ। সেজন্য ভক্তরা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের অভ্যাস করেন।

প্রসাদ শুধু যে কর্মফলের বন্ধন মুক্ত করে তাই নয়, কৃষ্ণপ্রসাদ চেতনাকে কলুষমুক্ত ও বিশোধিত করে। কেননা, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের দ্বারা প্রেম ও ভক্তির সাথে সেই খাবার রান্না করা হয়েছে ও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হয়েছে। কৃষ্ণভক্তিতে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হলে আহারের ক্ষেত্রে কঠোরতার আবশ্যকতা রয়েছে। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে জীবনধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা, যাতে সর্বদা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

অবশ্য সব ভক্তের পক্ষে এমনটা করা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। কোনো কর্মব্যস্ত মানুষ, কিংবা যাকে প্রায়ই বাইরে ঘুরতে হয়, তাঁরা অনেক সময় বাইরের খাবার কিনে খেতে বাধ্য হন। যদি খাবার কিনতেই হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে ফল, চিড়া, মুড়ি ও শুকনো জাতীয় খাবার কেনা। দুধ ও দুধের তৈরি খাবারও (দই, মিষ্টি, পনির, ছানা ইত্যাদি) কেনা যেতে পারে, কারণ অভক্তদের দ্বারা তৈরি হলেও দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য সবসময় শুদ্ধ থাকে। বাইরের রেস্তোরাঁয় কোনোরূপ আহার গ্রহণ ভক্তদের পক্ষে অনুচিত।

কর্মফলের নিয়ম অনুসারে অভক্তদের রান্না করা খাদ্যবস্তু বিশেষভাবে কলুষিত, কেননা, ভগবানকে অর্পিত না হওয়ার জন্য তা আমাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেজন্য তাদের তৈরি ভাত-রুটি মাঝেমধ্যে আহার করলে তা ভক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হবে।

পেঁয়াজ, রসুন ও মসুর ডাল আহার করা ভক্তদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলো শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনযোগ্য নয়। এগুলো আহার করলে জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতম গুণে তমোগুণ চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি চা কফির মতো হাল্কা নেশাও বর্জনীয়, কেননা এগুলো স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, অপরিচ্ছন্নতাযুক্ত এবং অনাবশ্যক। এগুলো বদভ্যাস গড়ে তোলে। আর চা-কফি কখনো ভগবানকে নিবেদন করা যায় না।

অভক্তদের তৈরি বাজারে নিরামিষ খাদ্যদ্রব্যাদি সম্পর্কে ভক্তদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। যেমন-বাজারের রুটি, বিস্কুট, আইসক্রিম, কেক আদি খাবারগুলোতে প্রায়ই ডিম থেকে তৈরি একরকম উপাদান থাকে। কখনও কখনও খাবারের প্যাকেটের উপর লেখা উপাদানের তালিকায় বিভিন্ন সব রাসায়নিক দ্রব্যের নাম লেখা থাকে। এসব খাবার নিরামিষ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে এগুলো এড়িয়ে চলাই ভালো।

আসল কথা হলো, যেভাবেই হোক কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করার নীতিতে অবিচলিত থাকতে হবে– সেটাই সর্বোত্তম। বর্তমান যুগের মানুষ রান্নার কাজে খুব অলস হয়ে পড়েছে; কিন্তু বাড়িতে রান্না খাবার সর্বতোভাবে দৈহিক সুস্বাস্থ্যের সহায়ক, পারমার্থিক স্বাস্থ্যের তো কথাই নেই।

আমাদের সকলের একাদশী ব্রত পালন করা উচিত

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁর লীলাবিলাসের প্রথম থেকেই একাদশীর উপবাসের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে স্কন্দ পুরাণের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "যে মানুষ একাদশীর দিন শস্যদানা গ্রহণ করে, সে তার পিতা, মাতা, ভাই এবং গুরু হত্যাকারী এবং সে যদি বৈকুণ্ঠলোকেও উন্নীত হয়, তবুও তার অধঃপতন হয়।" একাদশীর দিন শ্রীবিষ্ণুর জন্য সবকিছু রন্ধন করা হয়, এমনকি অন্ন ও ডালও; কিন্তু শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেদিন বৈষ্ণবদের বিষ্ণুর প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। সেই প্রসাদ পরের দিন গ্রহণ করার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। একাদশীর দিন কোনোরকম শস্যদানা এমনকি অন্ন–তা যদি বিষ্ণুপ্রসাদও হয়, তবুও তা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিধবা না হলেও শাস্ত্র অনুসারে একাদশীর ব্রত পালন করার প্রথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করেছিলেন।

ভক্তিসহকারে একাদশী ব্রত পালন করলে সকল যজ্ঞ ও সকল প্রকার ব্রত পালনের ফল লাভ হয়ে থাকে। এই তিথিতে অন্নগ্রহণকারী পশুর থেকেও নিকৃষ্ট বলে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকের ধারণা, 'শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথের অন্নপ্রসাদ ভক্ষণ দোষবহ নহে'–এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পুরীতে অনেকেই নিঃসঙ্কোচে অন্ন গ্রহণ করেন, ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিচার।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর সধবা জননী শ্রীশচীদেবীকে এই ব্রত পালন করতে অনুরোধ করেছিলেন। একাদশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস করাই শ্রেয়। কিন্তু যারা উপবাস করতে একেবারেই অসমর্থ তারা একাদশীর প্রসাদরূপে অল্প পরিমাণে ফলমূল, আলুর সবজি, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। সারাদিন হরিভক্তি সঙ্গে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি করতে হয় এবং রাত্রে জাগরণ ও হরিকথা শ্রবণ করা প্রয়োজন। একাদশী ব্রত পালনের সময় পরনিন্দা, পরচর্চা, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, দুরাচারি দর্শন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। একাদশী তিথিতে ধান, গম, যব, ভুট্টা ও সরিষা জাতীয় যাবতীয় খাদ্য বর্জনীয়। এই তিথিতে সমস্ত পাপ এই পঞ্চশস্যের ভেতর অবস্থান করে। পঞ্জিকাতে পারণের যে সময় দেওয়া থাকে সেই সময়ের ভেতর শস্যজাতীয় প্রসাদ গ্রহণ করে পারণ করা একান্ত দরকার। নতুবা একাদশীর ফল লাভ হয় না।

কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে অর্থাৎ মাসে দুবার একাদশী ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়। এই দিনটি তপশ্চর্যার দিন এবং বৈষ্ণবগণ নিয়মিতভাবে তা পালন করে থাকেন। একাদশীর মূল নীতি কেবল উপবাস নয়, কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা বর্ধিত করা। সেজন্য সমস্ত ভক্তগণের একাদশী ব্রত অবশ্য পালনীয়। একাদশীর দিনে উপবাস করার আসল কারণটি হলো ঐদিন দেহের প্রয়োজনগুলো কমিয়ে আনা এবং ভগবৎ ভজনে বেশি সময় নিয়োগ করা।

তীর্থস্থানে আচরণবিধি

১। আমরা পবিত্র স্থানে যাই পবিত্র হতে, আমাদের কৃষ্ণভাবনা বর্ধন করতে।

২। শুধু সমস্ত ইস্‌কন ভক্তদের নিকটেই নয়, সমস্ত ধামবাসীদের প্রতিও আমাদের বিনীত এবং নম্র থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩। বস্তুত ধামবাস মানে ভক্ত সঙ্গ করা, উন্নত বৈষ্ণবের নিকট কিছু শ্রবণ করা ও তাঁদের সেবা করা। বিষয়ীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা ধাম দর্শন করতে পারি না। আমরা বৈষ্ণবের কৃপার উপর নির্ভরশীল।

৪। শ্রীল প্রভুপাদের সুনাম বজায় রাখতে আমাদের সর্বদা শুদ্ধাচার সম্পন্ন হওয়া উচিত (খাওয়া-দাওয়া থেকে টাকা ভাঙ্গানো পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে)।

৫। আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে গোবর্ধন পর্বত, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এঁরা সকলে একেক জন দিব্য ব্যক্তিত্ব। সুষ্ঠু চেতনাসম্পন্ন হলেই কেবল আমরা তাঁদের দর্শনের আশা করতে পারি।

৬। পশুপাখিরাও ধামবাসী। তাদের সঙ্গে বেশি বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কোনোটাই করা উচিত নয়। নিরপেক্ষ থাকাই সব থেকে ভালো।

৭। ভোগোন্মুখ অপেক্ষা সেবোন্মুখ ভাব নিয়ে ধামে আসা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমাদের ধামদর্শন সার্থক হবে।

তীর্থযাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রভুদের

ধুতি এবং পাঞ্জাবি। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীগণ নিয়মিত মস্তক মুণ্ডন করবেন এবং শিখা রাখবেন, গৃহস্থরাও তা করতে পারেন। যদিও তাঁদের সেবা অনুসারে তাঁরা চুল ছোট ও পরিষ্কার রাখবেন এবং ছোট শিখা রাখবেন। যাঁরা দীক্ষিত অথবা দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক সেই সকল ভক্তরা দাড়ি-গোঁফ রাখবেন না।

মাতাজিদের

শাড়ি (পুরুষের সামনে মস্তক আবৃত রাখা ভাল), পরিস্থিতি বাধ্য না করলে এবং প্রচারের জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন না হলে অন্য পোশাক অবশ্যই পরিহার করতে হবে। ঐতিহ্যগতভাবে লম্বা চুল পেছন দিক থেকে বেঁধে রাখাই উত্তম, চুলের আধুনিক অঙ্গরাগ বর্জন করবেন।

উভয় ক্ষেত্রে

প্রভু ও মাতাজি সকলের ক্ষেত্রে পোশাক হবে সরল, পরিষ্কার, তবে অতিরিক্ত জাঁকজমকের নয়। পোশাক অবশ্যই যথাযথ এবং গ্রহণীয় হবে। অনাবশ্যক উপকরণ যেমন- সুগন্ধী, বিভিন্ন অঙ্গরাগ এবং সাজসজ্জা ব্যবহার করা উচিত নয়। মন্দিরে অথবা বাইরে যেখানেই হোক না কেন, বৈষ্ণবদের পোশাক-পরিচ্ছদে সরলতা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। সব সময় ধোয়া পরিষ্কার পোশাক পরা উচিত। আগের দিনের ব্যবহৃত পোশাক পরা যাবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, যাঁকে দেখে কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে তিনিই বৈষ্ণব, এক্ষেত্রে ভক্তরা বিশেষ করে কতকগুলো বিষয় অবশ্যই অনুসরণ করবেন, যাতে তাঁদের বাইরে থেকেও বৈষ্ণব বলে বোঝা যাবে। যেমন, তিলক-দেহের দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করতে হবে, যে ব্যক্তি নিয়মিত জপ করেন না, চারটি নিয়ম পালন করেন না, তাঁরা তিলক ধারণ করবেন না। কণ্ঠিমালা-সমস্ত দীক্ষিত ভক্ত কণ্ঠিমালা পরবেন। তিন ফেরা কণ্ঠিমালা গলার মূলে জড়িয়ে থাকবে এবং স্পষ্টভাবে তা দেখা যাবে। যে সকল ভক্ত দীক্ষিত নন, কিন্তু কিছুদিন ধরে সমস্ত নিয়মগুলো পালন করছেন এবং দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক, তাঁরাও কণ্ঠিমালা ব্যবহার করতে পারেন।

যে সমস্ত ভাবি ভক্ত সকল নিয়ম, বিশেষ করে ১৬ মালা জপ এবং চারটি নিয়ম পালন করেন না, তাঁদের কণ্ঠিমালা পরা উচিত নয়। কঠোরভাবে বলা যায়, যিনি কণ্ঠিমালা ধারণ করবেন, তাঁর এমনকি পেঁয়াজ, রসুন খাওয়াও উচিত নয়। নতুন ভক্তদের সেই অনুসারে উপদেশ দিতে হবে। ভক্তরা বেশি মূল্যবান এবং অতিরিক্ত উজ্জ্বল অলঙ্কার ইত্যাদি পরবেন না। মাতাজিরা হিসেব করে অলঙ্কার পরতে পারেন।

তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণকালীন কিছু বিধিনিষেধ

১। সকলে মিলে পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন বৈষ্ণব জীবনধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতীক্ষিত অঙ্গ।

২। যাত্রা শুরুর পূর্বে নিজের ব্যক্তিগত বা গৃহগত এবং কার্যালয়ের দায়দায়িত্বের সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করে দেওয়া উচিত যাতে ভ্রমণের সময় কোনোরকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মনকে ভারাক্রান্ত করতে না পারে। অর্থাৎ ভ্রমণকালে মনকে সম্পূর্ণরূপে দিব্যনাম এবং কৃষ্ণকথায় নিমগ্ন করার জন্য ভ্রমণকারী যেন নিজেকে প্রস্তুত করেন।

৩। এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক শুদ্ধতা অর্জন; সেজন্য এসময় কোনোরকম প্রজল্প বা চপল আচার-আচরণ সর্বদা বর্জনীয়। কেবল কৃষ্ণকথা ও দিব্যনামই উচ্চারিত হওয়া উচিত।

৪। পূর্ব পরিচিতি অনুসারে নিজেদের মধ্যে দলবাজি বর্জন করে ভক্তদের উচিত একে অপরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে প্রীতি সহকারে মেলামেশা করা।

৫। ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত বিধিনিয়মগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মেনে চলা উচিত। সেটা কেবল সাংগঠনিক প্রয়াসকেই সহজতর করবে না, একটি সুন্দরতর পরিবেশ তৈরিতেও সাহায্য করবে। বিশেষত ভক্তদের উচিত এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে না ঘুরে একত্রে থাকা এবং যাত্রা বিরতির পর পুনরায় একত্রিত হওয়ার সময় এ সংক্রান্ত নিয়মগুলো অনুসরণ করা। ভক্তদের কারো পিছিয়ে পড়া উচিত নয়।

৬। কোনোরকম অভিযোগ না করে ভ্রমণকালীন সমস্ত অসুবিধা ও কষ্টকে স্বেচ্ছায় সহ্য করার জন্য ভক্তকে প্রস্তুত হতে হবে। ভ্রমণ পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

কারও কোনো প্রস্তাব থাকলে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে তিনি তা যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে পেশ করতে পারেন। অযথা সমালোচনা ও অভিযোগ কেবল তীর্থভ্রমণের পরিবেশকে নষ্ট করে।

৭। যারা অত্যন্ত নতুন অথবা খুব বেশি নিষ্ঠাবান নয় অথবা যারা প্রাথমিক বিধিনিষেধগুলো অনুসরণ করে না সেসব লোকেদের নাম সুপারিশ করা উচিত নয়।

৮। ভক্তের উচিত তীর্থভ্রমণের সময়ে ভক্তদের সঙ্গে থাকা। অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ বা অন্য কিছু করার জন্য স্বতন্ত্র কোনো পরিকল্পনা থাকা উচিত নয়।

৯। প্রতিটি ভক্তের উচিত অপরাপর ভক্তের সেবায় সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে তৈরি থাকা এবং কেবল অপরের সেবা গ্রহণ করে তৃপ্ত না থাকা।

১০। প্রতিটি ভক্তদের উচিত এক উচ্চ পারমার্থিক ভাবধারা রক্ষায় ভূমিকা নেওয়া। এমনকি একজন মাত্র উদ্দীপনা-শূন্য অথবা অলস ভক্তও ভ্রমণকালীন ভাবধারায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

১১। বাইরে থেকে নিজেদের জন্য বিশেষ খাদ্যদ্রব্য ভক্তদের ক্রয় করা উচিত নয়। ভ্রমণের সময় ভাবধারাটি হবে একটি পরিবারের মতোই একত্রে থাকা ও একত্রে আহার করা।

১২। দিব্যনামের বা ধামবাসীর প্রতি যাতে কোনো অপরাধ না হয়, সে ব্যাপারে প্রত্যেকের যত্নশীল থাকা উচিত।

১৩। যখন ভক্তগণ একত্রে কোনো মন্দির দর্শন করবেন, তখন অবশ্যই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে ও সযত্নে মন্দিরের সমস্ত নীতিনিয়মগুলো মেনে চলতে হবে, যে কোনো রকমের বিতর্ক সযত্নে পরিহার করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১। ভ্রমণ সঙ্গী, গীতা দত্ত ও মৃণাল দত্ত

২। ৮৪ ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমা, শ্রীস্বরূপ দাস বাবা মহারাজ

৩। কামাখ্যা তীর্থ- ধরণীকান্ত দেবশর্মা

৪। লীলাময় গোপীনাথ, রামচন্দ্র মাঝী

৫। শ্রীশ্রী গৌড়মণ্ডল দর্শন, শ্রীমৎ গৌরাঙ্গপ্রেম স্বামী মহারাজ

৬। কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস, পবন কুমার এম এ, অধ্যাপক, বিড়লা মহাবিদ্যালয়, কুরুক্ষেত্র

৭। শ্রীক্ষেত্র, শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ

৮। শ্রীক্ষেত্র, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত

৯। ভক্তসঙ্গে তীর্থ দর্শন

গঙ্গাজল স্পর্শ

স্পশৃমি তাং মহেশ্বরীম্ বিষ্ণুদেহ দ্রবাকরে প্রসীদে জগদম্বিকে ॥

গায়ত্রী মন্ত্রে শিখা মোচন করে গঙ্গায় প্রবেশ

স্নান মন্ত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্তেনসন্তস্মাদাজন্ম মরনান্তিকাৎ ॥

(ওঁ নমঃ নারায়ণ বলে ৪ বার মাথায় জল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরণ করে স্নান করতে হবে)

স্নান শেষে শিখা বন্ধন করে তিলক ধারণ (১ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্র ১০ বার করে জপ করুন)

কাম গায়ত্রী মন্ত্রে ৪ বার ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান

ইদম্ শ্রীকৃষ্ণ তর্পয়ামি নমঃ-বলে তর্পণ – (৪ বার)

গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে জল দান

ওঁ গ্বাং গঙ্গায় বিষ্ণুমুখায় শিবামৃতে শান্তিপ্রদান্যৈ নারায়ণ্যৈ নমস্তুতে

ভীষ্ম পঞ্চকম্

(ভীষ্ম দেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ, অর্ঘ্যদান ও প্রণাম করার সময় উপবীত বামদিকে ঘুরিয়ে ধরতে হবে।)

শ্রীভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ (উত্তর দিকে ফিরে করতে হবে)

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রায় সংকৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদামেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্মণে ॥ (৩ বার)

অর্ঘ্য দান

বসুনামাবতরায় শান্তনোরাত্মজায় চ।
অর্ঘ্যং দদামি ভীষ্মায় আজন্ম ব্রহ্মচারিণে ॥ (৩ বার)

প্রণাম

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদীঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রচিতাং ক্রিয়াম ॥ (৩ বার)

সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র বলে জলদান

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতি।
ধন্বন্তরীং সর্বপাপাঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥ (৩ বার)

সমস্ত জীবের উদ্দেশ্যে জল দান

আব্রহ্ম স্তম্ভ জগতো ত্রিপত্তৈ নমঃ ॥ (৩ বার)

এরপর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে পারেন।

হরেকৃষ্ণ।

বিষ্ণু পঞ্চকম্– শ্রীভগবান বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গে পুষ্প অর্পণ বিধি (গরুড় পূরাণ)

১ম দিনে- পাদদ্বয়ে পদ্ম পুষ্পে পূজা,
২য় দিনে- বিল্বপত্র দ্বারা জানু দেশে পূজা,
৩য় দিনে- গন্ধ দ্বারা নাভিদেশে পূজা,
৪র্থ দিনে- বিল্বপত্র ও জবাপুষ্প দ্বারা পূজা,
৫ম দিনে- মালতি পুষ্প দ্বারা শিরোদেশে পূজা।

দক্ষিণ ভারত

শ্রী ধাম মায়াপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পুরীধাম (উড়িষ্যা), চিলিকা হ্রদ (উড়িষ্যা), সীমাচলম (অন্ধ্রপ্রদেশ), বিশাখা পত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ), অন্যাভরম (অন্ধ্রপ্রদেশ), গোদাবরী (অন্ধ্রপ্রদেশ), বিজয়ভারা (অন্ধ্রপ্রদেশ), তিরুপতি (অন্ধ্রপ্রদেশ), চেন্নাই (তামিল নাড়ু), মহাবলী পুরম (তামিলনাড়ু), বরাহ অবতার মন্দির (তামিলনাড়ু), পক্ষীতীর্থ (তামিলনাড়ু), রামেশ্বরম (তামিলনাড়ু), কন্যাকুমারী (তামিল নাড়ু), মাদুরাই (তামিলনাড়ু), মহিশুর (তামিলনাড়ু), বাঙ্গালোর (কর্নাটক), মুম্বাই (মহারাষ্ট্র), দ্বারকাধাম (গুজরাট), ভেট দ্বারকা (গুজরাট), পোরবন্দর (গুজরাট), সোমনাথ (গুজরাট), নাথদ্বার (গুজরাট), উদয়পুর (রাজস্থান), পুষ্কর (রাজস্থান), জয়পুর (রাজস্থান), শ্রীধাম বৃন্দাবন (উত্তর প্রদেশ), গয়াধাম (বিহার), কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

আগ্রহী যাত্রীগণ যোগাযোগ করুন:

স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা

শ্রী নিধি কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী-০১৭১৫১৯২১১৫
শ্রী সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী-০১৭৩০০৫৯২০৯
শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস-০১৭২০৮০৯৩৮২

নিয়মাবলি

* প্রত্যেক যাত্রীকে পাসপোর্টধারী হতে হবে।
* পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে ৬ মাস থাকতে হবে।
* বুকিং-এর জন্য প্রতিজন যাত্রীকে অগ্রিম ২,০০১/= টাকা প্রদান করতে হবে।
* যাত্রীর সাথে কোনো ছোট ছেলে/মেয়ে থাকলে তার জন্য ভ্রমণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
* পকেট খরচসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ যেমন -শ্রাদ্ধ, পূজা প্রণামী ইত্যাদি যাত্রীগণের নিজের খরচে করবেন।
* সিট বরাদ্দ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় থাকবে। পরিচালকমণ্ডলীকে যাত্রীগণ সর্বতোভাবে সাহায্য করে ভ্রমণকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার অনুরোধ রইল।
* দেশ-কাল বিবেচনায় পরিচালকমণ্ডলী প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে পারেন।
* পরিচালকমণ্ডলীর অনুমতি ব্যতিরেকে ভ্রমনকালে কেউ কোথাও যেতে পারবেন না, গেলে নিজ দায়িত্বে যেতে হবে।

* পাসপোর্টধারীকে ভিসা সহযোগিতা, ডলার এনডোর্সমেন্ট, ট্রাভেল ট্যাক্স, বর্ডার খরচ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকবে।
* বুকিং দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক যাত্রীকে পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
* প্রত্যেকের সদ্য তোলা দুই কপি ২x২ সাইজ যার ব্যাকগ্রাউন্ড হবে সাদা, রঙিন ছবিসহ পাসপোর্ট, ট্যুর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।
* সময়োপযোগিতা সাপেক্ষে যাত্রীদের বিছানা, মশারি, থালা, গ্লাস, প্রয়োজনীয় ঔষধ, টর্চলাইট সঙ্গে নেবেন।
* সঙ্গে কোনো ট্রলিব্যাগ নেয়া যাবে না ।

আরতি সমূহ

শ্রীশ্রীগুর্বাষ্টকম্ (মঙ্গল আরতি)

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘণাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥১॥

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥২॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥৩॥

চতুর্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥৪॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা গুণ-রূপ-নাম্নাম।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥৫॥

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ-
র্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥৬॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥৭॥

যস্য প্রসাদ্ ভগৎপ্রসাদো
যষ্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥৮॥

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও প্রণাম

জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ। জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ॥
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং। জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ
বর্হিনৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥
তব করকমলেবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

শ্রীগুরু পূজা

শ্রী গুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাহাঁর প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে ॥
গুরু মুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,

আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সেই উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন ॥
হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

শ্রীগৌর আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ॥১॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥২॥
বসি' আছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥৩॥
নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ॥৪॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥৫॥
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥৬॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥৭॥

তুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী! কৃষ্ণপ্রেয়সী!
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
মোর এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী।

দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

তুলসী প্রদক্ষিণ মন্ত্র

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

তুলসী স্নান মন্ত্র

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনীম্ ॥

শ্রীগঙ্গায় প্রাতঃস্নান বিধি

গুরু প্রণাম : (যার যার গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র)

তীর্থে অনুজ্ঞা প্রার্থনা

দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খ চক্র গদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থাবগাহনে ॥

স্নান সংকল্প

ওঁ বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য দামোদর মাসে শুক্লা পক্ষে ....তিথৌ অচ্যুত গোত্রস্য .... দাস শ্রী কৃষ্ণপ্রীতি কামঃ শ্রীগঙ্গাদেবী প্রীত্যর্থে অস্য ভাগীরথী গঙ্গায়াং প্রাতঃ স্নানমহং করিষ্যে।

গঙ্গা প্রণাম

সদ্যঃ পাতক-সংহন্তী-সদ্যো দুঃখ-বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গে গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥
নমস্তে দেবদেবেশি গঙ্গে ত্রিপথস গামিনী।
ত্রিলোচনে শ্বেতরূপে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবার্চ্চিতে ॥

গঙ্গানাম কীর্তনে গঙ্গার আগমন প্রার্থনা

নন্দিনীতি চ তে নাম বেদেষু নলিনীতি চ।
দক্ষা পৃথ্বি-বিরদগঙ্গা-বিশ্বকায়া-শিবামৃতা ॥
বিদ্যাধরি-মহাদেবী-তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমঙ্করী জাহ্নবী চ শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী।
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্তয়েৎ ॥

সমাপ্ত

কোনো জায়গা পুণ্যতীর্থ হয়ে ওঠার প্রধান যোগ্যতা হলো এই যে, ভগবান কিংবা তাঁর শুদ্ধভক্ত সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন অথবা সেখানে লীলাবিলাস করে গেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবজন তথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের কাছে শ্রীবৃন্দাবন ধাম এবং শ্রীমায়াপুর ধাম হলো প্রধান তীর্থক্ষেত্র। বর্তমান কলিযুগে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রগুলো জড়জাগতিক অশুভ-অপবিত্র শক্তিরাজির কবলিত হয়ে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়, তাই কখনওবা এই সকল তীর্থস্থানের পবিত্রভাব উপলব্ধি করা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। কোনো পুণ্য-পবিত্র স্থান দর্শন করে আমরা যদি কিছু অর্জন করতে চাই, তা হলে যথার্থ পারমার্থিক মনোভাব এবং নিষ্কলুষ বিনম্র শ্রদ্ধার মানসিকতা নিয়েই অবশ্য আমাদের সেখানে যেতে হবে।

9789849140409